সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৭তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন



সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৭তম খন্ড

সূরা সূরা ফাতের
থেকে
সূরা আয যুমার

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১৭তম খন্ড সূরা ফাতের থেকে সূরা আয যুমার)

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১ বি ২কিউ ডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়্যারলেস রেলগেইট মাসজিদ (দোতলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫, মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৯

১০ম সংস্করণ
সফর ১৪৩১, এপ্রিল ২০১০, মাঘ ১৪১৬

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা মাত্র



Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

17th Volume
(Surah Fater to Surah Ajh Jhumar)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1217
38/3, Banglabazar Computer Market (1st Floor), Stall No-226
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1999
10th Edition
Safar 1431, January 2010
Price Tk. 200 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO- 984-8490-17-5

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়— হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত— এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'—এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'—'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি করে বসি—তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে-

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ—আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা—শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা ফাতের

আয়াত ৪৫ রুকু ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. সব তারীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (স্বীয়) বাণীবাহক (ফেরেশতা)-দের সৃষ্টিকর্তা, (যারা) দু'দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট (শক্তির প্রতীক); তিনি চাইলে (এ) সৃষ্টির মাঝে (তাদের ক্ষমতা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সর্বময় ক্ষমতার মালিক। ২. তিনি মানুষের জন্যে কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তার (সে) পথরোধকারী নেই, (আবার) তিনি যা কিছু বন্ধ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্যে (পুনরায়) পাঠাতে পারে না, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া (তোমাদের) আর কোনোই মাবুদ নেই, তারপরও তোমরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো?

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই মক্কী সূরাটির ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে যে বিশেষ ধরনের বিন্যাস রয়েছে, তার সাথে সূরা 'রাদ'-এর বিন্যাসের নিকটতম সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, ঝাঁকি দেয় এবং উদাসীনতা ও শৈথিল্য থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে, যাতে সে সৃষ্টি জগতের বিশালতা ও চমৎকারিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে, সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে ভাবতে পারে, তাঁর নেয়ামতসমূহ স্মরণ রাখে, তাঁর

দয়া ও করুণাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, অতীতের কাফেরদের ইহকালীন ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং পরকালীন শোচনীয় পরিণতিকে উপলব্ধি করে, মহান আল্লাহর অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো, সৃষ্টি জগত, মানব জীবন, ইতিহাসের ঘটনাবলী ও মানবাত্মার গভীরতম প্রকোষ্ঠে মহান আল্লাহর সৃজনী হাতের নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করার সময় তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয় এবং এই অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো ও তাঁর এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টিজগতে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, রসূল ও কেতাবের মাধ্যমে প্রেরিত সত্য বিধান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সুদক্ষ সুনিপুণ সৃজনী হাতের অখন্ড একত্ব দেখে তা অনুভব করতে পারে। আর এই সব কিছুই যেন এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় সম্পন্ন হয়, যাতে কোনো অনুভুতিশীল হৃদয়ই সত্যের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত না হয়। সূরাটা এমন অখন্ড ও ঘনিষ্ঠ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একক যে, একে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। কেননা পুরো সূরাটা জুড়ে একই বিষয় আলোচিত, মানব হৃদয়ের ওপর একই ঐকতান ঝংকৃত এবং প্রকৃতি, মানবাত্মা, জীবন, ইতিহাস ও পরকালের উৎস থেকে উদ্ভূত এই সত্য এর সর্বত্র উচ্চারিত, তাই এ সূরা মানব হৃদয়কে সর্বদিক থেকে ঈমান, প্রত্যয় ও বিনয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ সূরার আয়াতগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহকেই সকল তৎপরতার শক্তির উৎস নির্ধারণ করে, তাঁর হাতকেই সকল তৎপরতার মূল শক্তিদাতা ও প্রেরণাদাতা হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ঘোষণা করে যে, সব কিছুর সুতো তাঁর হাতেই নিবদ্ধ, তিনিই এই সুতো ছাড়েন বা টানেন, ঢিল দেন বা সংকুচিত করেন। কেউ এ ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দিতে পারে না, তাঁর সাথে শরীক হতে পারে না বা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

সূরার শুরু থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

আমরা দেখতে পাই, এক মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি এই মহাবিশ্বকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করে,

'আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা'....... (আয়াত-১)

স্রষ্টা হওয়ার সুবাদে সৃষ্টির ওপর তাঁর এই জোরদার নিয়ন্ত্রণ আবার তাঁর দয়ালু হওয়ার কারণে শিথিলও হয়। তখন আল্লাহর দয়া করুণা মুষলধারে বর্ষিত হয়। পুনরায় সেই করুণার ধারাও নিয়ন্ত্রিত এবং বন্ধ হয়। এর কোনোটাতেই কেউ তাঁর অংশীদার হয় না এবং এখানে কারো কিছু করণীয়ও থাকে না।

'আল্লাহ মানুষের জন্যে যে করুণাধারা উন্মুক্ত করেন, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর যা তিনি বন্ধ করেন তা কেউ পুনরায় চালু করতেও পারে না।..................'(আয়াত-২)

হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর এই করুণাধারা উন্মুক্ত করা অথবা বন্ধ করার ফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী করেন, যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করেন।'..... 'আল্লাহ তায়ালা যাকে চান শোনান। যারা কবরে আছে, তাদের তুমি শোনাতে পারবে না। তুমি তো সতর্ককারী মাত্র।'

মহান আল্লাহর এই হাতই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করে এবং পরকালে মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করে।

'আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা. যিনি বাতাস প্রেরণ করেন, অতপর মেঘমালা চালু করেন....'(আয়াত-৯) এরপর ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব সম্মান মর্যাদা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং এর একমাত্র উৎসও তিনি।

'যে ব্যক্তি সম্মান চায় তার জানা উচিত যে, সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর।'......

১১ নং আয়াতের বক্তব্য এই যে, বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টির নির্মাণ, বংশ বৃদ্ধি ও আয়ুস্কাল নির্ধারণ সব কিছুরই সুতো আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে........ ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি আর আল্লাহর হাতই যে তার সুনির্দিষ্ট পন্থায় সমগ্র সৃষ্টি জগতে সক্রিয় রয়েছে এবং জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, মানুষ ও জীবজন্তুকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে, সে কথা বলা হয়েছে ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে।

আর এই হাতই মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটায় এবং এক প্রজন্মকে আর এক প্রজন্মের উত্তরাধিকারী বানায়, এ কথা রয়েছে ৩২ ও ৩৯ নং আয়াতে। এই হাতই আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে, ৪১ নং আয়াতে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর এই হাতই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর কেউ তাঁর এ কাজে বাধা দিতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সূরার কয়েকটা বক্তব্য লক্ষণীয়; 'তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' ...... 'তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়', 'সব জিনিসই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।' 'তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত', 'রাজত্ব কেবল তাঁরই', 'আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন', 'তিনি প্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল', তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী, 'তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী, সর্বোত্তম', তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় জানেন', 'তিনি অন্তর্যামী' 'তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল', 'তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

এসব বক্তব্য এবং এই সব আয়াত নিয়েই সূরাটা গঠিত, আর এগুলো দ্বারাই বুঝা যায় সূরার বৈশিষ্ট্য কি এবং মনের ওপর তা সাধারণভাবে কি প্রভাব বিস্তার করে।

সূরার এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি একে ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ংগম করার সুবিধার্থে ছয়টা অংশে ভাগ করেছি। তবে প্রত্যেকটা অংশের বক্তব্য এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে, পুরো সূরাটা আসলে একটা অধ্যায় বলেই প্রতীয়মান হয়।

তাফসীর

আয়াত ১-৩

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা', (আয়াত-১)

সূরাটার শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, এ সূরার মূল লক্ষ্যই আল্লাহর দিকে মনকে নিবিষ্ট করা। তাঁর নেয়ামতগুলো দর্শনের জন্যে মনকে জাগিয়ে তোলা, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অন্বেষণ করা, তাঁর সৃষ্টি জগতে তাঁর অতুলনীয় শিল্প নৈপুণ্যর নিদর্শন দেখা, সমগ্র চেতনা ও অনুভূতিকে এসব নিদর্শন দিয়ে পরিপূর্ণ করা এবং প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।'

এই কথাটা বলার সাথে সাথেই সৃজন সম্বলিত তাঁর গুণবাচক নামটির উল্লেখ করা হয়েছে।

'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।'

অর্থাৎ তিনি এই বিশাল সৃষ্টি জগতের নির্মাতা, যার একাংশ আমাদের ওপরে ও একাংশ নীচে দেখতে পাই। এর সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ এবং আমাদের নিকটতম অংশ হলো আমাদের এই

পৃথিবী। এর সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। এই সমগ্র সৃষ্টি জগত শাসিত হচ্ছে একই প্রাকৃতিক নিয়মে এবং পরিপূর্ণ সমন্বয় সহকারে পরিচালিত হচ্ছে এর রক্ষণাবেক্ষণ। অথচ এ সৃষ্টি জগতের একাংশ থেকে আরেক অংশের দূরত্ব এতো বেশী যে, প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা ছাড়া তা নির্ণয় করা আমাদের মানবীয় চিন্তাশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এই সৃষ্টি জগতের এতো বিশালতা, এক একটা জগতের সাথে অপর জগতের এতো ব্যবধান এবং একটা কক্ষপথ থেকে অপর কক্ষপথের এতো দূরত্ব সত্তেও এগুলোর পারস্পরিক আনুপাতিক তারতম্য এতো সূক্ষ্ম যে, এর একটা ক্ষুদ্রতম অনুপাতেও যদি ব্যত্যয় ঘটে, তবে গোটা সৃষ্টিজগত বিধ্বস্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।

পবিত্র কোরআনে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সংক্রান্ত এ ধরনের অসংখ্য উক্তি আমরা পড়ে থাকি, কিন্তু তার সুগভীর মর্ম উদ্ধারের জন্যে চিন্তাভাবনা করি না। একই ধরনের সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে আমরা আকাশ এবং পৃথিবীর বহু দৃশ্য দেখেও না দেখার ভান করে তা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী চিন্তাগবেষণা ছাড়াই এগিয়ে যাই। কেননা আমাদের অনুভূতিশক্তি স্থবির ও ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই সেসব প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চেতনায় কোনো জাগরণ সৃষ্টি করে না। অথচ আল্লাহকে সর্বদা স্মরণকারী হৃদয়ে তা তীব্র আলোড়ন ও জাগরণ সৃষ্টি করতে বাধ্য। কেননা সেই হৃদয়গুলো মহান আল্লাহর সুনিপুণ নির্মাণকারী হাতের স্বাক্ষর প্রত্যেক সৃষ্টিতে দেখতে পায়। কারণ এই বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো প্রথম বার দেখার সময় যে বিস্ময়, কৌতূহল ও আতংক অনুভূত হতো, দীর্ঘকাল দেখতে দেখতে অভ্যস্ততা ও সখ্যতার সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের সেই আতংক ও বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে।

যাদের মন আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কখনো এ সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার প্রয়োজন বোধ করে না যে, আকাশের কোথায় কোথায় কোন কোন গ্রহ নক্ষত্র অবস্থান করে, সেগুলো আয়তনে পরস্পরের তুলনায় কত বড় বা ছোট, সেগুলোর চারপাশে বিরাজিত মহাশূন্যের আপেক্ষিক আয়তন কেমন, সেসব গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্যের কোন কোন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে, আয়তনে, অবস্থানে ও গতিবিধিতে সেগুলোর কোনটা কোনটার চেয়ে অগ্রগামী বা পশ্চাদপদ ইত্যাদি। এই বিস্ময়কর ও চমৎকার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কৌতূহল ও বিস্ময় জন্মানোর জন্যে তাদের এ সব তথ্য জানার কোনোই প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির এ সব দৃশ্য অবলোকন করাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নক্ষত্রমালা, জ্যোৎস্না রাতের আলোর বন্যা, মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্তা বহনকারী ঊষাকালের আবির্ভাব এবং বিদায় ও সমাপ্তির ঘন্টা বাজানো অন্ধকার বয়ে আনা সূর্যাস্তের দৃশ্যই তাদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এমন কি শুধুমাত্র অফুরন্ত বিস্ময়ের ভান্ডার এই পৃথিবী ও তার অভিভূতকারী দৃশ্যাবলীই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে, যা একজন পর্যটক সারা জীবনেও দেখে শেষ করতে পারে না। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায়, তার জন্যে একটা মাত্র ফুল দেখাই যথেষ্ট, যার পাপড়িগুলো বিচিত্র বর্ণের সমাহার, তার মনোমুগ্ধকর শোভা ও সুসমন্বিত বিন্যাস নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে কোনো কূল কিনারা করা যায় না।

এইসব সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার উৎসাহ যুগিয়েই কোরআন এগুলোর বিবরণ দিয়েছে। ছোট বড় এ সব সৃষ্টির যে কোনো একটা নিয়ে গবেষণা করাই তার স্রষ্টার মহত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্যে এবং তাঁর গুণকীর্তন ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সূরার প্রথম আয়াত থেকেই এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে– 'আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা।'

ফেরেশতাদের গঠন প্রকৃতি ও দায়িত্ব

এ সূরার আলোচনায় রসূল, ওহী এবং আল্লাহর নাযিল করা নির্ভুল জীবন বিধান সবই অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতারা পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত নবীদের কাছে ওহী নাযিল করার জন্যে দূত হিসাবে নিয়োজিত। এই ওহী নাযিল করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এ জন্যেই তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির উল্লেখ করার পর পরই ফেরেশতাদের দূত হিসাবে প্রেরণের উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী। তারা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তাঁর নবী ও রসূলদের মাঝে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করেন।

পবিত্র কোরআনে এই প্রথম আমরা এমন একটা বক্তব্যের সন্ধান পেলাম, যাতে ফেরেশতাদের আকৃতি সম্পর্কে কিছু বিবরণ রয়েছে। ইতিপূর্বে তাদের প্রকৃতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন, 'তারা আল্লাহর এবাদাতে কখনো দম্ভ দেখায় না ও ক্লান্ত হয় না, দিনরাত তাসবীহ পাঠ করেও তারা থামে না।' (আম্বিয়া ১৯, ২০) 'যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে থাকে, তারা কখনো তাঁর এবাদাত করতে দম্ভ দেখায় না, তাঁর তাসবীহ পাঠ করে ও তাঁর জন্যে সাজদা করে।' (আল আ'রাফ ২০৬)

কিন্তু এখানে আমরা ফেরেশতাদের দেহাকৃতি সংক্রান্ত বক্তব্য পাচ্ছি যে, 'তারা দুটো, তিনটে ও চারটে করে ডানার অধিকারী।' তবে এই বিবরণ দ্বারা তাদের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। কেননা আমরা জানি না আসলে তারা কেমন এবং তাদের এ সব ডানাই বা কেমন। কেবল এই বিবরণ পেয়ে নীরবতা অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের আর কোনো করণীয় নেই। আমরা তাদের আকৃতি সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা করতে পারি না। কেননা আমরা যে ধারণাই করবো সেটাই ভুল হতে পারে।

তাদের আকৃতি ও চেহারা সম্পর্কে কোনো সুনিশ্চিত বিবরণ কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোরআনে কেবল এই স্থানে এতোটুকু এসেছে, আর সূরা তাহরীমের ৬ নং আয়াতে আছে, তার (দোযখের) ওপর বিশাল বিশাল ও ভয়ংকর ভয়ংকর ফেরেশতারা রয়েছে, তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে।' দুটো হাদীসে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতেও কোনো সুনির্দিষ্ট চেহারা ও আকৃতি বুঝা যায় না। যেমন 'রসূল (স.) জিবরাঈলকে তার আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন' এবং 'জিবরীলের ছয়'শ ডানা রয়েছে।' সুতরাং বিষয়টা অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত। এ সব অদৃশ্য ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

দুটি, তিনটি ও চারটি করে ডানা থাকার উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকে যতো চান বাড়ান।' এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ইচ্ছার কোনো বাধা বন্ধন নেই এবং তাঁর সৃষ্টি কোনো আকৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষ পাখীর দুটো ডানার কথা জানে। আর আমাদের দেখা ও জানা সৃষ্টিজগতে আরো বহু অগণিত আকৃতির সৃষ্টি রয়েছে, আর আমাদের না জানা যে কত বেশী সৃষ্টি রয়েছে, তার তো কোনো সংখ্যাই আমাদের জানা নেই। 'আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান।' এ মন্তব্যটা পূর্ববর্তী যে কোনো মন্তব্যের চেয়ে ব্যাপকতর; সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর সৃষ্টি, নির্মাণ, পরিবর্তন ও পুনঃনির্মাণের ডিজাইন বা নকশার কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ

'আল্লাহ মানুষের জন্যে যে অনুগ্রহ অবমুক্ত করেন, তা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ......।' (আয়াত ২)

প্রথম আয়াতের শেষে আল্লাহর যে সীমাহীন শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াতে তারই একটা দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের মনে যখন এই দৃশ্যটা বদ্ধমূল হয় তখন তার পার্থিব জীবনে, তার চিন্তাচেতনায়, আবেগ অনুভূতিতে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এবং মূল্যবোধ ও মানদন্ডে সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ দৃশ্য আকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল শক্তি থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং একমাত্র আল্লাহর শক্তির সাথে তার সম্পর্কে জুড়ে দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকলের দয়া থেকে তাকে নিরাশ করে এবং একমাত্র আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রতি তাকে আশান্বিত করে । আকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল দরজা তার সামনে বন্ধ এবং শুধু আল্লাহর দরজাকেই উন্মুক্ত করে। তার সামনে আকাশ ও পৃথিবীর সকল পথ রুদ্ধ করে এবং শুধু আল্লাহর পথকেই খুলে দেয়।

আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি যে কত উপায়ে কত জিনিসের মাধ্যমে ঘটে, কে তার ইয়ত্তা রাখে? এমনকি, মানুষের নিজ সত্তার অভ্যন্তরে যে আল্লাহ তায়ালা কত অনুগ্রহ, কত নেয়ামত, কত সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এবং কত জিনিসকে যে তার অনুগত করেছেন, তার সীমা সংখ্যা তার অজ্ঞাত।

আল্লাহ তায়ালা যা যা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, তেমনি যা যা তিনি দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন তাতেও তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ যার জন্যে উন্মুক্ত করেছেন, সে প্রতিটা জিনিসে, প্রতিটা অবস্থায় ও প্রতিটা জায়গায়ই তা পায়। নিজের সত্ত্বায়, নিজের চিন্তা চেতনায় এবং আশপাশের পরিবেশেও তা দেখতে পায়। আর যেসব জিনিস না পাওয়াকে মানুষ বঞ্চনা মনে করে, সেসব জিনিস না পাওয়া এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সেসব জিনিস আটকে রাখাতেও আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ নিহিত থাকে তা সে যে স্থানে ও যে পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, আর যেসব জিনিস পাওয়াকে মানুষ প্রাপ্তি ও সন্তুষ্টির লক্ষণ মনে করে, সেসব জিনিস পাওয়াতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া নিহিত থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যে কোনো নেয়ামত থেকে যদি তাঁর রহমত ওঠিয়ে নেন, তবে সেই নেয়ামতও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর বাহ্যত যা দুঃখ কষ্টের কারণ মনে হয়, তাতে যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমত দান করেন, তবে তা নেয়ামতে পরিণত হয়। আল্লাহর রহমত যুক্ত হলে মানুষ কাঁটার ওপরও ঘুমাতে পারে এবং তা বিছানায় রূপান্তরিত হতে পারে, আর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলে মখমলের বিছানাও তার জন্যে কন্টকময় হতে পারে। আল্লাহর রহমত দ্বারা একান্ত কঠিন ও জটিলতম সমস্যারও সহজ সমাধান করা সম্ভব হয়, আর একটা অতি সহজ কাজও আল্লাহর রহমতের অভাবে জটিলতম সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। বিপজ্জনক, সংকটপূর্ণ অভিযানও আল্লাহর রহমতে অনায়াসে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধা হয়ে যায়। আর আল্লাহর রহমতের অভাবে একটা সাধারণ বিষয়ও ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়।

যেখানে আল্লাহর রহমত থাকে সেখানে কোনো সংকীর্ণতা থাকে না। সংকীর্ণতা শুধু সেখানেই, যেখানে আল্লাহর রহমত নেই। যার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ আছে সে কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে, নির্যাতন কক্ষে কিংবা বধ্যভূমিতে থাকলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। আর যার ওপর আল্লাহর রহমত নেই, সে যদি বিপুল ধনৈশ্বর্যের মধ্যেও লালিত পালিত হয় তবু তার দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। মোটকথা, আল্লাহর রহমত থাকলে মানুষের ভেতর থেকেই সুখ ও সৌভাগ্যের উৎস এবং শান্তি ও সন্তোষের ঝর্ণা ফুটে ওঠে। আর আল্লাহর রহমত না থাকলে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকেই দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি, অবসাদ ও দুঃখ শোকের অসংখ্য জ্বালামুখ বেরিয়ে আসে।

একমাত্র এই রহমতের দরজাটাই যদি খোলা থাকে, আর বাদ বাকী সমস্ত দরজা, জানালা ও পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কেননা যা কিছু প্রশস্ততা, সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা ও সাবলীলতা– সবই আল্লাহর রহমতের মাঝে নিহিত। আর এই দরজাটাই যদি বন্ধ থাকে তবে আর সব কিছুর দরজা খোলা থাকলেও আমাদের কোনো লাভ নেই। কেননা এ দরজা বন্ধ হওয়ার অর্থই হলো সংকীর্ণতা, অভাব, বিপদ, দারিদ্র্য ও কষ্ট।

আল্লাহর করুণার ধারা যদি প্রবহমান থাকে, তবে জীবিকা সংকীর্ণ হয় হোক, বসবাসের জায়গা সংকীর্ণ হয় হোক, জীবন দুর্বিষহ হয় হোক, শোয়ার বিছানা কন্টকাকীর্ণ হয় হোক, আমাদের তা নিয়ে কোনো ভাবনার দরকার নেই। কেননা আল্লাহর করুণার ধারাতেই নিহিত রয়েছে সমস্ত সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা, আর এই করুণার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে জীবিকার প্রাচুর্য যতোই থাক, দ্রব্য সামগ্রীর যতোই আধিক্য হোক– তাতে কোনো লাভ নেই। প্রাচুর্যের ভেতরেই দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও অভাব অনটন ভোগ করতে হবে।

ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি, স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান, সাম্রাজ্য– সবই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুঃখ ও দুর্বিপাকের উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যদি তা থেকে আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যখন রহমতের দুয়ার খুলে দেন, তখন তা শান্তি, তৃপ্তি, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর রহমত সহকারে জীবিকার প্রাচুর্য দেন, তখন তা পবিত্র সম্পদ ও প্রকৃত সুখের উৎস হয়। তা দুনিয়ায়ও তৃপ্তির উপায় আর আখেরাতেও পাথেয় হয়ে যায়। মহান আল্লাহ যেই তাঁর রহমত বর্ষণ বন্ধ করে দেন, অমনি তা হয়ে যায় ভীতি ও উদ্বেগের কারণ, ঈর্ষা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উস্কানি। জীবিকার প্রাচুর্যের সাথে সাথে যদি কৃপণতা বা কোনো রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে, তা হলে সম্পদ থাকলেও তা থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতে হয়, ভোগ করা আর কপালে জোটে না। আবার সম্পদের প্রাচুর্যের পাশাপাশি যদি দাম্ভিকতা বা অহংকার থাকে, তবে সেই সম্পদ কখনো কখনো ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা যদি সন্তান সন্ততি দেন এবং সেই সাথে তাঁর রহমতও দেন, তাহলে সেই সন্তান সন্ততি জীবনের অলংকার, সুখ শান্তির উৎস এবং পরকালের সওয়াবও বহুগুণ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সন্তান হয় তার সেই উত্তরাধিকারী, যে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আল্লাহ তায়ালা যদি রহমতের ধারা স্তব্ধ করে দেন, তাহলে হয়তো দেখা যাবে, সন্তানই মহাবিপদ মসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে দিনের ক্লান্তি ও অবসাদের কারণ আর হারাম করে দিয়েছে রাতের ঘুম।

আল্লাহ তায়ালা যদি ভালো স্বাস্থ্য ও শক্তি দেন, আর সেই সাথে নিজের রহমতও দেন, তবে তা হবে এক পবিত্র নেয়ামত, হবে পবিত্র জীবনের সূচক এবং যথার্থ আরামদায়ক জীবনের শুভ সূচনা, আর যদি রহমত না দেন, তাহলে এই স্বাস্থ্য ও শক্তি উল্টো মসিবতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা রহমতশূন্য সুস্বাস্থ্যকে একজন স্বাস্থ্যবান শক্তিমান মানুষের ওপর বোঝাস্বরূপ চাপিয়ে দেন। ফলে সে স্বাস্থ্য ও শক্তি এমন কাজে খরচ করে, যা শরীর ও আত্মা উভয়কেই ধ্বংস করে দেয় এবং আখেরাতের জন্যে ভয়াবহ পরিণতি অনিবার্য করে তোলে।

আল্লাহ তায়ালা যদি পদমর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সাথে তাঁর রহমতও দেন, তাহলে তা সংস্কার সংশোধনের হাতিয়ার, সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস এবং সৎকর্ম ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের পুঁজি গড়ে তোলার উপায় হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর রহমত যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে যুক্ত

না হয়, তাহলে তা হয় পতন-ভীতি, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা ও স্থীতিহীনতার আশংকায় ভারাক্রান্ত। ফলে পদ ও ক্ষমতার মালিক তা দুনিয়ায়ও যেমন আরামের সাথে ভোগ করতে পারে না, তা দ্বারা আখেরাতেও তেমনি দোযখ ছাড়া আর কিছুই সে অর্জন করতে সমর্থ হয় না।

প্রচুর জ্ঞান, দীর্ঘ আয়ুষ্কাল, উত্তম পদমর্যাদা ইত্যাদির সাথে আল্লাহর রহমত যুক্ত হলে তার ফলাফল এক রকম এবং যুক্ত না হলে অন্য রকম হয়ে থাকে। সামান্য জ্ঞানকেই আল্লাহ তায়ালা ফলপ্রসূ ও উপকারী বানাতে পারেন। ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণময় করে দিতে পারেন। সুখ ও সমৃদ্ধির ভান্ডার গড়ে দিতে পারেন সামান্য সম্পদ থেকে।

ব্যক্তির মতো সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। উল্লেখিত উদাহরণগুলোর ভিত্তিতে অন্যগুলোও অনুমান করে নেয়া যায়।

আপনি যদি আল্লাহর রহমত অনুভব করতে পারেন, তাহলে সেটাও আল্লাহর রহমতের আওতাভুক্ত। আল্লাহর রহমত আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কিন্তু আপনি যে তা অনুভব করতে পারেন, সেটাও আল্লাহর রহমত। আপনার আল্লাহর রহমত লাভের আশা, চেষ্টা সাধনা, তার প্রতি আপনার আস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে তার প্রত্যাশাও আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত, আর রহমত সম্পর্কে সংশয়, হতাশা কিংবা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়াই আসল আযাব। আল্লাহ তায়ালা কোনো মোমেনকে কখনো এ আযাব দেন না। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফে বলেন, 'আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফেররাই হতাশ হয়।' যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত কামনা করে ও তার যোগ্যতা লাভ করে, সে কোনো অবস্থাতেই তা থেকে বঞ্চিত হয় না। হযরত ইবরাহীম আগুনের ভেতরে বসেও আল্লাহর রহমত পেয়েছেন। হযরত ইউসুফ কুয়ার মধ্যে এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েও তা পেয়েছেন। হযরত ইউনুস মাছের পেটে বসেও পেয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) অসহায় অরক্ষিত অবস্থায় যখন সাগরে ভাসমান, ফেরাউন যখন তার শত্রু, তাকে খুঁজছে ও তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে আর সেই অবস্থায় তিনি যখন তারই প্রাসাদে বাস করছেন, তখন তিনি সে রহমত লাভ করেছেন। 'আসহাবুল কাহফ' যখন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দেশবাসী তাদেরকে বাড়ীঘরে খুঁজে পাচ্ছিলো না, তখন তারা আল্লাহর রহমতের আশ্রয়েই ছিলেন। তারা পরস্পরকে বলছিলেন, 'তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর রহমত বিস্তার করবেন।'

রসূল (স.) ও তাঁর সফরসংগী হযরত আবু বকর যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাঁদেরকে পদচিহ্ন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তখন তাঁরাও আল্লাহর রহমতের নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলেন। অন্য সব কিছু থেকে হতাশ হয়ে যারা কেবল আল্লাহর রহমতের কোলে আশ্রয় নিয়েছে, তারাও তা পেয়েছে। যারা অন্যান্য শক্তির দয়া ও করুণার পরিবর্তে শুধু আল্লাহর করুণা চেয়েছে, তাঁর দরজায় ধর্ণা দিয়েছে, তারা তা পেয়েছে।

আল্লাহ যখন তাঁর করুণার দুয়ার উন্মুক্ত করেন, তখন কেউ তা বন্ধ করতে পারে না এবং তিনি যখন বন্ধ করেন তখন কেউ তা খুলতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ভয় করা ও আর কারো কাছে কিছু আশা করার কোনো অর্থ নেই। কোনো জিনিসের সাথেও ভয় বা আশার সম্পর্ক থাকতে পারে না। কোনো শক্তি বা উপকরণের সাথেও নয়। শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় সাথে এর সম্পর্ক এবং তাঁর ইচ্ছার ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। ভয় ও আশার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাথে যুক্ত। 'তিনিই প্রতাপশালী ও বিজ্ঞানময়।' অর্থাৎ নিজের রহমত কোথায় বর্ষণ করবেন ও কোথায় করবেন না, সেটা তিনি নিজেই স্থির করেন এবং তার জন্যে

কারো কাছে তিনি জবাবদিহি করেন না, আর রহমত বিতরণ ও বন্ধ করেন এক সূক্ষ্ম কল্যাণকর উদ্দেশ্যে।

'আল্লাহ মানব জাতির জন্যে যে রহমত উন্মুক্ত করেন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না।'

সুতরাং মানুষের একমাত্র করণীয় হলো কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রহমত চাওয়া। মহান আল্লাহর প্রতি গভীর মনোনিবেশ, আনুগত্য, আশা ভরসা, আস্থা ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেকে রহমতের যোগ্য বানাতে হবে।

'আর যে রহমত তিনি বন্ধ করেন তা কেউ উন্মুক্ত করতে পারে না।'

সুতরাং তাঁর কোনো সৃষ্টির কাছে কিছুই আশা করা উচিত নয়। কাউকে ভয় করাও উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা যা বন্ধ করেন তা কেউ খুলতে পারবে না।

ভেবে দেখার বিষয় যে, এ আয়াত মানুষের মনমগযে কত প্রশান্তি, কত স্থিরতা এবং চিন্তা অনুভূতি, মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণায় কত স্বচ্ছতা এনে দেয়।

এই একটা মাত্র আয়াত গোটা মানব জীবনের একটা নতুন ছবি ও নতুন নকশা এঁকে দেয়। তার চেতনায় পার্থিব জীবনের জন্যে একটা স্বতন্ত্র ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধ ও মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। সেই মানদন্ড পৃথিবীর আর কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হয় না, তার উৎস মানুষ হোক, কোনো ঘটনা হোক বা কোনো বস্তু হোক।

এই একটা মাত্র নকশা যদি মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহলে তা পেরেকের মতো সেখানে দৃঢ়ভাবে বসে যাবে। হাজারো ঘটনা, হাজারো বস্তু, হাজারো ব্যক্তি, হাজারো শক্তি, হাজারো মূল্যবোধ এবং হাজারো চিন্তাধারাও তাকে আর নড়বড়ে করতে পারবে না। সমগ্র জ্বিন এবং মানুষ জাতিও যদি চেষ্টা করে তবু পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যখন তাঁর রহমতের দরজা বন্ধ করেন, তখন তারা তা খুলতে পারে না এবং তিনি যখন তা খোলেন, তখন তারা তা বন্ধ করতে পারে না।

এই আয়াতের মতোই এবং নকশার মতোই কোরআন ইসলামের প্রথম যুগের সেই বিস্ময়কর মানবগোষ্ঠীটাকে গড়ে তুলেছিলো। সে মানবগোষ্ঠীটাকে আল্লাহর চোখের সামনেই তৈরী করা হয়েছিলো, যাতে তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা প্রয়োগের একটা হাতিয়ারে পরিণত হয়, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথিবীতে বিশেষ আকীদা ও আদর্শ, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, মানদন্ড, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত সেই বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে, যা আজকাল আমাদের কাছে স্বপ্ন ও প্রাচীন যুগের রূপকথা বলে মনে হয়। সেই মানব গোষ্ঠীটা ছিলো আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী শক্তি। আল্লাহ তায়ালা যা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা প্রতিষ্ঠা করে এবং যা উৎখাত করতে চান তা উৎখাত করে। কেননা তারা শুধু কোরআনের শব্দ ও তার চমকপ্রদ অর্থের অনুকরণ করতো না, বরং সেই সাথে কোরআনের আয়াতগুলো যে সত্য তুলে ধরতো তার অনুকরণ এবং বাস্তবায়ন করতো।

সেই কোরআন আজও মানুষের হাতে রয়েছে। তার সেই আয়াতগুলো দিয়ে সে আজও এমন সব ব্যক্তি ও দল তৈরী করতে সক্ষম, যারা আল্লাহর মনোনীত ব্যবস্থা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করতে ও অমনোনীত ব্যবস্থা উৎখাত করতে পারে। তবে সেটা সে তখনই পারে, যখন এই নকশাগুলো তাদের মনে বদ্ধমূল হবে। এগুলো তারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে, তদনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে এবং এ নকশাকে এমন বাস্তব মনে করবে যেন হাত দিয়ে ধরা ও চোখ দিয়ে দেখা যায়।

এই আয়াত থেকে আমি আল্লাহর এমন একটা বিশেষ রহমতের সন্ধান পেয়েছি, যার জন্যে আমি আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ আয়াত আমি এমন এক সময়ে অধ্যায়ন করি যখন আমি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে কালাতিপাত করছি। এ আয়াত যখন পড়ি, তখন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়, আমার হৃদয় মুহ্যমান এবং আমি শোচনীয় দুর্দশার শিকার। ঠিক এহেন মুহূর্তেই এ আয়াত আমার সামনে আসে। আল্লাহ তায়ালা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। এর তাৎপর্য তিনি আমার অন্তরে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিলেন, যেন আমি আমার সমগ্র সত্তায় একটা পানীয় ছড়িয়ে পড়ার রেশ অনুভব করছি। আমার মনে হচ্ছে যেন আয়াতের শুধু মর্মার্থই উপলব্ধি করছি না; বরং একটা সত্যের স্বাদ উপভোগ করছি। স্বয়ং এ সত্যটাই ছিলো একটা রহমত। এ রহমত আমার কাছে আয়াতের তাৎপর্য সম্বলিত একটা বাস্তব ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। এ আয়াত আমি আগেও বহুবার পড়েছি। বহুবার অতিক্রম করেছি এ আয়াতকে, কিন্তু মনে হয় এইমাত্রই তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলাম। এখনই এ আয়াত বুঝি তার প্রকৃত মর্ম আমার কাছে উন্মোচিত করলো। আমাকে বললো, 'এই নাও, সানন্দে গ্রহণ করো আল্লাহর উন্মোচিত রহমতের একটা নমুনা। দেখো, রহমত কেমন হয়।'

এরপর যদিও আমার চারপাশের কোনো জিনিস বদলে যায়নি। কিন্তু আমার অনুভূতিতে সব কিছু বদলে গেছে। বিশ্বজগতের অসংখ্য সত্যের মধ্য থেকে একটা মহাসত্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারাটাও একটা বিরাট নেয়ামত। সেই রকম একটা মহাসত্য এই আয়াতেও রয়েছে। এ নেয়ামত মানুষ উপভোগ ও অনুভব করতে পারে, কিন্তু তার ছবি আঁকা ও অন্যদের কাছে তার লিখিত বিবরণ দেয়া খুব কমই সম্ভব হয়ে থাকে। আমি এ মহাসত্য চিনেছি, উপভোগ করেছি ও আস্বাদন করেছি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন, কষ্টকর ও নীরস মুহূর্তে। এর ফলে আমি এই কষ্টকর মুহূর্তের আনন্দ, প্রফুল্লতা এবং সকল কষ্ট ও বন্ধন থেকে আরামদায়ক মুক্তি লাভ করেছি। অথচ আমি একই স্থানে রয়েছি। মহান আল্লাহ তাঁর যে কোনো একটা আয়াতে তাঁর রহমতের ফল্গুধারা উন্মোচিত করতে পারেন, খুলে দিতে পারেন তাঁর করুণার দুয়ার। কোরআনের এক একটা আয়াত এভাবে আলোর ভান্ডার খুলে দিতে পারে, করুণার ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারে। সন্তোষ, আস্থা, তৃপ্তি ও শান্তির পথ সুগম করে দিতে পারে চোখের পলকে। 'হে মহান আল্লাহ, তোমার জন্যে সকল প্রশংসা। কোরআনকে মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত হিসাবে প্রেরণকারী হে মহান আল্লাহ, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো।(১)

---

(১) এই তাফসীরের লেখক শহীদ সাইয়েদ কুতুব (র.) এ সময় তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় অতিবাহিত করছিলেন। এ সময়টাতেই কারাগারে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। ইখওয়ানুল মোসলেমুনের জন্মান্ধ বর্ষীয়ান আলেম শেখ আবদুল হামীদ কেশক-এর বর্ণনামতে এ সময়ে কারাগারে মুসলমান নামের কলংক জামাল নাসেরের ভাড়াটে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা তাঁর ওপর শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলো। যালেমরা ভেবেছিলো, সকালে উঠে তারা দেখবে সাইয়েদের দেহ শিকারী কুকুর ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, কিন্তু ভোরের আলোতে তারা দেখলো, সাইয়েদ কুতুব নামায পড়ছেন এবং শিকারী কুকুরটি তাঁকে অন্য সব মানুষরূপী 'কুকুরগুলোর অত্যাচার থেকে পাহারা দিচ্ছে। তাঁর জীবনের এই কঠিন সময়ের সামান্য কিছু অনুভূতিই এ কথাগুলোতে স্থান পেয়েছে। –সম্পাদক

এই বিশেষ আলোকময় মুহূর্তটার বিবরণ দেয়ার পর আবার ফিরে যাচ্ছি সূরার মূল বক্তব্যে। তৃতীয় আয়াতেও দেখতে পাচ্ছি প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন ও সত্যায়ন করা হয়েছে। মানুষকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে। স্মরণ করানো হচ্ছে, যিনি একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র রেযেকদাতা ও একমাত্র মাবুদ সেই আল্লাহর নেয়ামতের কথা। এই অকাট্য, সুস্পষ্ট সত্য থেকে মানুষ কিভাবে বিপথগামী হয়, সে ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে—

'হে মানব জাতি, তোমাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা এমন আছে কি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের জীবিকা দিয়ে থাকেন।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দেন, তার কেবল উল্লেখ ও স্মরণই যথেষ্ট। আসলে তা সুস্পষ্ট। সবাই তা দেখতে পায়, অনুভব করে ও স্পর্শ করে। অথচ তা ভুলে যায়। তাই তার উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

মানুষের চারপাশে আকাশ ও পৃথিবী তাকে নিরন্তর নেয়ামতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পদক্ষেপে তাকে এনে দিচ্ছে রকমারি জীবিকা, রকমারি সুখ ও কল্যাণের উপকরণ, মহান স্রষ্টা আকাশ ও পৃথিবী থেকে উৎপন্ন করছেন এ সব নেয়ামত তাঁর সৃষ্টির জন্যে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা কি কোথাও আছে যে, এতো সব নেয়ামত দিতে পারে?

এমন দাবী করার কোনো অধিকার তাদের নেই। জঘন্যতম শেরেক ও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েও তারা এ ধরনের দাবী করে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা যখন নেই, তখন তাদের আল্লাহকে স্মরণ ও আল্লাহর শোকর না করার কী কারণ ও কী যুক্তি থাকতে পারে? একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা এবং এক মনে এক ধ্যানে কেবল তাঁরই আনুগত্য না করার কী কারণ থাকতে পারে 'আল্লাহ ছাড়া যখন আর কোনো মাবুদ নেই' তখন এই সন্দেহাতীত সত্যে ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে? 'তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? অর্থাৎ তাদের সামনে প্রকাশ্যে জীবিকা আসছে, এই অনস্বীকার্য সত্য যে কেউ উপেক্ষা করতে পারে, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এমন প্রকাশ্য সত্য অস্বীকার করতে না পেরেও আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর না করে মানুষ কিভাবে পারে এটা সত্যই আশ্চর্যজনক।

সূরার এই তিনটি তীব্র কষাঘাতপূর্ণ বাণীই এর প্রথম অংশ। এর প্রত্যেকটা বাণীতেই এমন দৃশ্য রয়েছে, যা মানুষের মন মগযে বদ্ধমূল হলে তাকে নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারে। সঠিকভাবে এ আয়াত তিনটি পরস্পরের পরিপূরক ও সমন্বয়কারী।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا
يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ⑤ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا
يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑥ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ أَفَمَنْ
زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ⑧

৪. (হে নবী,) যদি এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তাহলে উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা), তোমার আগেও নবীদের (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিলো; আর সব কিছু তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। ৫. হে মানুষ, (আখেরাত সম্পর্কিত) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, সুতরাং দুনিয়ার এ জীবন যেন তোমাদের কোনোদিনই প্রতারিত করতে না পারে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় ফেলতে না পারে (সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকবে)। ৬. শয়তান হচ্ছে তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো; সে তার দলবলদের এ জন্যেই আহ্বান করে যেন তারা (তার আনুগত্য করে) জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে; ৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে এক কঠিন শাস্তি রয়েছে, (অপরদিকে) যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (তোমার মালিকের) ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

রুকু ২

৮. অতপর সে ব্যক্তি– যার খারাপ কর্মকান্ড (তার চোখের সামনে) শোভন করে রাখা হয়েছে, সে অবশ্য তাকে উত্তম (কাজ) হিসেবেই দেখতে পায়; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তাকে) গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান (তাকে) তিনি হেদায়াত দান করেন, তাই (হে নবী,) তাদের ওপর আক্ষেপ করতে গিয়ে (দেখো,) তোমার জীবন যেন বিনষ্ট হয়ে না যায় (তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কেননা); ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

তাফসীর

আয়াত ৪–৮

সূরার প্রথমাংশে যে তীব্র প্রভাবশালী তিনটি বাণী ও যে কটা প্রধান সত্য উচ্চারিত হয়েছে, তাহলো মহান স্রষ্টার একত্ব, তাঁর একক ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে রহমত ও করুণার বর্ণনা এবং একমাত্র জীবিকাদাতা হিসাবে তাঁর উল্লেখ।

দ্বিতীয় অংশটাতে প্রথমে রসূলের প্রতি কাফেরদের মিথ্যারোপ ও প্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে। বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ও অকাট্য। অতপর তাদের শয়তান সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যেন সে তাদের উল্লেখিত মহাসত্যগুলো সম্পর্কে ধোঁকা দিতে না পারে এবং তাদের জাহান্নামে ঠেলে দিতে না পারে। সে হচ্ছে মানুষের আসল শত্রু। তারপর জানিয়ে দেয়া হয়েছে মোমেনদের কর্মফল কেমন হবে, আর চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণতিই বা কেমন হবে। সবার শেষে পুনরায় রসূল (স.)-কে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন কাফেরদের ব্যাপারে আক্ষেপ না করেন। কেননা হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে। মানুষ কী কাজ করে তা তিনি জানেন।

সত্যগুলো সুস্পষ্ট ও অকাট্য। এগুলোকে তারা যদি মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই এবং কোনো দায় দায়িত্ব নেই। কেননা তুমি নতুন কোনো রসূল নও। 'তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে।' সমগ্র ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার ও কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান এবং এর কার্যকারণ ও উপকরণ। এর ফলাফল আল্লাহর হাতে, তিনি যেভাবে চান এর নিষ্পত্তি করবেন।

পার্থিব জীবন যেন মোমেনদের প্রতারিত না করে

মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন,

হে মানব জাতি! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারণা না করে।' (আয়াত ৫-৬)

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অর্থাৎ কেয়ামত ও আখেরাতের কর্মফলের প্রতিশ্রুতি সত্য অকাট্য। কেয়ামতের হিসাব নিকাশ ও কর্মফল অবধারিত, সন্দেহাতীত। ওটা সত্য এবং সত্য কার্যকরি না হয়ে ছাড়ে না। সত্য কখনো বৃথা যায় না, বাতিল হয় না, তামাদি হয় না। তবে পার্থিব জীবন সেই সত্য ভুলিয়ে দেয় ও ধোঁকায় ফেলে দেয়।

'অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।'

শয়তানও ধোঁকা দেয় ও ভুলিয়ে দেয়। কাজেই তাকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ দিয়ো না। 'ধোঁকাবাজ শয়তান যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়।' শয়তান তোমাদের বিরুদ্ধে তার শত্রুতার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে এবং বার বার করেছে। 'কাজেই তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করো।' অর্থাৎ তার কাছে দুর্বল হয়ো না। তার দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাকে হিতাকাংখী মনে করো না। তার পদাংক অনুসরণ করো না। কোনো ব্যক্তি জেনে শুনে তার শত্রুর পদাংক অনুসরণ করে না। কেননা সে কখনো কল্যাণ ও মুক্তির দিকে ডাকে না। 'সে তো তার দলকে জাহান্নামের অধিবাসী হবার আহ্বান জানায়।' কাজেই এমন কোনো বুদ্ধিমান থাকতে পারে কি, যে জাহান্নামের অধিবাসী হবার আহ্বানকারীর কথায় কর্ণপাত করতে পারে?

এ হচ্ছে বিবেককে সচকিত ও সচেতন করার একটা প্রয়াস। কেননা মানুষ যদি শয়তান ও তার মধ্যকার চিরস্থায়ী যুদ্ধের কথা স্মরণ রাখে, তাহলে সে সর্বশক্তি দিয়ে, সমস্ত চেতনা ও বুদ্ধি দিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হবেই, শয়তানের ধোঁকা প্রতিহত করবেই। শয়তানকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না এবং আল্লাহর মানদন্ডে রেখে চিরশত্রু শয়তানের প্রতিটা গোপন চক্রান্ত বুঝবার চেষ্টা করবে।

কোরআন মানুষের বিবেকে এই সচেতনতাই জাগিয়ে তুলতে চায়। শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা প্রতিরোধ করার প্রেরণা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করতে চায়। তার শত্রুর প্রত্যেকটা প্রকাশ্য ও গোপন প্ররোচনা থেকে তাকে সতর্ক করে। তাকে সকল অকল্যাণ ও অপকর্মের পথ থেকে দূরে থাকবার জন্যে উদ্দীপিত করে। তার সকল গোপন ও প্রকাশ্য ইংগিত সংকেত থেকে হুঁশিয়ার করে। তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, শয়তানের সাথে তার যুদ্ধ দুনিয়ার জীবনে কোনোদিন থামবে না। তাই এ যুদ্ধের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

পরবর্তী আয়াতে এই সতর্কতা, প্রস্তুতি, প্রতিরোধ চেতনাকে দৃঢ় ও সতেজ করার জন্যে শয়তানের আহ্বানে সাড়াদানকারী কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী মোমেনদের শুভ পরিণামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

'যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব, আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্যে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।' (আয়াত ৭)

এ আলোচনার পরেই গোমরাহীর প্রকৃতি চিত্রায়িত হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে শয়তান কিভাবে কাজ করে, কিভাবে সে সকল অপকর্মের পথ খুলে দেয়, কিভাবে সে গোমরাহীর সেই পথ উন্মুক্ত করে দেয়, যে পথে কেউ অনেক দূরে চলে গেলে ফিরে আসতে পারে না। 'যাকে মন্দ কাজ শোভনীয় করে দেখানো হয়, ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে। ....'

অর্থাৎ সকল অপকর্মের চাবিকাঠি ও উৎস এটাই যে, শয়তান মানুষের সামনে তার মন্দ কাজগুলোকে সুন্দর শোভনীয় করে দেখায়, ফলে সে সেগুলোকে ভালো কাজই মনে করতে থাকে। মানুষ শয়তানের এই ধোকায় পড়ে নিজেকে ও নিজের সব কাজকে পছন্দ করতে থাকে। নিজের কাজে কোনো ভুলত্রুটি বা খুঁত আছে কিনা, তা খোঁজ করার প্রয়োজন বোধ করে না। কেননা সে নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, সে ভুল করে না। সে নিশ্চিত থাকে যে, সে সব সময় সঠিক কাজ করে। তার সব কাজে সে আত্মতৃপ্তি বোধ করে। নিজের ব্যাপারে সে ঘোরতর ভ্রান্তিতে লিপ্ত। আত্মসমালোচনার প্রয়োজনের কথা তার কল্পনায়ও আসে না। কোনো ব্যাপারে নিজের কাজের হিসাব নেয়ার দরকার আছে কি না তা সে ভাবেই না। স্বভাবতই সে অন্যকেও নিজের কাজ বা মতামতের সমালোচনা করতে দেয় না। কেননা নিজের চোখে সে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে। তার অনুভূতি সব সময় নিজের সম্পর্কে ভালো ও তৃপ্তিকর। কাজেই সমালোচনার কোনো অবকাশ নেই। তার কোনো খুঁত ও অসম্পূর্ণতা নেই।

এটাই মানুষের ওপর শয়তানের পক্ষ থেকে আমদানি করা সবচেয়ে বড় মসিবত। এই পথ ধরে সে মানুষকে প্রথমে বিভ্রান্তির দিকে এবং পরে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা যার কপালে হেদায়াত ও ভালাই রাখেন, তার অন্তরে তীব্র অনুভূতি, সতর্কতা, আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার মনোভাব সৃষ্টি করে দেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা কখন তার কোনো অঘটন ঘটান, সে সেই চিন্তায় অস্থির থাকে, এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্ত থাকে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কোনো বিপাকে ফেলবেন না, তার মনে কোনো বক্রতা বা পরিবর্তন আসবে না, তার কোনো ভুল বা পদস্খলন হতে পারে না, তার কোনো খুঁত বা অক্ষমতা দেখা দিতে পারে না। সে অনবরতই নিজের কাজের সমালোচনা করে। শয়তান থেকে সব সময় সতর্ক থাকে। সব সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকে।

হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে এবং ধ্বংস ও কল্যাণের মধ্যে এটাই সীমানা চিহ্ন। এটা একটা সূক্ষ্ম ও সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য, যাকে কোরআন মাত্র কয়েকটা শব্দে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে।

'যে ব্যক্তির মন্দ কাজকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে, ফলে সে মন্দ কাজকে ভালো কাজ হিসাবে দেখে।'

বস্তুত এ হচ্ছে বিপথগামী, ধ্বংসোন্মুখ ও অশুভ পরিণতির দিকে ধাবমান মানুষের নমুনা। এ সব কিছুর চাবিকাঠি হলো এই সুশোভিতকরণ। এটাই হলো ধোকা ও প্রতারণা। এটাই হলো সেই পর্দা, যা চোখ ও হৃদয় অন্ধ করে দেয়। ফলে মানুষ পথের বিপদ দেখতে পায় না। সে সৎকাজও করে না। কেননা সে মনে করে, সে যা কিছু করছে তার সবই সৎকাজ, যদিও তা আসলে খারাপ কাজ, সে নিজের কোনো ভুল সংশোধন করে না। কেননা সে আত্মবিশ্বাসী যে, তার কোনো ভুল হয় না। সে কোনো অন্যায় পরিত্যাগ করে না। কেননা সে নিশ্চিত, সে কোনো অন্যায় করে না। তার অন্যায় অপকর্মের কোনো শেষ সীমা থাকে না। কেননা সে মনে করে, প্রতি পদক্ষেপেই সে ভালো কাজ করে যাচ্ছে।

তাই এটাই সকল অন্যায় ও অপকর্মের উৎস। এটাই চূড়ান্ত গোমরাহীর চাবিকাঠি। আয়াতে প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয়া হয়নি।

'যে ব্যক্তির মন্দ কাজকে সুশোভিত করা হয়েছে, ফলে সে মন্দকেই ভালো দেখতে পায়, সে কি?'

এর জবাব দেয়া হয়নি, যাতে এর সাথে সব জবাবই খাটে। যেমন বলা যেতে পারে, এ ধরনের লোকের সংশোধনের কি আশা করা যায়? এ ধরনের লোক কি সেই ব্যক্তির মতো হতে পারে যে আত্মসমালোচনা করে ও আল্লাহকে ভয় করে? সে কি খোদাভীরু বিনয়ী লোকদের সমান হতে পারে? অনুরূপ আরো অনেক জবাব হতে পারে। কোরআনে এই স্টাইলের প্রশ্ন প্রচুর রয়েছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে এই সব জবাবেরই একটা দেয়া হয়েছে পরোক্ষভাবে।

'আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান বিপথগামী করেন ও যাকে চান সুপথগামী করেন। তোমার মন যেন তাদের সম্বন্ধে আক্ষেপ না করে।'

যেন বলা হচ্ছে, এ ধরনের লোকের জন্যে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহী ও বিপথগামিতাই বরাদ্দ করে রেখেছেন। শয়তান তার অপকর্মকে ভালো কাজ বানিয়ে দেখানোর কারণে এবং তাকে এরূপ গোমরাহীর পথে ঠেলে দেয়ার কারণেই সে এর যোগ্য হয়েছে। কোনো পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এরপর আর সুপথে ফিরে আসতে পারে না।

'বস্তুত আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন।'

অর্থাৎ গোমরাহীর প্রকৃতিই এ রকম যে, তাকে এদিকে চালিত করে, আর সুপথগামিতারও প্রকৃতিই এ রকম যে, তাকে সুপথে চালিত করে। অসৎ কাজকে ভালো কাজ হিসাবে দেখাই গোমরাহীর প্রকৃতি। আর ভালো মন্দ প্রত্যেক কাজের আত্মসমালোচনা, আত্মজিজ্ঞাসা, সতর্কতা, সচেতনতা ও আল্লাহভীতি হলো হেদায়াতের প্রকৃতি। এটাই হলো হেদায়াত ও গোমরাহীর শেষ সীমারেখা। আর যেহেতু এটাই চিরাচরিত রীতি– 'তাই তোমার মন যেন তাদের ওপর আক্ষেপ না করে।'

বস্তুত হেদায়াত ও গোমরাহীর এই নীতিটা কোনো মানুষের হাতে নয়, এমনকি রসূল (স.)-এর হাতেও নয়। এটা স্বয়ং আল্লাহর হাতে থাকে। মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝে থাকে। তাই তিনি তার অন্তরকে যেমন খুশী ঘুরান ও বদলান। এই সত্যটা ব্যক্ত করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যাতে তাঁর উদার, দয়ালু ও মমতাময় হৃদয় তাঁর জাতির গোমরাহী ও গোমরাহীর ফলে তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখে অস্থির ও বিচলিত না হয়। যাতে তার মনে তাদের হেদায়াত লাভ করা ও তার দেয়া সত্যের দাওয়াত মেনে নেয়ার আশা যেন তিনি ছেড়ে দেন। বস্তুত এই আশা মানুষের জন্যে স্বাভাবিক। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের অনুভূতির এই তীব্রতাকে কোমল ভাষায় প্রশমিত করছেন এবং বুঝাচ্ছেন যে, এটা তোমার হাতের ব্যাপার নয়; বরং এটা আমার হাতের ব্যাপার।

সকল যুগের ইসলাম প্রচারকরাই পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে দাওয়াত দেয়ার পর এই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কেননা এই দ্বীনের মূল্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণময়তা তারা সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করে থাকেন। অথচ চোখের সামনে তারা দেখতে পান, মানুষ এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে। এর সৌন্দর্য ও সুফল বুঝতে পারছে না এবং এর সত্যতা ও সর্বাংগীণ কল্যাণ উপভোগ করতে পারছে না। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবোধ দেয়া এই বিষয়টা উপলব্ধি করেই প্রচারকদের প্রচার কাজ করা উচিত এবং সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও কে তা গ্রহণ করলো বা প্রত্যাখ্যান করলো তার পরোয়া না করা ও আক্ষেপ না করা উচিত।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।'

বস্তুত তাদের কার্যকলাপের সত্যিকার পরিচয় জেনেই তিনি তাদের মধ্যে কাউকে হেদায়াত ও কাউকে গোমরাহী বরাদ্দ করেন। হেদায়াত ও গোমরাহী দেখা দেয়ার আগেও তিনি জানেন পরেও তিনি জানেন, কারা কারা হেদায়াত লাভ করবে এবং কারা লাভ করবে না। তিনি তার আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে এই বরাদ্দ করে থাকেন। তবে হেদায়াত বা গোমরাহী বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার পরেই তাদের কর্মফল দান করেন।

এই পর্যায়ে এসে সূরার দ্বিতীয় অংশটা শেষ হচ্ছে। এটা প্রথম অংশের সাথেই যুক্ত এবং পরের অংশের সাথেও এর সমন্বয় রয়েছে।

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۞ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى

৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পরে তা আমি (এক) নির্জীব ভূখন্ডের দিকে নিয়ে যাই, এরপর (এক পর্যায়ে) তা দিয়ে যমীনকে তার নির্জীব হওয়ার পর পুনরায় আমি জীবন্ত করে তুলি; ঠিক এভাবেই (একদিন মানুষেরও) পুনরুত্থান (হবে)। ১০. (অতএব) যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে (তার জানা উচিত), যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তাঁর দিকে শুধু পবিত্র বাক্যই উঠে আসতে পারে, আর নেক কাজই তা (উচ্চাসনে) ওঠায়; যারা (সত্যের বিরুদ্ধে) নানা ধরনের মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব; তাদের সব চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে। ১১. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর একবিন্দু শুক্র থেকে (তিনি জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন), এরপর তোমাদের তিনি (নর নারীর) জোড় বানিয়েছেন; (এখানে) কোনো নারীই গর্ভবতী হয় না এবং সে কোনো সন্তানও প্রসব করে না, যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (পূর্বাহ্নেই মজুদ) থাকে না; (আবার) কারো বয়স একটু বাড়ানো হয় না এবং একটু কমানোও হয় না, যা কোনো গ্রন্থে (সংরক্ষিত) নেই; নিসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিতান্ত সহজ ব্যাপার। ১২. দুটো (পানির) সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি হচ্ছে লোনা ও বিস্বাদ; তোমরা (এর) প্রত্যেকটি থেকেই (মাছ শিকার করে তার) তাজা গোশত আহার করো এবং (মুক্তার) অলংকার বের করে আনো এবং তোমরা আরও দেখতে পাও কিভাবে সেখানে

الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٢ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝١٣ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝١٤

জলযানসমূহ পানি চিরে চলাচল করে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ তায়ালার দেয়া রেযেক অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে করে (তাঁর প্রতি) তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। ১৩. তিনিই রাতকে দিনের ভেতর এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এরা সবাই এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের সবার মালিক, সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়। ১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো-(প্রথমত) তারা তো শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উত্তর দেবে না; (উপরন্তু) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের এ শেরেক (-এর ঘটনা) অস্বীকার করবে; (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।

তাফসীর

আয়াত ৯-১৪

এই তৃতীয় অংশটায় কোরআন ঈমানের প্রাকৃতিক প্রমাণগুলো উপস্থাপন করেছে। মনের চোখে ও চামড়ার চোখে প্রকৃতির যে দৃশ্যাবলী দেখা যায় তা থেকেই এই অকাট্য প্রমাণগুলো পেশ করেছে।

ইতিপূর্বে হেদায়াত ও গোমরাহী, কাফেরদের পক্ষ থেকে রসূলের প্রতি উপেক্ষাজনিত বিষণ্নতা দূর করার জন্যে আল্লাহর প্রবোধ ও সান্ত্বনা এবং প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত মহান আল্লাহর হাতে সমর্পণের কথা বলার অব্যবহিত পরই সূরার এ অংশটা আসছে। অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক। প্রকৃতির জগতে ঈমানের এ সব প্রমাণ সুস্পষ্টভাবেই বিরাজ করছে। আর যার ইচ্ছা হয় গোমরাহ হয়ে যাক। তবে সে গোমরাহ হলেও যুক্তি প্রমাণ পাওয়ার পরই গোমরাহ হবে। কেননা প্রমাণগুলো তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে।

প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা ঈমানের প্রমাণসমূহ

এ আয়াতগুলোতে নির্জলা নিষ্ফলা মাটির উর্বর ও শস্য শ্যামল হওয়ার দৃশ্য রয়েছে। এ দৃশ্যে মানুষের ইহকালীন জীবনের অবসানের পর পুনরুজ্জীবন ও পরকালের জীবনের প্রমাণ রয়েছে। মানুষের মাটি থেকে জন্মলাভ ও তারপর এমন উন্নত মানের সৃষ্টিতে রূপান্তরেরও প্রমাণ রয়েছে। তার সৃষ্টির ও জীবনের প্রত্যেকটা স্তর এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে চলে।

দুটো সমুদ্রের দু'রকম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ায়ও প্রমাণ রয়েছে মহান স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার। উভয় সমুদ্রে মানব জাতিকে আল্লাহর দেয়া এতো বিপুল নেয়ামত সামগ্রী রয়েছে, যার জন্যে তাদের আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আল্লাহকে চেনা উচিত।

রাত ও দিন যেভাবে একটার পর আর একটা আসে এবং ছোট বড় হয়, সে দৃশ্যেও মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং একত্বের প্রমাণ রয়েছে। তিনি যে চমৎকার পরিকল্পক ও ব্যবস্থাপক, এতে তার প্রমাণও রয়েছে। অনুরূপভাবে সূর্য ও চন্দ্রের দৃশ্যেও প্রমাণ রয়েছে। সূর্য চন্দ্র উভয়ই মহাবিশ্বের এই নিখুঁত বিস্ময়কর ব্যবস্থার অধীন ও অনুগত।

বিশালায়তন ও সুপ্রশস্ত এই প্রাকৃতিক জগতে বিরাজমান এ জিনিসগুলোর সবই অকাট্য প্রমাণ। মহান আল্লাহ এ সবের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। কাফের মোশরেকরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য যে সব জিনিসের বা প্রাণীর উপাসনা করে সেসব তো খেজুরের আঁটির বাকলেরও মালিক নয়। তারা কারো প্রার্থনা শোনে না, সাড়াও দেয় না। উপরন্তু কেয়ামতের দিন তাদের বিপথগামী উপাসকদের সকল উপাসনা বন্দনা অস্বীকার করবে। সুতরাং সত্য অস্বীকার করার পর গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

'আর তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন, সেই বাতাস মেঘকে পরিচালিত করে, অতপর আমি সেই মেঘকে একটা মৃত শহরের দিকে পাঠাই।' (আয়াত ৯)

কোরআনে ঈমানের প্রাকৃতিক প্রমাণাদি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এ দৃশ্যটা বার বার দেখানো হয়। এ দৃশ্যে রয়েছে বাতাস কর্তৃক সমুদ্র থেকে মেঘমালার সৃষ্টি। বাতাস দু'রকমের, গরম ও ঠান্ডা। গরম বাতাস সমুদ্রের পানি থেকে বাষ্প উৎপন্ন করে আর ঠান্ডা বাতাস এই বাষ্পকে ঘনীভূত করে মেঘ বানায়। এরপর আল্লাহ তায়ালা বাতাসের প্রবহমান স্রোত দ্বারা এই মেঘমালাকে মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরে পাঠান। মেঘমালা কখনো ডানে কখনো বামে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যেখানে পাঠাতে মনস্থ করেন সেখানে গিয়ে উপনীত হয়। সাধারণত এমন কোনো অঞ্চলে উপনীত হয়, যেখানে অনাবৃষ্টি ও খরার দরুন অজন্মা দেখা দিয়েছে। মহান আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে সেই অঞ্চলে এই মেঘ দ্বারা বৃষ্টি দিয়ে নবজীবনের সমারোহ ঘটানো হয়। পানিই হলো পৃথিবীতে সব জিনিসের জন্মের উৎস। 'অতপর সেই মেঘ দিয়ে আমি মৃত মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করি।' এভাবে এই অলৌকিক কান্ড ঘটে যায়। এ অলৌকিক কান্ড প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে। অথচ এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। প্রতি মুহূর্তে এই অলৌকিক কান্ড ঘটা সত্তেও মানুষ আখেরাতের পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করে। অথচ পৃথিবীতে তাদের চোখের সামনেই এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া চলে। 'এ ভাবেই পুনরুজ্জীবন সম্পন্ন হয়।' অর্থাৎ অতি সহজে, অনায়াসে এবং কোনো বিতর্ক ও জটিলতা ছাড়াই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

কোরআনে ঈমানের প্রাকৃতিক প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে এই দৃশ্য বার বার দেখানোর কারণ এই যে, এটা অত্যন্ত বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রমাণ এবং এটা অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই। তাছাড়া এ দৃশ্যটা নিয়ে মানুষ যখন সচেতনভাবে চিন্তা ভাবনা করে, তখন তা হৃদয়কে

প্রবলভাবে নাড়া দেয়, আলোড়িত করে। এটা মানুষের অনুভূতিকে স্পর্শ করে ও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে সে এ থেকে গভীর শিক্ষা লাভ করে। এটা চমৎকার, মনোমুগ্ধকর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য। বিশেষত মরু অঞ্চলে, যাকে আজ নির্জলা নিষ্ফলা দেখা গেলেও কালই হয়তো দেখা যাবে পানির প্রভাবে সুজলা সুফলা হয়ে গেছে। কোরআন মানুষের চেনা জানা পরিবেশ থেকেই শিক্ষামূলক দৃশ্য গ্রহণ করে, যা সে প্রতিনিয়ত দেখে, কিন্তু দেখে উদাসীনভাবে। চর্মচক্ষু ও অন্তশ্চক্ষু দিয়ে এগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তা মানুষকে বিস্মিত ও আলোড়িত না করে পারে না।

ঈমান ও ইসলামই হচ্ছে মর্যাদা লাভের একমাত্র উপায়

মৃত ও উষর মাটিকে সজীবতা উর্বরতা দানের দৃশ্য থেকে বিস্ময়করভাবে একটা মনস্তাত্ত্বিক ও একটা অনুভূতি-নির্ভর বিষয়ে আলোচনার পট পরিবর্তন ঘটেছে। পট পরিবর্তন ঘটেছে উচ্চতা, মর্যাদা, সম্মান, প্রতাপ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে। তারপর এই বিষয়টাকে উত্তম ও মহৎ বাণীর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা মহান আল্লাহর কাছে ওঠে যায়। এটা সংযুক্ত করা হয়েছে সৎ কাজের সাথেও, যাকে আল্লাহ তায়ালা আরো সমুন্নত করেন। সেই সাথে এর বিপরীত দিকটাও তুলে ধরা হয়েছে। এই দিকটা হলো ষড়যন্ত্র ও কুটিল চক্রান্তের যা পতনশীল ও ধ্বংসশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

‘যে ব্যক্তি সম্মান চায়, তার জানা উচিত, সম্মান কেবল আল্লাহর জন্যে। পবিত্র কথা তাঁর কাছেই ওঠে যায়। আর সৎকাজকে আল্লাহ আরো সমুন্নত করেন আর যারা কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে।’

খরা উপদ্রুত নির্জীব ভূমির পুনরুজ্জীবনের সাথে পবিত্র কথা ও সৎকাজের যোগসূত্রটা সম্ভবত পবিত্র জীবন, যা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। তাছাড়া জীবন ও সৃষ্টি জগতের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, সেটাও নির্জীব ভূমি এবং পবিত্র কথা ও কাজের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই যোগসূত্রের কথা সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে। তুমি কি দেখনি, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে পবিত্র কথার উদাহরণ হিসাবে পবিত্র বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন, যার মূল মাটিতে প্রতিষ্ঠিত এবং শাখা প্রশাখা আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বৃক্ষ তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতি মুহূর্তে তার খাদ্য সরবরাহ করে। আর মানুষ যাতে স্মরণ করে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা রকমারি উদাহরণ দেন, ‘আর অপবিত্র কথা অপবিত্র বৃক্ষের মতো, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উৎখাত হয়ে যায় এবং তার কোনো স্থিতি থাকে না।’ কথা ও বৃক্ষের স্বভাব প্রকৃতি এবং উভয়ের জীবন ও বিকাশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ বাস্তব উপমা। বৃক্ষ যেমন বাড়ে, বড় হয় ও ফল দেয়, ঠিক তেমনি কথাও বাড়ে, প্রসার লাভ করে ও ফলপ্রসূ হয়।

মক্কার কোরায়শরা তাদের ধর্মীয় মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্যে শেরেক করতো। কেননা এই ধর্মীয় মর্যাদা ও শেরেকী আকীদা বিশ্বাসের কল্যাণেই তারা সমস্ত আরব গোত্রগুলোর ওপর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব চালাতো এবং এই নেতৃত্বের বলে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সুবিধা তারা ভোগ করতো, তা ছিলো স্বভাবতই সম্মান, প্রতাপ ও নিরাপত্তা। এ কারণেই তারা বললো, ‘তোমার সাথে যদি আমরা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করি, তাহলে আমরা দেশ থেকে উৎখাত হয়ে যাবো।’

এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

‘যারা মর্যাদা ও সম্মান চায়, তাদের জানা উচিত, মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহরই।’

এই সত্যটা যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তবে এই একটা কথাই বর্তমান সমাজে বিদ্যমান সমস্ত মাপকাঠি, মূল্যবোধ, পরিকল্পনা ও উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলতে সক্ষম।

বস্তুত সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতাপ সবই আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে এর ছিটেফোঁটাও নেই, কণামাত্রও নেই, কাজেই যে ব্যক্তি সম্মান চায়, তার সম্মানের একমাত্র উৎস যিনি, তাঁর কাছ থেকেই তা চাওয়া উচিত। এটা সে তাঁর কাছ থেকেই পেতে পারে আর কারো কাছ থেকে নয়, আর কারো সাহায্য বা আশ্রয়ে নয় এবং কোনো উপায়েই নয়।

কোরায়শ গোত্র যে পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাসের উসিলায় মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও প্রতাপ প্রত্যাশা করতো এবং ইসলামের অনুসরণে সেই সম্মান ও প্রতাপ হারানোর ভয় পেতো, তারা সে ইসলামই যে হেদায়াত তথা সত্যের পথ, সে কথাও স্বীকার করতো। সেসব মানুষ, সেসব গোত্র, সম্মান ও প্রতাপের উৎস নয় এবং কাউকে সম্মান দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের যদি কোনো শক্তি বা ক্ষমতা থেকে থাকে, তবে তার প্রথম উৎসই আল্লাহ তায়ালা, তাদের যদি কোনো প্রতাপ ও নিরাপত্তা থেকে থাকে তবে তা আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। তারা যদি সম্মান মর্যাদা চায়, প্রতাপ ও নিরাপত্তা চায়, তবে তাদের এর প্রথম উৎসের কাছেই যাওয়া উচিত– যারা আল্লাহর কাছ থেকেই এ সব পায়, তাদের কাছে নয়। সেই আসল মালিকের কাছ থেকে তা নেয়া উচিত, যিনি এককভাবে সকল সম্মানের মালিক। যে মানুষেরা তাদেরই মতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তাদের বর্জিত ও পরিত্যক্ত জিনিসের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়।

এটা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের একটা মৌল তত্ত্ব। এ তত্ত্ব মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তাধারা, মানদন্ড ও মূল্যবোধ, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা, জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি, উপায় উপকরণ সব কিছুকেই সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। একমাত্র এই আকীদা বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হলেই তা নিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে অটুট মনোবল নিয়ে অকুতোভয়ে ও অনমনীয়ভাবে দাঁড়ানো এবং সম্মান মর্যাদা ও প্রতাপের একমাত্র পথ চিনে সেদিকে যাত্রা করা সম্ভব।

এ আকীদা বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকলে তা মানুষের মাথা পৃথিবীর কোনো স্বৈরাচারী সৃষ্টির সামনে নত হতে দেয় না, কোনো ভয়াবহ দুর্যোগ দুর্বিপাকে অসহিষ্ণু ও হিম্মতহারা হতে দেয় না। কোনো ভয়াবহ বিপর্যয়েও নীতি বিসর্জন দিতে দেয় না। কোনো সমাজ ব্যবস্থা, কোনো শাসন ব্যবস্থা, কোনো রাষ্ট্র, কোনো স্বার্থ এবং পৃথিবীর কোনো শক্তির কাছেই মাথা নোয়াতে দেয় না। কেনই বা দেবে? সম্মান প্রতাপ সবই তো আল্লাহর। তাঁর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া আর কারো কাছে তো এর ছিটেফোঁটাও থাকতে পারে না।

এ কারণেই পবিত্র কথা ও সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে।

'একমাত্র তাঁর কাছেই ওঠে যায় পবিত্র কথা, আর সৎকাজকে তিনিই সমুন্নত করেন।'

উল্লেখিত মহাসত্যের উল্লেখের পর এই প্রত্যক্ষ মন্তব্যের মধ্যেই এর প্রকৃত তাৎপর্য ও মর্ম নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে সম্মান চায়, তাকে এই সম্মান লাভের উপায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। উপায়টা হলো, পবিত্র ও ন্যায়সংগত কথা এবং সৎ ও ন্যায়সংগত কাজ। পবিত্র কথা মহান আল্লাহর কাছে ওঠে যায়। সৎকাজ আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের কাছে ওঠিয়ে নেন ও সম্মানিত করেন। তাই যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তাকেও তিনি সম্মান প্রতাপের অধিকারী করেন।

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদাবোধ এমন একটা জিনিস, যা বাইরের জগতে প্রকাশ পাওয়ার আগে মানুষের অন্তরেই অবস্থান করে। যার অন্তরে এটা অবস্থান করে সে এ দ্বারা অবমাননা ও অবনতির

সকল উপকরণের উর্ধ্বে উঠে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে সে মাথা নোয়ায় না। আত্মমর্যাদাবোধ দ্বারা সে সর্বপ্রথম নিজের প্রবৃত্তির উর্ধ্বে ওঠে, প্রবৃত্তির সমস্ত খায়েশকে সে পদদলিত করে, সকল লোভ ও ভীতিকে সে উপেক্ষা করে এবং বিরোধী শক্তির সকল হুমকি ও আস্ফালনকে সে বুড়ো আংগুল দেখায়। এই পর্যায়ে উন্নীত হবার পর আর কেউ তাকে অবদমিত করতে ও মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারে না। কেননা মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তির খায়েশ, লোভ ও ভয়ভীতিই মাথা নত করতে বাধ্য করে। এগুলো যে জয় করতে পারে, সে সব কিছুই জয় করতে পারে, সকল পরিস্থিতি ও সকল মানুষকে সে পদানত করতে পারে। এটাই সত্যিকার সম্মান, সত্যিকার মর্যাদাবোধ, যা মানুষকে দেয় অনমনীয় মনোবল, অপরাজেয় শক্তি ও অদম্য ক্ষমতা।

আত্মসম্মানবোধ কোনো যুক্তিহীন গোয়াতুর্মির নাম নয়। সত্যকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা, বাতিলকে গ্রহণ করার ধৃষ্টতা এবং দম্ভ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আগ্রাসী স্বেচ্ছাচারী আচরণকে আত্ম সম্মানবোধ বলা হয় না। অনুরূপভাবে ঝোঁক ও আবেগের সামনে দুর্বলতা প্রদর্শনের নামও নয় আত্মমর্যাদবোধ। সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের নীতিমালা পদদলিত করে অন্ধ শক্তি প্রদর্শনকে আত্মমর্যাদাবোধ বলা যায় না। আত্মসম্মান আত্মমর্যাদাবোধ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল প্রবৃত্তির খায়েশ, আবেগ ও লোভ লালসার উর্ধ্বে ওঠা, মনের হীনতা ও নীচতাকে জয় করা এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যান্য শক্তির সামনে নতিস্বীকার থেকে বিরত থাকার নাম। অতপর আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর কাছে নতিস্বীকার, তাঁর ভয় ও তাকওয়া। সুযোগে ও দুর্যোগে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার নামই আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ। আল্লাহর কাছে এই নতিস্বীকারেই মানুষের মাথা যারা আল্লাহকে মানে না তাদের সকলের সামনে উঁচু হয়। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া সে আর কারো সন্তুষ্টির পরোয়া করে না।

এ পর্যন্ত গেল সম্মান, মর্যাদা ও প্রতাপের ক্ষেত্রে পবিত্র কথা ও সৎকাজের ভূমিকা এবং অবদান সংক্রান্ত বক্তব্য। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র এটাই। এরপর এর বিপরীত দিকটা তুলে ধরা হচ্ছে।

'আর যারা কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তাদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস হবে।'

মূল আয়াতে 'ইয়ামকুরুনা' শব্দটা রয়েছে, যা প্রধানত খারাপ ও দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা এটা করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে, তাছাড়া তাদের এই সব দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ নিষ্ফল তো হবেই। তা সফলও হবে না, টিকেও থাকবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও তাকে ফলপ্রসু করা সম্পর্কে যে কথা রয়েছে, তার সাথে সমন্বয় বিধানের জন্যে এখানে এ কথা বলা হয়েছে।

যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা মিথ্যা সম্মান প্রতিপত্তি এবং কল্পিত বিজয় লাভের আশায় এটা করছে। বাহ্যত তাদেরকে বিজয়ী শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে শুধু পবিত্র কথাই পৌঁছে এবং সৎকাজকে তিনিই নিজের কাছে ওঠান। এই দুটো দ্বারাই সম্মান ও প্রতিপত্তি ব্যাপকতার অর্থে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কথায় ও কাজে ষড়যন্ত্র করা সম্মান মর্যাদা লাভের পথ নয়, যদিও কোনো স্বৈরাচারী শক্তি সাময়িকভাবে তা অর্জন করে, কিন্তু এর শেষ পরিণাম ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যা তিনি কখনো ভংগ করেন না। তবে তিনি তার নির্ধারিত সময় আসা পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সুযোগ দিতেও পারেন।

মানব জন্মের ইতিবৃত্ত

এরপর যে বিষয়টা আলোচনায় আসছে, তা হলো মানুষের জন্মের ইতিবৃত্ত। ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে পানি থেকে জীবন উদ্ভবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। মায়ের গর্ভে অবস্থান থেকে শুরু করে পৃথিবীতে দীর্ঘ বা স্বল্প আয়ু লাভের বিষয় পর্যন্ত সবই এর আওতায় এসেছে। বস্তুত এ সবই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বীর্য থেকে...' (আয়াত ১১)

মাটি থেকে মানুষের প্রথম সৃষ্টির বিষয়টা কোরআনে বার বার আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মাতৃগর্ভে তার অবস্থানের বিভিন্ন স্তরও একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। একটা স্তর হলো বীর্য। আর মাটি একটা জীবনহীন উপাদান। তবে বীর্য সজীব উপাদান। সর্বপ্রথম আলোচিত ঘটনা হলো পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব। এটা কিভাবে হলো এবং কিভাবে প্রথম উপাদানের সাথে মিলিত হলো তা কেউ জানে না। মানব জাতির কাছে এটা এখনো এক অজানা রহস্য। অথচ এটা একটা বাস্তব ও প্রকাশ্য ঘটনা। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অপরদিকে এটা যে সেই মহাশক্তিধর জীবনদাতা ও বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্বের নিদর্শন, তাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

নির্জীব থেকে সজীবে স্থানান্তর একটা বিরাট ও সুদূরপ্রসারী স্থানান্তর, যা স্থান ও কালের সকল দূরত্বের চেয়ে বৃহত্তর। যারা বিশ্ব জগতের হতবুদ্ধিকর রহস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাদের এ চিন্তা কখনো শেষ হবে না। এর প্রতিটা রহস্য অপর রহস্য থেকে বৃহত্তর বিস্ময়কর।

এরপর শুক্রবিন্দু থেকে নিয়ে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে একটি জীবকোষ কেমন করে পূর্ণাংগ ভ্রূণে পরিণত হয়, তা একবার খেয়াল করুন। আর খেয়াল করুন কেমন করে সেই ভ্রূণের মধ্যে নর ও নারীর পৃথক পৃথক চিহ্নগুলো পরিলক্ষিত হয়, কিভাবে তাদের আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়, সে দিকে আল কোরআন এই আয়াতের মধ্যে ইশারা করেছে। এরশাদ হচ্ছে, 'তারপর তিনি তোমাদের জোড়া জোড়া বানিয়েছেন' এ আয়াতাংশের দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. তোমরা যখন ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে তখনই তিনি তোমাদের নর নারী বানিয়েছেন; অথবা দুই. একথা দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, যখন তোমরা শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করো তখন নর-শিশু বা নারী শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করো, অথবা তোমাদের মধ্যে কোনো এক শিশু নর ও নারী উভয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। .... শুক্রবিন্দু রূপান্তরিত হয়ে এই দুটি শ্রেণী মানুষে কিভাবে পরিণত হয় তা অবশ্যই এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। এবারে ভেবে দেখুন, একটি শুক্রবিন্দুর মধ্যে কোথায় লুকিয়েছিলো সেই জীবকোষটি, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়ে এক বিশাল বপুধারী ও নানাবিধ যোগ্যতার অধিকারী মানুষে রূপান্তরিত হলো? কোথায় ছিলো অজানা সেই কোষটি যার মধ্যে নিহিত ছিলো নানা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এ সুন্দর মানুষটি? আপনার সন্ধানী দৃষ্টিতে এটাও ধরা পড়বে যে, এই সাধারণ একটি জীবকোষই ভাগ ভাগ হয়ে নিজ নিজ জুড়ির সাথে মিশে নতুন এক সৃষ্টি হিসেবে জন্মগ্রহণ করে; বিশেষ বিশেষ অংগ প্রত্যংগের অধিকারী হয় এবং বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করার উপযোগী হয়ে দিনে দিনে বর্ধিত হতে থাকে। তারপর যে লক্ষ্যে তাকে পয়দা করা হয়েছে তা পূরণ করার জন্যে তার অংগগুলো পরস্পর সহযোগিতা করে এবং পরিশেষে সে এমন আশ্চর্য ধরনের এক সৃষ্টিতে পরিণত হয় যা বিশ্বের বুকে এমন এমন দায়িত্ব পালন করে যা অন্য কোনো জীবজন্তু পালন করতে পারে না। এইভাবে সে সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এক সৃষ্টিতে পরিণত হয়। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব মানব

শিশু একই ধরনের শুক্রবিন্দু থেকে পূর্ণাংগ মানব আকারে যখন দুনিয়ায় আসে তখন তারা দেখতে পায়, একই প্রকার হলেও মানব শিশু একদিকে যেমন নর ও নারীতে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি প্রত্যেকেই আকৃতি প্রকৃতি ও চেহারা ছবির দিক দিয়ে একে অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় এবং এই বৈশিষ্ট্য এতোই চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ যে খেয়াল করলে দেখা যায়, পৃথিবীর এই কোটি কোটি মানুষ, সকল দিক দিয়ে কেউ কারো সমান নয়, সমান নয় তাদের আকৃতি প্রকৃতি, সমান নয় তাদের মন মানসিকতা, গলার আওয়ায ও রুচিবোধ, সমান নয় তাদের মেযাজ ও ঝোঁকপ্রবণতা, সমান নয় তাদের চাহিদা ও কর্মক্ষমতা, সমান নয় তাদের বয়স, সমান নয় তারা কোনো দিক দিয়েই। এতদসত্তেও তারা একে অপরের সম্পূরক হিসাবে জোড়ায় জোড়ায় বাস করে, স্বামী স্ত্রী হিসাবে ঘর সংসার করে এবং তাদের শুক্র দ্বারা অপর আরো অনেক সৃষ্টি দুনিয়ায় আনতে সক্ষম হয়। এভাবে চলতে থাকলে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের পথপরিক্রমা এবং এসব পূর্ব নির্ধারিত সৃষ্টির উৎকর্ষ কোনো সময়েই থেমে থাকে না। বস্তুজগতের মধ্যে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের এই যে ধারা তা এতোই অমোঘ ও বৈচিত্র্যময়, যা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। এসব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে আল কোরআনের বহু জায়গায় ইংগিত দেয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এসব রহস্যপূর্ণ জীবের কথা, যেন মানুষ ধীরস্থিরভাবে এবং অন্তরদৃষ্টি দিয়ে এসবের দিকে তাকায় এবং হৃদয় দিয়ে বুঝার চেষ্টা করে। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে তাদের আত্মা জেগে ওঠে এবং ওপরে বর্ণিত ঘটনাবলীর চমকপ্রদ ছবি, তার স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

সৃষ্টিজগতের সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত

এখানে যে বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হলো তার পাশাপাশি বিশ্ব জাহানে পরিব্যাপ্ত আল্লাহর জ্ঞানভান্ডারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে (যার বর্ণনা ইতিপূর্বে সূরা 'সাবা'য় এসে গেছে)। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জ্ঞানভান্ডার কত ব্যাপক, কত সূক্ষ্ম, কত রহস্যময়, তা বুঝা তখন সহজ হয়ে যায় যখন নারীদের জরায়ু মধ্যস্থিত ভ্রূণ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে বা তাঁর অজান্তে কোনো মতেই পেটে কোনো বাচ্চা ধারণ করে না।'

অর্থাৎ, মানুষ থেকে নিয়ে জীবজন্তু, পাখীকুল, মাছ, বুকে হাঁটা প্রাণী সরীসৃপ, কীট পতংগ এবং আমাদের জানা অজানা অন্য সকল প্রাণীই জন্মগ্রহণ করার পূর্বে ডিম্বকোষের মধ্যে অবস্থান করে। এখন প্রশ্ন জাগে, এ ডিম্বকোষ কি? এর জওয়াব হচ্ছে, এ হচ্ছে এক বিশেষ স্থূল পদার্থ, এটার পরিবৃদ্ধি মায়ের শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় না; বরং এটা মায়ের শরীরের মধ্য থেকে ডিম্বকোষ আকারে খসে এসে আলাদা হয়ে যায়, তারপর মায়ের শরীরের বাইরে এসে ভ্রূণ আকারে গর্ভাশয়ের সূতিকাগৃহে অথবা কৃত্রিম অন্য কোনো সূতিকাগৃহে বাড়তে থাকে এবং অবশেষে পরিণত হয় একটি পূর্ণাংগ ভ্রূণে। তারপর মাতৃদেহের তাপে অথবা অন্য কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে এক বিশেষ তাপমাত্রায় রেখে একে তাপ দেয়া হতে থাকলে এই ভ্রূণটি এক সময় স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

এভাবে এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে .... মাতৃগর্ভাশয়ের কারখানাগুলোতে যেসব ভ্রূণ প্রতিপালিত হয় এবং যতো বাচ্চাই ভূমিষ্ঠ হয়, সবই আল্লাহর জানা। অর্থাৎ সবই তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসীম জ্ঞানের এমন ছবি আঁকার মতো বুদ্ধি কোনো মানুষের মাথায় আসতে পারে না, এ বিষয়ে তাদের পক্ষে কোনো ধারণা বা কোনো ব্যাখ্যা দান করাও সম্ভব নয়। যেমন আমরা সূরা 'সাবা'য় ইংগিত দিয়েছি, আল্লাহ জাল্লা শানুহু, তিনিই যে এ মহাগ্রন্থ আল

কোরআনের অবতরণকারী, এর প্রমাণ তিনি নিজেই। আর এই যে হৃদয়গ্রাহী বাণী, এর মাধুর্য বা এর চমৎকারিত্ব বিকাশে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটাও এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এ মহান কালামের ঐশীবাণী হওয়ার ব্যাপারে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ওমর (রা.)-এর কাহিনীটি (অর্থাৎ তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনটি) চিরদিন মানুষ স্মরণ করতে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'কোনো বয়স্ক লোকের বয়স বাড়ানো বা কমানো সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত (হঠাৎ করে আসে না, বরং) তা লিখিত রয়েছে এক গ্রন্থে (যা সৃষ্টির অনেক পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে), আর এ কাজ আল্লাহর জন্যে বড়ই সহজ..................। (আয়াত ১১)

অতএব, গাছগাছালি, পাখীকুল, জীব জানোয়ার ও মানুষ– এক কথায় সকল প্রাণিজগতের জন্যে বয়স ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কিত নিয়ম নীতি যে সর্বকালে একই থেকেছে ও থাকবে, তা যে কোনো ভাবুক হৃদয়ে বরাবর অনুভূত হয়েছে ও হবে; তবে হাঁ, সময়ান্তরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ার কারণে মানুষের বর্ণে ও ভাষায়, আচার-আচরণে এবং তাদের স্বভাব চরিত্রে কিছু না কিছু পার্থক্য থেকেছে ও থাকবে– এটাই তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। অগণিত এ বিশাল মানবগোষ্ঠী, যার সকল অবস্থা একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না, তাদের যথাযথ সংখ্যা ও প্রয়োজন এবং সেসব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা, তাদের বয়স ও জীবনকাল নির্ধারণ করা– বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা কারও জানা নেই একমাত্র তিনি ছাড়া। তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে তিনি এসব কাজ আনজাম দিয়ে থাকেন, তাঁর জ্ঞানভান্ডারে নিহিত রয়েছে কে কত দিন বাঁচবে, আর কে কখন কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। কে বয়োবৃদ্ধ হয়ে জীবনকাল শেষ করবে আর কে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারবে যে, শুধু পূর্ণাংগ মানুষ বা জীব জন্তুই নয়; বরং প্রতিটি মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি অংগ প্রত্যংগ এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে, এগুলোর কোনোটির ওপরেই একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই, এমনকি দিগন্তব্যাপী অগণিত বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব এ সবারই আয়ুষ্কালও পূর্বনির্ধারিত......কখন কোন চারাটি অংকুরিত হবে, দর্শকবৃন্দের কাজল আঁখিকে কতদিন তার সম্মোহনী শ্যামলিমায় মোহিত করতে থাকবে আর কখনই বা ম্লান হয়ে দৃষ্টির অগোচরে ঝরে পড়বে, এ সকল খবরই অন্তরীক্ষে একমাত্র মহিমাময় প্রভুর জ্ঞানভান্ডারে সুরক্ষিত রয়েছে। চাইলে তিনি তাদের বেঁচে থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, আবার চাইলে পূর্ণত্বপ্রাপ্তির পূর্বেই তাদের অকালে ঝরিয়ে দেন, সব তাঁরই লীলা। দেখুন না সুউচ্চ সেই আকাশের বুকে উড্ডীয়মান পক্ষীকুলের দিকে, সেখানে পাখনা বিস্তারকারী অথবা পাখনার ঝাপটায় অগ্রসরমান কোনো পাখীর কোন পাখনা বায়ুর চাপে খসে পড়ছে, যুদ্ধরত কোন পশুর শিং ছুঁচালো ও অক্ষত অবস্থায় থাকছে আর কোন শিংটি ভেংগে যাচ্ছে, এই যে অসংখ্য মানুষের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন অথবা তার একগুচ্ছ চুলের দিকে তাকান, কোন চুলটি ঝরে পড়বে আর কোনটি মযবুত হয়ে টিকে থাকবে, তা সবই মহান আল্লাহর জানা রয়েছে।

এ সব কিছুই 'একটি গ্রন্থে' আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানভান্ডারে রক্ষিত রয়েছে। আর এই ভাবে সকল কিছুকে সযত্নে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তাঁর কোনো কষ্ট বা সংকট হয় না। বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই তা আল্লাহর কাছে সহজ।'

এভাবে যখন ওপরে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে মানুষ চিন্তা ভাবনা করতে থাকে, তার চিন্তাস্রোত যখন আরও প্রখর হয়, তারপর এ চিন্তার বাইরের বিষয়গুলোও যখন সে চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে এ দু'চিন্তাধারার মধ্যে কত যোজনব্যাপী পার্থক্য, তখনই সে আল্লাহর বিস্ময়কর জ্ঞান

সম্পর্কে সম্যকভাবে কিছু আঁচ করতে পারে, আর তখনই সে সত্যের ভান্ডারের দিকে কদমে কদমে এমনভাবে এগিয়ে যেতে থাকে যা অন্য কোনো স্বাধীন চিন্তার মানুষ অনুধাবন করতে পারে না; তখনই সে বুঝতে পারে, প্রকৃত সত্য জানার জন্যে এই সত্যানুসন্ধিৎসা এবং তার মনের মহাসত্যের ছবি আঁকার এই প্রচেষ্টা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জিনিস। এ হচ্ছে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ মালিকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক বিশেষ বিস্ময়কর প্রক্রিয়া।

এভাবে মানুষের বয়স ও জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটছে ও এগিয়ে চলেছে তাদের জীবন যাত্রার অগ্রগতি। একইভাবে জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে মানুষের আয়ও পূর্বাপেক্ষা বাড়ছে, বাড়ছে তাদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আরও বেশী বেশী সম্পদ খরচ করার যোগ্যতা; আরও বেশী সংগঠিত হচ্ছে তাদের চিন্তা চেতনা, তাদের প্রক্রিয়াগত প্রয়াস, কাজ ও প্রভাববলয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এও দেখা যাচ্ছে যে, সেসব ওসব অঞ্চলে দিনে দিনে মৃত্যুর হার বাড়ছে, অগ্রগতি থেমে যাচ্ছে এবং বেহুদা ব্যয় বেড়ে চলেছে। কম শ্রমে বেশী পাওয়ার আকাংখার প্রসার ঘটছে এবং অলসতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার কোনো কোনো অঞ্চলে বয়স ও আয় বৃদ্ধির মধ্যে এক সুষম অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। সেসব অঞ্চলে সুসমঞ্জসভাবে অগ্রগতি ও জ্ঞান গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে, বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডও এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে এই অগ্রগতি ব্যাহতও হচ্ছে এবং মানুষ সীমাহীনভাবে এমন সব আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলায় মেতে ওঠছে, যা তাদের জীবনের সমৃদ্ধির জন্যে না রাখছে কোনো অবদান, না আছে আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য।

এ সব কিছুই লিখিত রয়েছে এক মহাগ্রন্থে (যা সাধারণভাবে দৃষ্টিতে পড়ে না) ...... সব কিছুই এ মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করছে, যার খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই।

পৃথিবীতে যতো মানবগোষ্ঠী বর্তমান রয়েছে, আল্লাহর কাছে সেগুলো সবই কয়েকজন একক ব্যক্তির সমতুল্য, যতো জাতি আছে তারা কয়েকজন মানুষের মতো..... তাদের সবাই কেউ অধিক বয়স পায় অথবা অল্প বয়সেই দুনিয়ার খেলা সাংগ করে বিদায় নেয়। আল কোরআন আলোচ্য আয়াতে সে সত্যের দিকেই ইশারা করেছে।

কিন্তু আমরা তো সামান্য মানুষ, আমাদের দৃষ্টিতে সকল বস্তুই জীবন্ত প্রাণীর মতো মনে হয়........ ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, পাহাড় পর্বত থেকে যেসব শিলাখন্ডের পতন ঘটে .... এগুলোও জীবন্ত। নির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত এরা নিজ নিজ স্থানে বিশেষ কিছু ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সে সময় ফুরিয়ে গেলে আল্লাহর ইচ্ছাতেই এগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। গুহাগুলোও যেন জীবন্ত, প্রাণপ্রবাহের ছাপ রেখে ছুটে চলেছে আবহমানকাল ধরে কুলু কুলু নাদিনী তুলে। এ সব নদ-নদী অবশেষে মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়ে নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছে এবং এভাবেই তারা খুঁজে পাচ্ছে তাদের জীবনের ঠিকানা, এভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণায় যেসব শিলার আয়ুস্কাল অনেক দীর্ঘ, তাদের অনেকগুলো অচিরেই স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে সমতল ভূমির দিকে, আবার কোনো কোনোটা তদের অনুমিত মেয়াদ পূরণ করতে পারছে, কোনো কোনো গুহা পরিণতি প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষমাণ রয়েছে অথবা অনুমিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তবা ভেংগে অথবা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো নদী আবহমানকাল ধরে উদ্দাম-উচ্ছল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, আবার এদের কোনো কোনোটা ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে মরে যাচ্ছে এবং তারা তাদের গতি হারিয়ে ফেলছে।

একবার তাকিয়ে দেখুন এসব বস্তুনিচয়ের দিকে, যা মানুষ তার হাত দিয়ে গড়ে তুলছে........ বিশালকায় প্রাসাদ অথবা সাদামাটা ছোট ছোট অনাড়ম্বর গৃহ, দীর্ঘস্থায়ী তৈজসপত্র, কলকজা অথবা ঠুনকো ও ভংগুর দ্রব্যাদি, টেকসই বস্ত্রাদি অথবা স্বল্পমেয়াদী কাপড় চোপড় ...... এ সব কিছুর জন্যে রয়েছে পূর্বনির্ধারিত অবস্থানকাল, যা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর এলেমের মধ্যে রয়েছে।

সব কিছুই তাদের নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে মহাজ্ঞানী ও সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল বিশ্ব সম্রাটের পরিচালনায়।

সৃষ্টির বৈচিত্রের সাথে মানুষের যোগসূত্র

এভাবে মানুষ যখন বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা রহস্যরাজির দিকে তাকায় তখন তার হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, জেগে ওঠে তার সুপ্ত চেতনা, নব নব পদ্ধতিতে তার জীবন দরিয়ায় নেমে আসে অভাবিতপূর্ব এক গতি। আর তখনই প্রাকৃতিক এ সব দৃশ্যরাজি অবলোকনে মোহিত এ সব মানব হৃদয় অনুভব করতে থাকে মহান বিশ্বপতির শক্তি ক্ষমতা এবং তাদের বাহ্যিক চর্মচক্ষু ওসব কিছুর মধ্যে দেখতে থাকে এমন সব সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, যা সহজে তারা বিস্মৃত হতে পারে না, অবহেলা করতে পারে না, অথবা বিভ্রান্ত হয় না। এমনই এক পর্যায়ে এসে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মারেফাত সন্দর্শনে ধন্য হয়, হৃদয় প্রাণ দিয়ে রহমানুর রহীম আল্লাহর দৃষ্টিশক্তির আকাশচুম্বী প্রসারতা অনুভব করে, তাঁর মেহেরবানীর পরশ পেয়ে সে ধন্য হয়, তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি ক্ষমতার চেতনায় মুগ্ধ হয়ে যায় গোটা মানব সত্ত্বা। আর তখনই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সব কিছুর সাথে তাদের এক অদেখা যোগসূত্র কায়েম হয়ে যায়।

এই ভাবে আল কোরআন মানব হৃদয়ে তার নির্দিষ্ট আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বের এই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে তাকালে যে সব রহস্যরাজি চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় সেগুলোর মধ্যে সকল সৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য এক বস্তু হচ্ছে পানি। কিভাবে এই পানি সৃষ্টি হয় তার দিকে খেয়াল করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। এই পানির প্রকারভেদ ও বিচিত্র পর্যালোচনা মানুষকে মুগ্ধ করে, যেমন এক দিকে দেখা যায় মিষ্টি পানি, অপরদিকে রয়েছে এমন লবণাক্ত পানি যে গলার নীচে যেতে চায় না। সাগর মহাসাগরের মধ্যে শুধু নয়, নদীতেও দেখা যায় লোনা ও মিষ্টি পানির ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে, একটি ধারা অপর ধারার মুখোমুখি রয়েছে, কিন্তু পরস্পর মিশে যাচ্ছে। কে সেই শক্তিমান যাঁর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ মানতে বাধ্য হচ্ছে এই তরল পদার্থদ্বয়? তিনিই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যিনি অন্যান্য সব কিছুর মতো এগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরই ইচ্ছায় একটি আর একটির সাথে মিশতে পারছে না। আর তাঁরই মেহেরবানীতে এ দুটি ধারা পৃথকভাবে মানুষের খেদমত করে চলেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে—

'(পানির দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানেও) দুটো সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট .... কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।' (আয়াত ১২)

পানি সৃষ্টির ব্যাপারে যখন চিন্তা করা হয় তখন বিভিন্ন প্রকার পানি বানানের ইচ্ছা কেন করা হলো তা তো বুঝা যাচ্ছে। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ যুক্তি বুদ্ধি, যেমন আমরা এর বাহ্যিক অবস্থা দেখে কিছুটা বুঝতে পারি। মিঠা পানি তৃপ্তি সহকারে পান করা যায় এবং অত্যন্ত সহজে ও আরামের সাথে এই সুপেয় বস্তুটি গলার মধ্য দিয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে এই মিঠা পানির সদ্ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের জীবনকে সচল ও কর্মঠ বানিয়ে রাখার জন্যেই যে এ পদার্থটি সৃষ্টি করা হয়েছে তা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি

কৌশলের নেয়ামত আমরা ভোগ করে চলেছি, এ মহা নেয়ামত দ্বারা আমাদের উপকার হচ্ছে এবং এর দ্বারা আমরা অশেষ উপকারও পাচ্ছি। তিনিই সকল প্রাণীর পরিচালক। আবার যখন সাগর মহাসাগরের লোনা ও তিক্ত স্বাদযুক্ত পানির কথা চিন্তা করা হয় তখন হয়রান হয়ে যেতে হয়, কেন এ বিশাল লোনা বারিধির আয়োজন! এ বিস্ময়কর বিশ্বের গঠন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী বলছেন–(১)

'আবহমানকাল ধরে পৃথিবীর পেটের মধ্যে থেকে যে গ্যাস ওঠে আসছে, যার বেশীর ভাগই হচ্ছে বিষাক্ত এবং মানুষের জীবনের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর, এতদসত্তেও একটা বিশুদ্ধ বায়ু অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে যা মানুষের জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজন। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ থেকে আসা গ্যাস বাতাসকে সংক্রমিত করা সত্তেও এতো বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু দূষণমুক্ত থেকে যাচ্ছে যা মানুষ ও সকল জীবজন্তুর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করার জন্যে যথেষ্ট এবং পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সেই পরিমাণে গ্যাস বের হচ্ছে, যা সকল প্রাণীর ব্যবহার ও পানোপযোগী পানিকে বিশুদ্ধ রাখতে পারে। এ গ্যাসের দ্বারাই প্রস্তুত এই সাগর মহাসাগর ও নদ নদী। এ সবের মধ্যে এতোটা ভারসাম্যপূর্ণভাবে মিঠা পানি ও লোনা পানির সরবরাহ আসছে যেন প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গাছপালা উৎপন্ন এবং সব জীব-জন্তুর প্রয়োজন মেটে।'

এইভাবে আমাদের সামনে সৃষ্টির রহস্যভান্ডারের কিছু জট খুলছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি সব কিছুর মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের যোগসূত্র ও ভারসাম্য রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি সবাই যেন পরস্পরের প্রয়োজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং এর কাউকেই বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না, কারো অস্তিত্বই এককভাবে কল্পনা করা যায় না। এইভাবে সব কিছুকে পারস্পরিক নির্ভরশীল করে পয়দা করা এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবাইকে পরিচালনা করা, একমাত্র বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। তিনি সবাইকে ও সব কিছুকে তাঁর অদৃশ্য হাত দ্বারা পরিচালনা করছেন। তাঁর এই সূক্ষ্ম পরিচালনার পথে কেউই কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, কেউ এটা মনে করতে পারে না, এ সব কিছুই আকস্মিক কোনো ঘটনার ফল। এরপর, এ দুধরনের সাগরের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ পার্থক্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ পার্থক্য আপনা থেকেই হয়ে যায়নি; বরং এ সব পার্থক্য সৃষ্টিকর্তার অপার করুণারই বহিপ্রকাশ। এর মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টিকুলের নানাবিধ কল্যাণ।

আলোচ্য সূরার মধ্যে আরও কিছু ইংগিত আসবে, যা দ্বারা চেতনাশীল লোকদের কাছে এ মহাবিশ্বে বিরাজমান জীবজন্তু ও বিষয় আশয় সম্পর্কে এবং তাদের পয়দা করার পেছনে যে এক মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয় রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

এরপর জানানো হচ্ছে, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সাগর দুটোর স্রোতধারাগুলোকে মানুষের প্রয়োজনেই এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

আর এদের প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা টাটকা ও তরতাজা গোশত সংগ্রহ করে আহার্য হিসাবে ব্যবহার করছ এবং বের করছ এগুলো থেকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করার উপযোগী বহু মণিমুক্তা (যা তোমরা পরিধান করো), আর তোমরা দেখো নৌযানগুলো, যা মহা বারিধির বুক চিরে চিরে এগিয়ে যায় গন্তব্য পথে।'

---

(১) দেখুন, নিউইয়র্ক সায়ন্ত একাডেমীর চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী ক্র্যাসী মরিসন রচিত 'ম্যান ক্যান নট লিভ এলোন' গ্রন্থটি মাহমূদ সালেহ আল ফালাকী 'আল ইলমু ইয়াদউ ইলাল ঈমান' নাম দিয়ে এর আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

এখানে তাজা গোশত বলতে সামুদ্রিক মাছকে বুঝানো হয়েছে, আবার কেউ কেউ সাগরের জীবজন্তুও বুঝিয়েছেন।(২)

আর সামুদ্রিক বিভিন্ন পদার্থকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন ছোট বড় আকারের মুক্তা এবং সুদর্শন সামদ্রিক পাথর। 'লুলু' বলতে বুঝায় সেসব মূল্যবান পাথর যা অত্যন্ত মূল্যবান এবং যার রং পরিবর্তন হয় না। এগুলো পাওয়া যায় নানা আকার আকৃতি ও নানা বর্ণের সামুদ্রিক শামুকের মধ্যে। এ মূল্যবান পাথর সেসব শামুকের দেহের মধ্যেই পয়দা হয়। এগুলো বালুকণার মতো ক্ষুদ্র, আবার কখনো পানির ফোঁটার মতো বৃহৎ আকারেরও হয়ে থাকে। তারপর এই শামুকের দেহ পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাহ্যিক অবয়ব একটি বিশেষ স্খলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খসে পড়ে এক শিলাখন্ডের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে নতুন এক অবয়ব ধারণ করে, যাকে সে সামুদ্রিক শিলাখন্ডটি ঘিরে রাখে যেন অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন সে শামুকটি অন্য কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। এরপর এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ খোলসমুক্ত শামুকের দেহটি শক্ত হয়ে যায়, এরপর সে শামুকের মধ্যে মুক্তা তৈরীর কাজ শুরু হয়। তারপর আসছে 'মারজান'-এর গঠন প্রক্রিয়ার বিবরণ। এটা হচ্ছে এক জ্যান্ত ঝোঁপঝাড় জাতীয় বৃক্ষ, যা সমুদ্রের অভ্যন্তরে পয়দা হয় এবং মাইলের পর মাইলব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। এগুলো এতো বেশী পরিমাণে সমুদ্র গর্ভে বিস্তৃত থাকে যে, কখনও কখনও নাবিকদের জন্যে এগুলো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সামুদ্রিক মাছ ও জীবজন্তু যাইই এই ঝোঁপ বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন, সেখানে চরম বিপদে পড়ে যায়, তারপর সেখান থেকে বেরোনোর জন্যে বিশেষ বিশেষ পথ খুঁজে বের করে এবং লতাপাতা জাতীয় কিছু অলংকার নিয়েই বেরোয়। এগুলোকেই বলা হয় 'মারজান'।

আর বিরাটকায় নৌযানসমূহ সাগর নদীর বুক চিরে দেশ থেকে দেশ-দেশান্তরে এগিয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে আল্লাহরই ইচ্ছাতে এবং পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তক্রমে কোনো কোনো জাহাজ ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। পানির ওপর এতো বড় বড় জাহাজ ও নৌকাগুলো যে ভেসে থাকে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝা যায় যে, পানির মধ্যে অবস্থিত বিশেষ ঘনত্ব এবং আরও কিছু এমন উপাদান আছে, যা এই বিশালকায় জাহাজগুলোকে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখে এবং তার ওপর দিয়ে চলাচল করতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে বাতাসের মধ্যেও আছে এমন সব বহু উপাদান, যা দিবানিশি মানুষের খেদমত করে যাচ্ছে। প্রকৃতির বুকে আরও বহু শক্তি মানুষের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে, যেমন বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি। এসব কিছুই মানুষের খেদমতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত রয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যাতে করে তোমরা তাঁর মেহেরবানী লাভ করার জন্যে চেষ্টা করতে পারো...........।'

---

(২) মাছ ও পানির মধ্যে অবস্থিত জীব-জন্তুর গোশত এবং স্থলভাগের জীবজন্তুর গোশতের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। হাঁ, খাদ্য হিসেবে আল্লাহ তায়ালা গোশত (লাহ্‌ম) শব্দটি যখন ব্যবহার করেছেন তখন বুঝতে হবে, মাছের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন পানির মধ্যে অবস্থিত অন্য প্রাণীও হালাল। এই মত পোষণকারীরা সকল সামুদ্রিক প্রাণীর গোশত খাওয়ার পক্ষপাতী নন, যেহেতু সেগুলোর মধ্যে হিংস্র পশুর স্বভাব বিরাজ করে, আর যেহেতু মানুষ যা খায় নিজের অজান্তেই তার প্রকৃতি গ্রহণ করে। এ জন্যেই সচেতন মুসলমানরা সমুদ্রের হিংস্র প্রাণী, যেমন হাংগর, কুমির ইত্যাদির গোশত ভক্ষণ করে না। অপরদিকে, সামুদ্রিক কচ্ছপের গোশত অনেকটা গরুর গোশতের মতই স্বাদযুক্ত; বরং গরুর গোশত থেকেও একটু বেশী মিষ্টি স্বাদযুক্ত, কিন্তু যেহেতু পুকুর বা নদীর কচ্ছপের মতো এগুলো কামড়ায় না– এ জন্যে এগুলোর গোশত খাওয়া নিসন্দেহে হালাল। আলোচ্য আয়াতে এবং কোনো কোনো হাদীসে সম্ভবত এমনই সকল ছোট বড়ো সামুদ্রিক জীবের গোশত ভক্ষণ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। *(অবশ্য কচ্ছপ হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। –সম্পাদক)*

অর্থাৎ সফর ও বাণিজ্য কাজের মাধ্যমে, তরতাজা গোশত ও অলংকার দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে এবং নদীর পানির ওপর দিয়ে নৌযানসমূহ দেশ দেশান্তরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তোমরা যেন তার মেহেরবানী লাভ করতে পারো।

'আর যেন তোমরা শোকরগোযারী করতে পারো।'....... আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় উপকরণ তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন এবং সেসব উপকরণ একেবারে তোমাদের সামনে তোমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

এরপর রাত ও দিনের আনাগোনার দৃশ্য পেশ করে বিশ্ব পরিক্রমার এই পর্যায়টি সমাপ্ত করা হচ্ছে। তারপর জানানো হচ্ছে যে, এক নিয়মের অধীন সুনির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত সূর্য ও চাঁদকে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং প্রবেশ করান দিনকে রাত্রির মধ্যে এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এদের প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত এক সময় পর্যন্ত ডিউটি পালন করে চলেছে ও চলতে থাকবে।'

দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করানো, এ দুটি বড়ই চমকপ্রদ দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। একবার অন্তরের চোখ দিয়ে এ দুটি দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখুন এ ছবিটির দিকে, কেমন করে অন্ধকার রাত দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং কেমন করে আঁধারের পর্দা চিরে পূর্ব দিগন্তে আলোর আভা ফুটে ওঠে। আবার দেখুন, পড়ন্ত বেলায় পশ্চিম দিগন্তের দিকে, কেমন করে দিনের সমুজ্জ্বল আলো ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে আসে, কেমন করে আঁধারের পর্দা চতুর্দিকে প্লাবিত হয় এবং অবশেষে প্রবল প্রতাপান্বিত দিবাকর ধীর পদক্ষেপে অস্তাচলে চলে যায়। আবার তাকিয়ে দেখুন, রাত্রির মধ্যে দিনের প্রবেশের দৃশ্যের দিকে যখন প্রভাতবেলা শ্বাস ফেলতে শুরু করে এবং একটু একটু করে ঘনান্ধকারের নিকষ কালো পর্দা অপসারিত হতে থাকে, আর ধীরে ধীরে সকাল বেলার শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোর মেলা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে উদিত হয় তেজোদৃপ্ত সূর্য বীরবিক্রমে এবং চতুর্দিকে তার অনিরুদ্ধ আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দেয়। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতের আর একটি অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, শীতকালে যখন রাতের সময় দীর্ঘায়িত হয়ে যায়, তখন সে যেন দিনের বরাদ্দকৃত সময় কিছুটা খেয়ে ফেলে এবং এইভাবে যেন সে দিনের সীমারেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার গ্রীষ্মকালে যখন দিন বেড়ে যায় তখন সেও যেন রাত্রির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে তার হিসসা কিছুটা খেয়ে ফেলে। এমনি করে তারা যেন একই নিয়মে একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। এই উভয় দৃশ্যই ভাবুক হৃদয়ে চিন্তা জাগায়, কখনও সে এসব চমৎকার দৃশ্যের প্রভাবে তার হৃদয়ে পরম প্রশান্তির পরশ অনুভব করে, আবার কখনও এসব কিছুর শক্তিমান পরিচালকের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সন্দর্শনে তার হৃদয়ে জাগে তাঁর সম্পর্কে এক প্রবল ভীতি ও তাঁর হুকুমে বাছ বিচার করে চলার এক তীব্র অনুভূতি। কারণ এসব কিছুর মাধ্যমে সে যেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতাকে বাস্তবে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে থাকে এবং তাঁরই ক্ষমতাবলে অন্য দৃশ্যটি যা গুটিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাও সে দেখে– এইভাবে সে যেন দেখে একটি সূতা ছাড়া হচ্ছে এবং অপরটি গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং কখনও অপরটি ছাড়া হচ্ছে এবং এইটিকে গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে এক সূক্ষ্ম ও সর্ববিজয়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ বদলাতে পারে না, বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। এ নিয়ম শৃংখলার মধ্যে নেই কোনো অস্থিরতা, নেই কোনো পেরেশানী। আর যুগ যুগ ধরে কোনো সময়েই এবং কখনও এমন হয়নি যে, এ নিয়ম শৃংখলার মধ্যে এতোটুকু চিড় ধরেছে, এসেছে কোনো প্রকার

ব্যতিক্রম বা বিভিন্নতা। বছরের পর বছর ধরে সদাসর্বদা এই একই নিয়ম সর্বদা বিরাজমান রয়েছে।

আবার সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি এবং তাদের নির্ধারিত এক সময় পর্যন্ত চলতে থাকার বিধানের দিকে দেখুন, আর এ বিষয়ের দিকেও যে, এদের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এ সব বিষয়ে আর কেউ কিছুই জানে না........ তিনিই শেষ (অর্থাৎ তাঁর ওপরেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি)। এটা এমনি এক সত্য, যা সকল মানুষই সর্বদা দেখছে (অর্থাৎ পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আর কেউই অমর নয়, এটা কে না জানে)। তারা হয়ত জ্যোতির্মন্ডলের এই দুই সত্ত্বাকে দেখে এবং এদেরই মতো আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত তারকারাজি, তাদের কক্ষপথ ও সেই কক্ষপথে পরিভ্রমণ করা সম্পর্কে চিন্তা করে, আরও হয়ত চিন্তা করে এসব জ্যোতিষ্কের অস্তিত্বের মেয়াদ সম্পর্কে অথবা এসবের কোনোটারই কোনো কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুই বুঝে না........... আসলে আকাশের মধ্যে দৃশ্যমান এ দুটি সত্ত্বা ও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে যেমন প্রকাশ্যভাবে কিছু বুঝা যায়, তেমনি এ দুটি সত্ত্বার আরো কিছু ব্যাপার আছে যা মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তার অন্তরালে রয়ে গেছে। সকল দৃষ্টিতেই এদের উদয় ও অস্ত যাওয়ার বিষয়টি বর্তমান রয়েছে। এদের অবিরাম গতিতে চলতে থাকার নেই কোনো বিরতি বা এদের গতি কোনো সময় থেমে যায়নি, এটা এতো বড় এক সত্য যা বুঝার জন্যে বেশী কোনো জ্ঞান বা চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয় না। আর এভাবেই এ চাঁদ সুরুজের গতি থেকে এমন এক সত্য বুঝা যায় যা সকল যামানার সকল মানুষের জন্যে সমানভাবে বোধগম্য। আল কোরআন যখন নাযিল হয়, তখনকার তুলনায় আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা এ সত্যটিকে আরো অনেক গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হচ্ছি, এজন্যে একথাটা বুঝা এ পর্যায়ে প্রধান বিষয় নয়। আসল যে বিষয়টি বুঝার জন্যে আমাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে তা হচ্ছে তাদের কাছে ওহীর মাধ্যমে যা কিছু পাঠানো হয়েছিলো, আমাদের কাছেও অবিকল সেসব জিনিসই পৌঁছে গেছে, তাদের অন্তরগুলোকে যেসব বিষয় নাড়া দিতো সেসব বিষয় দ্বারা আমাদের অন্তরও আন্দোলিত হওয়া উচিত। আজ আমাদের অন্তরও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিস্ময়কর ক্ষমতা অবলোকনে বিমুগ্ধ হওয়া উচিত। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতার হাত চিরদিনের মতো আজও সবখানে একইভাবে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। আর সত্যিকারে বলতে গেলে, মানুষের অন্তরের জীবনই আসল জীবন।

এ বিভিন্ন প্রকারের দৃশ্য হৃদয়ের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং এসব কিছুর মালিক ও প্রতিপালক সম্পর্কে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ পেশ করে আমাদের জানায়, এসব কিছুর ওপরই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আরো জানায় যে, শেরেকের যতো দাবীই করা হয়ে থাকে তা সব কিছুই মিথ্যা এবং এসব অলীক জিনিসের উপাসকদের জন্যে রয়েছে কেয়ামতের দিনে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। এরশাদ হচ্ছে,

তিনিই রাতকে দিনের ভেতর এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, তিনি (তোমাদের সুবিধার জন্যে) সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, এরা সবাই .... অন্য তোমাকে কেউই কিছু অবহিত করতে পারবে না। (আয়াত ১৩-১৪)

তিনিই তোমাদের আল্লাহ, আর একমাত্র তিনিই তোমাদের রব প্রতিপালক মালিক মনিব প্রভু ও শাসনকর্তা, যিনি মেঘমালা বহনকারী বাতাস পাঠিয়েছেন এবং মরে যাওয়ার পর পৃথিবীকে পুনরায় যিন্দা করেছেন, যিনি তোমাদের মাটি দ্বারা পয়দা করেছেন, যিনি তোমাদের জোড়া জোড়া হিসাবে বানিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন গর্ভবতী মহিলারা তাদের গর্ভে কি ধারণ করে এবং কি জন্ম দেয়, আর যিনি জানেন কে অধিক বয়স পায় এবং কার বয়স কমিয়ে দেয়া হয়। যিনি

সৃষ্টি করেছেন দু'ধরনের সমুদ্র, যিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে, যিনি সূর্য ও চাঁদকে তাঁর আয়ত্তাধীনে রেখেছেন ও চিরদিন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন, এরা এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গতিসম্পন্ন রয়েছে..... হাঁ, সেই সত্তাই তিনি– আল্লাহ তায়ালা– 'তোমাদের রব'।

সবকিছুর ওপরই আল্লাহর ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত

'তাঁরই বাদশাহী'– সকল কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা সাহায্যের জন্যে যাকেই ডাক না কেন এবং যে জিনিসের কাছেই নিজেদের সোপর্দ করো না কেন, সে সব কিছুই বাতিল মিথ্যা। তারা খেজুরের আঁটির ওপর অবস্থিত তুচ্ছ পাতলা ঝিল্লির মালিকও হতে পারে না। কেৎমীর শব্দটির অর্থ হচ্ছে খেজুরের আঁটির পাতলা ঝিল্লির খোলস; অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ওরা সাহায্যের জন্যে ডাকে তারা অন্য কিছুর মালিক হওয়া তো দূরের কথা, এ তুচ্ছ ঝিল্লির খোলসের মালিক হওয়ারও যোগ্য নয়।

তারপর ওদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে বলা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওদের ডাকো, ওরা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না।'

কারণ ওরা হয়তো পাথরের তৈরী মূর্তি অথবা কাঠ-খড় মাটি দিয়ে তৈরী পুতুল, অথবা গাছ, তারকারাজি বা গ্রহ উপগ্রহ অথবা ফেরেশতা অথবা জ্বিন .... আর খেয়াল করলে ওরা অবশ্যই বুঝবে যে, এদের কেউই প্রকৃতপক্ষে খেজুর দানার উপরস্থ তুচ্ছ আবরণীরও মালিক নয়, আর এরা কেউই তাদের এ ভ্রান্ত ও স্বকপোলকল্পিত দাসদের কথা শুনতে পায় না; আসলেই ওরা কেউ শোনার ক্ষমতা রাখে না অথবা মানুষের কথা শোনে না।

'আর যদি ওদের কেউ কেউ শুনতে পায়ও তবু তারা কোনো জওয়াব দেয় না, জওয়াব দেয়ার ক্ষমতাও রাখে না।' যেমন জ্বিন ও ফেরেশতাদের অবস্থা। জ্বিন জাতি জওয়াব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং ফেরেশতারা ভ্রান্ত মানুষের জওয়াব দেয় না বা ডাকে সাড়া দেয় না। দুনিয়ার জীবনে এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। অতপর কেয়ামতের দিন ওরা এসব ভুল পথ ও ভুল পথের পথিকদের থেকে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'কেয়ামতের দিন ওরা তোমাদের এই শেরেক (অর্থাৎ শক্তি ক্ষমতায় আল্লাহর সাথে তাদের কিছু অংশ আছে বলে তোমরা যে মনে করবে) সে কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবে।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল বিষয়ে খবর রাখেন এবং সবজান্তা হওয়ার পজিশনে থেকেই তিনি সর্ববিষয়ে মানুষকে জানাচ্ছেন, জানাচ্ছেন দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে।

'আর তাঁর মতো এইভাবে কেউ তোমাকে জানাবে না।'

এসব বক্তব্য পেশ করার পর আলোচনার এ অধ্যায়টি শেষ হচ্ছে এবং সমাপ্ত হচ্ছে এই পরিক্রমা ও সারাবিশ্বের বুকে অবস্থিত সকল কিছুর রোজনামচা। অতপর আলোচ্য বিষয়গুলো থেকে মানব হৃদয় এমন এক জ্ঞানের ভান্ডার লাভ করছে যা তাকে তার জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করছে এবং এসব পার্থিব জীবনেও তার উপকারে আসছে। আর এটা জোর করেই বলা যায়, বিশ্ব রহস্য ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচ্য এই একটিমাত্র সূরাতে যেসব কথা এসেছে এবং আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে এবং তাঁর শক্তি ক্ষমতা বুঝার ব্যাপারে যে সব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা যে কোনো সত্যানুসন্ধিৎসু বা হেদায়াতপ্রার্থীর জন্যে যথেষ্ট, তাদের জন্যেও যথেষ্ট যারা দলীল প্রমাণ পেতে চায়! এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন) তিনি সম্পূর্ণ .... কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি। (ইতিহাস খুলে তোমরা আজ দেখে নাও তাদের জন্যে) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!' (আয়াত ১৫-২৬)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

রুকু ৩

১৫. হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার সামনে অভাবগ্রস্ত, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, (যাবতীয়) প্রশংসার মালিক। ১৬. তিনি যদি চান তাহলে (দুনিয়ার বুক থেকে) তোমাদের (ওঠিয়ে) নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় নতুন এক সৃষ্টিকেও তিনি নিয়ে আসতে পারেন, ১৭. আর এ (কাজ)-টি আল্লাহ তায়ালার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। ১৮. (কেয়ামতের দিন) কেউ কারো (গুনাহের) বোঝা বইবে না, কোনো ব্যক্তির ওপর (গুনাহের) বোঝা ভারী হলে সে যদি (অন্য কাউকে) তা বইবার জন্যে ডাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও তা সরানো হবে না, (যাকে সে ডাকলো–) সে (তার) নিকটাত্মীয় হলেও নয়; (হে নবী,) তুমি তো কেবল সে লোকদেরই (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করতে পারো যারা না দেখেই তাদের মালিককে ভয় করে, (উপরন্তু) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে; কেউ নিজের পরিশুদ্ধি সাধন করতে চাইলে সে তা করবে সম্পূর্ণ তার (নিজস্ব কল্যাণের) জন্যে; চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ তায়ালার দিকেই হবে। ১৯. একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও একজন অন্ধ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না– ২০. না (কখনো) আঁধার ও আলো (সমান হতে পারে), ২১. ছায়া এবং রোদও (তো সমান) নয়, ২২. (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (ভালো কথা) শোনান, তুমি কখনো এমন মানুষদের কিছু শোনাতে পারবে না যারা কবরের অধিবাসী (হওয়ার মতো ভান করে)। ২৩. (আসলে) তুমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও। ২৪. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ একজন সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি; কখনো কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যার জন্যে কোনো (না কোনো একজন) সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি!

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে (এর জন্যে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ো না,) এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, যদিও তাদের নবীরা তাদের কাছে (নবুওতের) দীপ্তিমান গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো! ২৬. অতপর যারা (নবীদের) অস্বীকার করেছে, আমি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি, কতো ভয়ংকর ছিলো আমার আযাব!

তাফসীর
আয়াত ১৫-২৬

আবারও জনগণকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানানো হচ্ছে, যেন তারা আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটির দিকে আর একবার গভীরভাবে খেয়াল করে দেখে; নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে এবং কোন অবস্থার সম্মুখীন সে হতে চলেছে সে বিষয়ে বুঝার জন্যে ধীরস্থিরভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তারা যেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে তাকায় এবং দুনিয়ার সুখ সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একবার ভেবে দেখে যে, জেনে বুঝে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথে চলার পরিণতি কি সাংঘাতিক হতে পারে যেমনটি তাদের সামনে এ সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ইংগিতে আর একটি অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে যে, হেদায়াতের প্রকৃতি গোমরাহীর প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর এ দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যেমন পার্থক্য রয়েছে ভালো চোখ ও খারাপ চোখ, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে। গভীর দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন, কেমন চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে সত্য সঠিক পথের সাথে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের, খররোদ ও স্নিগ্ধ ছায়ার। আর জীবন তো হচ্ছে এ সবের মধ্যে এক সাধারণ বিষয় এবং তুলনা করার মাধ্যম। যেমন সাদৃশ্য রয়েছে অন্ধত্ব ও অন্ধকারের মধ্যে, রৌদ্র ও মৃত্যুর মধ্যে। এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্যে যেমন রয়েছে মিল, তেমনি যেন রয়েছে এদের মাঝে এক অদেখা সম্পর্ক! তারপর হুশিয়ার করা ও ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণতির দিকে ইশারা করার সাথে সাথে এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে।

‘হে মানবমন্ডলী, তোমরাই অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত, চিরপ্রশংসিত.......।’

হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানানোর প্রয়োজনে এই সব সত্য কথা সত্য তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে অবশ্যই মানুষকে উপদেশ দেয়া একান্ত দরকার। এ সব তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত আলো ও তাঁর হেদায়াতের দিকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তাদের উপদেশ দান করা এ জন্যেই জরুরী মনে করা হয়েছে যে, আসলে তারা তো অভাবী, সব কিছুর জন্যে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর মহান পরওয়ারদেগারই

হচ্ছেন সকল প্রকার অভাব অভিযোগ এবং সমস্ত সংকট সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আরও খেয়াল করুন, যে সময়ে তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁরই এবাদাত ও তাঁর নেয়ামতসমূহ লাভ করায় তাঁর প্রশংসা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে, ঠিক সেই একই সময়ে তাদের জানানো হচ্ছে যে, তিনি তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে পরাঙ্মুখ। কেউ কিছু করলেই কি, আর না করলেই বা কি, কোনো অবস্থাতেই তাঁর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। মহান আল্লাহ তিনি, তিনি আপন গরিমায় গরীয়ান, নিজের গুণাবলীতে তিনি চির অম্লান, চির পরিশুদ্ধ। ওরা কোনো অবস্থাতেই তাঁকে (কোনো ব্যাপারেই) অক্ষম করতে পারে না, পারে না তাঁর ওপর কোনো প্রকার প্রাধান্য বিস্তার করতে। তিনি তো চাইলে যে কোনো মুহূর্তে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের মুছে ফেলতে পারেন এবং তাদের স্থলে অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে তাদেরই মতো একই মানবগোষ্ঠী থেকে নতুন আর এক সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন, অথবা অন্য কোনো শ্রেণীকেও পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করাতে পারেন, আর এটা আল্লাহর কাছে বড়ই সহজ কাজ।

মানুষের পক্ষে এ সব বাস্তবতার নিরিখে অবশ্যই একটু চিন্তা করা দরকার, যাতে তার ঘাড়ে অহংকার সওয়ার না হয়ে যায়। আর কি করে তাদের অন্তরে আত্মম্ভরিতা পয়দা হতে পারে যখন তারা বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখতে পাচ্ছে, প্রত্যক্ষ করছে সকল ক্ষেত্রে তাঁরই কৃতিত্ব। তিনি তাদের কাছে তার বার্তাবাহক পাঠাচ্ছেন এবং সে রসূলরা তাদের গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন এবং অন্ধকার থেকে তাদের আলোর দিকে টেনে তুলছেন। এতদসত্ত্বেও এমনভাবে তাদের ওপর নিজেদের বড়ত্ব প্রদর্শনের খায়েশ সওয়ার হয়ে যাচ্ছে যে, তারা নিজেদের আল্লাহর ওপর বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করেছে। কেন তারা একটুখানি চিন্তা করে দেখে না যে, আসলে তারা হেদায়াত গ্রহণ করলে অথবা তাঁর এবাদাত বন্দেগী করলে আল্লাহর কোনো উপকার হচ্ছে কি না। মহান আল্লাহ, তিনি তো নিজ ক্ষমতাবলে বলীয়ান, আপন মহিমায় অনন্য। কেউ তাঁর কথা শুনলেই বা কি আর না শুনলেই বা কি, তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় চির অম্লান, তিনি সর্বপ্রকার অভাব অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনি তাঁর কৃতিত্বের কারণে চির প্রশংসিত।

অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দাদের প্রতিনিয়তই ছাড় দিয়ে চলেছেন এবং তাদের ওপর তাঁর নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করে চলেছেন, তাদের কাছে অগণিত রসূল প্রেরণ করে হেদায়াতের আলো দ্বারা তাদের প্লাবিত করে দিয়েছেন। তারপর খেয়াল করে দেখুন এই রসূলদের কী দুর্বিষহ অবস্থা!

তাদের সহনশীলতার অবস্থাও লক্ষণীয়। কেমন অম্লান বদনে তাঁরা কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন। বিভিন্নভাবে এসব দুর্বিষহ কষ্টের বোঝা বহন করে চলেছেন। তাঁদের অস্বীকার করার কারণে এবং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে তকলীফ দেয়ার কারণে তাঁরা এসব কষ্ট পাচ্ছেন; এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর এসব নেক বান্দাকে তাঁর মেহেরবানী, করুণা ও মান সম্ভ্রম দিয়েই চলেছেন, দিয়ে চলেছেন তাদের তাঁর এহসান ও করুণারাশি। মহান রহমানুর রহীম, মহিমাময় আল্লাহর মহিমা এভাবেই প্রকাশ পায়। কেননা এসব গুণ তাঁর সত্ত্বারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি তিনি এ জন্যে দয়া করেন না যে, তারা তাদের হেদায়াত গ্রহণের মাধ্যমে মালিকের রাজ্যে কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছেন। অথবা সত্য থেকে তারা চোখ বুঁজে থাকা ও তাদের অন্ধ হয়ে থাকার কারণে মালিকের রাজ্যে কিছু ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে বলে কারো ওপর তিনি রাগ করছেন। আর এ কারণেও তিনি সেই সব বান্দার ওপর রহমত নাযিল করেন না যে, মালিকের বড়ই প্রিয় ও বিরল সৃষ্টি, তাদের পুনরায় ফিরে পাওয়া অথবা তাদের বদলে অনুরূপ জনগণকে আবার পাওয়া বড়ই কঠিন, এ জন্যে তারা যাইই করুক না কেন তাদের মাফ করতেই হবে।

মানবসন্তানের প্রতি আল্লাহর অপার করুণা

মানুষ যখন আল্লাহর অপার করুণারাশির দিকে মুখ তুলে চায় তখন তারা হয়রান পেরেশান হয়ে যায়। তারা দেখে, এই তুচ্ছ অজ্ঞান, অক্ষম ও দুর্বল মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী ও রহমত পেয়ে এবং তাঁর পরিচালনায় কত অকল্পনীয় কৃতিত্বের ছাপ রাখছে।

মানুষ পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে একটি অতি ছোট্ট সৃষ্টি, আর এই মহাবিশ্বে সূর্যকে যেসব গ্রহ প্রদক্ষিণ করে চলেছে তাদের মধ্যে পৃথিবী একটি অতি ছোট্ট গ্রহ। অগণিত-অসংখ্য তারকারাজির মতোই সূর্যও একটি তারকা। এখন তাকিয়ে দেখুন নভোমন্ডলের মধ্যে। কেমন করে বিশাল ও অনন্ত আকাশের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর মতো ফুটে রয়েছে এই তারাগুলো। হাঁ এই যে আকাশ, কোনো দিন কোনো মানুষ তার কূল কিনারা করতে পারেনি— পারবেও না কোনো দিন। আর এসব কিছুই তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু বা কয়েকটি সৃষ্টি, যার সন্ধান মানুষ কোনোদিন করতে পারেনি।

এরপর দেখুন মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে একেবারে অসহায় ও দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়নি। সে তার মালিকের কৃপাধন্য সৃষ্টি হিসাবে তাঁর মহান পরিচালনা পাচ্ছে। কত সৌভাগ্যশালী সে, এই সুবিশাল সৃষ্টিরাজ্যে সে জানে না কিসে তার ভালো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে সৃষ্টি করলেন এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিলেন যেন সে তার মালিকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সন্দেহমুক্ত জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে পরিচালনা করতে পারে। তাকে খেলাফতের এ মহান দায়িত্ব পালনের সরঞ্জামাদিও দান করলেন। এ সরঞ্জামাদির মধ্যেই কত কি যে রয়েছে আমরা তা জানি না। হতে পারে তিনি মানুষের নিজ দেহ সত্ত্বার মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলী দিয়েছেন, যা দ্বারা সে প্রাকৃতিক বস্তু শক্তি ও বিষয়াবলীকে বশীভূত করতে পারে। সব কিছুকে কাজে লাগানোর এই যোগ্যতাই তাকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দান করেছে, কিন্তু হায়, মানুষ অহংকারের কারণে পরম করুণাময় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়, নিজেকে ভুল পথে চালিত করে এবং অপরকেও চরম ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অবশেষে সে তার রবের সাথে শেরেকের পাপে লিপ্ত হয়ে যায় অথবা একসময় নিজ মালিককে অস্বীকার করে বসে। আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা পর্যায়ক্রমে অসংখ্য রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যে পাঠিয়েছেন একজন রসূলের পর অন্য রসূল এবং রসূলদের কাছে আসমানী কেতাবসমূহ ও বিভিন্ন মোজেযা পাঠিয়েছেন, এইভাবে চলতে থেকেছে সকল যামানায় বান্দার ওপর আল্লাহর মেহেরবানী এবং সর্বশেষে শেষ কেতাব নাযিল হয়েছে, যা অনাগত ভবিষ্যতের সকল মানুষকে সত্য পথ দেখাতে থাকবে এবং অতীতের মানুষ ও তাদের সত্য পথ গ্রহণ না করার কারণে কি কি পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এ কেতাব তাদের, সে বিষয় ওয়াকেফহাল করতে থাকবে। ভবিষ্যতের মানুষকে জানাতে থাকবে যে, অতীতের মানুষকে কত অধিক শক্তি সরঞ্জাম দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের কত প্রভূত জ্ঞান বিজ্ঞান শেখানো হয়েছিলো। এ কেতাবের মাধ্যমে আরও জানা যাবে, এতো সব জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী থাকা সত্তেও আল্লাহ তায়ালার আযাবের সামনে তারা কত দুর্বল ও কত অসহায় হয়ে পড়েছিলো; বরং প্রকৃত সত্য কথা এই, এদের কারো কারো সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা (কেয়ামতের দিনে) নিজেই বলবেন, 'তুমি (এটা) করেছো, আর এ জন্যেই আজকে তুমি পরিত্যক্ত হয়েছো।' সে হতভাগাকে তিনি আরও বলবেন, আজকে তোমার জন্যে তোমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে, অথচ এই এই আচরণ হত আজকে তোমার নাজাতের উপায়।

এই মানুষসহ সব কিছু সৃষ্টি এবং এই মহাবিশ্বের বুকে অবস্থিত বাসিন্দাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কিছু সৃষ্টি মাত্র— যা কিছু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সে সবের মধ্যে এগুলো সবই হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র

কিছু অনুসারী। বিশাল জগতের তুলনায় এসব দৃশ্য ও বস্তুনিচয় সবই অতি তুচ্ছ এবং অতি নগণ্য! আর আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সব একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি! এ সব কিছু সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আর অমনি সবকিছু পয়দা হয়ে গেছে। সকল ক্ষমতার মালিক তিনি, যখনই কিছু তিনি পয়দা করতে চান শুধু ইচ্ছা করেন, আর অমনি তার অস্তিত্ব বাস্তবে এসে যায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী ও পরিচালনায় এ সব সত্য উদ্ঘাটনের জন্যে মানুষই প্রকৃতপক্ষে বেশী যোগ্য। আল্লাহ তায়ালা চান যে, মানুষ সত্য অস্বীকার করা ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সত্তেও তাঁর পরিচালনা ও মেহেরবানী লাভ করার মাধ্যমে যিন্দা থাকুক। এমনিভাবে অবশেষে তাঁর দিকে তারা ফিরে আসবে ও তাঁর ডাকে সাড়া দেবে।

এইভাবে মানুষের মূল্যায়ন করায় এ কথা জানা যায়, তাদের মধ্যে আবেগ ও মহব্বতের স্রোতধারা অতি সংগোপনে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে, যা তাকে পৃথিবীর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে, কঠিন থেকে কঠিন জীবন সংগ্রামে উজ্জীবিত করে এবং পরিশেষে তাদের সত্য পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনও এইভাবে তাদের মধ্যে অবস্থিত সত্য-সন্ধানী হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে চায়। কারণ আল কোরআন জানে, শাশ্বত সমুজ্জ্বল প্রভা অবশেষে মানুষের মনকে জয় করবেই। সত্যের বিজয় এ জন্যেও অবশ্যম্ভাবী যে, এ মহাগ্রন্থ স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার কেতাব এবং এ কেতাব পরম সত্যের বাণী বহন করে এনেছে। সুতরাং এ পবিত্র কেতাব অবশ্যই সত্য কথা প্রকাশ করেছে এবং তা সত্যকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে। এ কেতাব কখনই তার আহ্বান জানানোর কাজ থামিয়ে দেবে না– যতোদিন না সত্যের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, আর যতদিন না সত্যের সমুজ্জ্বল বাতি ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠবে! এ বাতি সত্যের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে মানুষকে পরিচালনা করে না এবং অন্য কোনো দিকে মানুষকে এগিয়ে দিতে জানে না।

মানুষের অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত পরিণতি

এ পাক পবিত্র কালাম প্রত্যেক বিদগ্ধ অন্তরে আর একটি মহাসত্যের পরশ বুলিয়ে দেয়, তা একান্তই স্বভাবসিদ্ধ একক সত্য আর সে সত্য গ্রহণ করা দ্বারা যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা দুনিয়া ও আখেরাতে অন্য কেউ তাকে দিতে পারে না। অবশ্যই এ কথা সত্য যে, মানুষকে হেদায়াতের পথে আহ্বান জানাতে গিয়ে আল্লাহর রসূল নিজের সম্পর্কে, নিজের নিরাপত্তা বা সুখ শান্তি সম্পর্কে কোনোদিন চিন্তা করেননি। তিনি তো শুধু নিজের সেই দায়িত্ব সম্পর্কেই চিন্তা করেছেন যা নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী রসূলরাও একইভাবে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেই চিন্তা করেছেন এবং এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের পরিণতি কি হবে সে কথা একবারও ভেবে দেখেননি। এইভাবে যে নিজেকে পবিত্র করবে সে তার নিজের অস্তিত্ব এবং নিজের সত্তাকেই কলুষমুক্ত করবে। কারণ নিজেকে পবিত্র করার কাজ তার নিজেকেই করতে হবে, অন্য কেউ তা করে দেবে না এবং যে যা করবে সব কিছুসহ সে আল্লাহরই কাছে ফিরে যাবে এবং সেখানেই তার চূড়ান্ত বিচার হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কেউ কারো বোঝা বহন করবে না এবং (সেদিন) কঠিন বোঝার ভারে কষ্ট পেতে থাকা কোনো ব্যক্তির বোঝা (শত আকুতি করলেও) অন্য কেউ বহন করে দেবে না, যতো নিকটবর্তী আত্মীয়ই হোক না কেন।'

আবারও এরশাদ হচ্ছে,

'যে পবিত্রতা গ্রহণ করবে, অবশ্যই সে নিজের স্বার্থেই তা গ্রহণ করবে, আর তাঁর কাছেই চূড়ান্তভাবে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।'

স্বাভাবিকভাবে মানুষকে অবশ্যম্ভাবী যে চূড়ান্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে এবং সেখানে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে বলে যে খবর দেয়া হয়েছে তা তার নৈতিক চেতনাবোধের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং একইভাবে তার বাস্তব আচরণকেও প্রভাবিত করে। এ জন্যে প্রত্যেক মানুষের চেতনার এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, তাকে অপরের কোনো কাজ, কথা বা আচরণের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে না, অথবা একজনের অপরাধের জন্যে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে না, অথবা অন্য কেউ তাদের কাজের দরুন নাজাতও পাবে না। এজন্যে যতোক্ষণ সে জাগ্রত অবস্থায় আছে এবং তার জ্ঞান ও চেতনা সুস্থ আছে, ততোক্ষণ তাকে তার নিজের কাজের হিসাব নিজেকেই নিতে হবে। একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন পার্থিব জীবনের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। সুতরাং সেদিন আসার পূর্বেই তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। আজকেই তাকে এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, সেই ভয়ানক দিনে পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেউই তাকে সাহায্য করতে আসবে না। এ জন্যে অন্য কারও ওপর নির্ভর করা হবে একটা ধোকা মাত্র। অন্য কেউই তার কোনো বোঝা বহন করে দেবে না। আজকে যেমন তার নিজ ব্যবহার ও কাজের দরুন সে নিশ্চিন্ত বোধ করছে, তেমনি কেয়ামতের দিনও তাকে একমাত্র তার নিজের কাজের জন্যেই দায়ী করা হবে। কোনো দল বা দলের কে কি করছে সে জন্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়ী করা হবে না। এ জন্যে দলীয় কোনো ভ্রান্তির জন্যে তার হতাশ হওয়া বা তার নেক কাজের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো আশংকা নেই। তবে দল ভুল করতে থাকলে তাকে সদুপদেশ দিয়ে যেতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই এটা একটা কর্তব্য। অর্থাৎ দলীয় জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কাজ ও আচরণের জন্যে দায়ী হওয়ার সাথে সাথে তার দলের জন্যেও দায়ী হবে। যদি সে দলের কোনো ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের জন্যে চেষ্টা না করে বা সদুপদেশ দিতে না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এজন্যে জিজ্ঞেস করা হবে। এখানে উপদেশদান বা চেষ্টা করাই তার দায়িত্ব! কিন্তু কোনো ব্যক্তি একথা বলে রেহাই পাবে না যে, তাকে কেউ শোধরায়নি, কেউ উপদেশ দেয়নি বা তাকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করেনি। একমাত্র না জানার কারণে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে সেখানে ক্ষমার সুযোগ রয়েছে। মৌলিক ন্যায় অন্যায়ের চেতনাবোধটুকু প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে, যাকে বলা যায় বিবেকবুদ্ধি। এই বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে যে কাজ করবে সে অবশ্যই (আল্লাহর রহমতে) সঠিক পথে চলতে পারবে।

অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা গোটা দলকে এক সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কারণ প্রত্যেক মানুষকে ভালো মন্দের বুঝ দেয়া হয়েছে, কাজেই অন্য মানুষ বা নেতা তাকে বিভ্রান্ত করেছে– একথা বলে রেহাই পাওয়া যাবে না। ব্যক্তির জন্যে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পরই তার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে অপরকে উপদেশদান এবং সংশোধনের জন্যে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়া, এইভাবেই সে খেলাফতের ভূমিকা পালন করবে। দলের অন্যান্য ব্যক্তিদের শোধরানোর জন্যে সে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাবে। সাধ্যের বাইরে সে কিছুই করতে পারে না। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা একথা জানেন বিধায় তিনি সাধ্যের বাইরে কিছু করার জন্যে কাউকে দায়িত্বও দেন না। এ জন্যে যে ব্যক্তি সচেতনভাবে দলীয় মানুষদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাবে, তাদের দলের কোনো ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ী করা হবে না। দলের জন্যে এটা আল্লাহর একটা বিরাট এহসান। এ এহসান সে পালন করেছে কিনা তার জন্যেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একইভাবে যে ব্যক্তিগতভাবে অন্যায় কাজ করবে ও ভুল পথে চলতে থাকবে, তার দল

ভালো কাজ করতে থাকলেও এ ভুল পথের পথিক তার কোনো ফায়দা পাবে না, ইতিপূর্বেও একাধিক জায়গায় এ আলোচনা এসে গেছে।

এ সত্যটি আল কোরআন তার নিজস্ব অনন্য পদ্ধতিতে অংকিত করেছে, যার কারণে হৃদয়ের গভীরে কঠিনভাবে এর প্রভাব পড়ে। আল কোরআন দাবী করে বলছে, যার যে কাজ করার সে তারই বোঝা বহন করবে, তারই ফল ভোগ করবে এবং কিছুতেই কেউ অন্য কারও বোঝা বহন করে দেবে না। সেই কঠিন দিনে মানুষ যখন নিজ নিজ বোঝা বহন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সাহায্যের জন্যে আপনজন বা আত্মীয়স্বজনকে ডাকতে থাকবে, কিন্তু আফসোস, তখন কেউই তাদের ডাকে জবাব দেবে না, তাদের বোঝা হালকা করার জন্যে এগিয়ে আসবে না!

হাশরের ময়দানের কিছু বর্ণনা

এই হচ্ছে সেই ভয়ানক দৃশ্যের বর্ণনা, যা হাশরের ময়দানে সবার সামনে এসে হাযির হবে। দেখা যাবে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের কর্মকান্ডের বোঝা বয়ে চলেছে; অবশেষে একসময় তারা পৌঁছুবে বিচার দন্ডের সামনে, অর্থাৎ মহা বিচারকের আদালতে, আর সেই অবস্থানে বসে সবার মধ্যে দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচার এক কঠিন প্রয়াস ফুটে উঠবে ..... আরও ফুটে উঠবে সেই দৃশ্য, যেখানে দেখা যাবে কষ্টের বোঝা একটু হালকা করার জন্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংগী-সাথী, আপনজন ও আত্মীয়স্বজনের কাছে আকুল আবেদন জানাতে থাকবে, কিন্তু কেউই এতোটুকু সহানুভূতি বা সমবেদনা জানানোর জন্যে এগিয়ে আসবে না। অনাগত দিনের অবশ্যম্ভাবী সেসব ভয়ানক অবস্থা সামনে রেখেই আজকের জনমানবকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষার দিকে খেয়াল করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই তুমি তাদের সতর্ক করতে পারবে যারা তাদের মালিককে না দেখেই ভয় করবে এবং নামায কায়েম করবে।'

অর্থাৎ উপরোল্লেখিত সম্ভাবনাময় জনপদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারাই হবে সেসব মানুষ যাদের হুঁশিয়ার করা হলে তারা সে হুঁশিয়ারীকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং কোনো প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে সাথে সাথে সাবধান হয়ে যাবে, তাদের রবকে তারা ভয় করবে এবং কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না, তারপর তাদের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবনে নামায কায়েম করা ও সমাজে নামাযের ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে কায়েম করবে এবং নিরংকুশভাবে তারা নিজেদের জীবনের সর্বত্র তাদের মালিকের আনুগত্য করবে; ওরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা রসূলের কাছ থেকে ফায়দা পাবে এবং তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে। সুতরাং যারা আল্লাহকে ভয় করবে না এবং যারা নামায কায়েম করবে না, তাদের কোনো দায়িত্ব রসূলের ওপর নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'যে পবিত্রতা অর্জন করবে সে তার নিজের জন্যেই তা গ্রহণ করবে।'

অর্থাৎ, যে এ পবিত্রতা অর্জন করবে, সে তা করবে তার নিজের জন্যে, নিজের ছাড়া অন্য কারো জন্যে নয়, কথাটা বড়ই সূক্ষ্ম অর্থবোধক শব্দ, এ শব্দটির মধ্যে বহু ব্যাপকতা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, আবেগপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণ রাখা ও অনুভূতিকে কলুষমুক্ত রাখার কথা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ব্যবহারে, ঝোঁকপ্রবণতায় এবং জীবনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে যার প্রতিফলন ঘটবে। এ শব্দটি বড়ই প্রাণোদ্দীপক যা মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

সেদিন তিনিই হিসাব গ্রহণকারী হবেন, আর ভালো বা মন্দ সকল কিছুর প্রতিদানও তিনিই দেবেন। এ জন্যে কোনো নেক কাজের পুরস্কার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না এবং কোনো মন্দ কাজ যে নযরের বাইরে পড়ে যাবে তাও নয়; আর এমন গোঁজামিলও কখনও দেয়া হবে না যে, একজনের পুরস্কার বা শাস্তি অন্য একজন পেয়ে যাবে, অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেসব ভুল ভ্রান্তি হয়ে

থাকে, হাশরের সে মহাবিচার দিনে সেই ধরনের কোনো ভুল ভ্রান্তির আশংকা থাকবে না। আলোচ্য আয়াতাংশে এই নিশ্চয়তাই দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে ঈমান ও কুফর কখনও সমান হবে না। সমান হবে না ভালো ও মন্দ, হেদায়াত ও গোমরাহী। যেমন সমান নয় অন্ধত্ব ও দৃষ্টিশক্তি, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত।

একটু খেয়াল করে দেখুন, প্রকৃতিগতভাবে কুফরের সাথে অন্ধত্ব, অন্ধকার, রৌদ্র ও মৃত্যুর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে ....।

ঈমান হচ্ছে নূর, এক স্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতি, অন্তরের মধ্যে এ জ্যোতি প্রবেশ করে গোটা অন্তর ও প্রাণকে উদ্ভাসিত করে, উদ্ভাসিত করে অংগ প্রত্যংগসমূহকে, মানুষের সকল অনুভূতিকে আলোকিত করে, এ এমন এক নূর যা সকল বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করে দেয়, সকল মূল্যবোধ জাগরিত করে এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে, এ সবের মধ্যে অবস্থিত দূরত্বের ব্যবধান সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দেয়। অতপর একজন মোমেন ঈমানের এ নূর দেখতে পায় এবং এরই আলোকে সে সকল দিকে তাকায়, যার ফলে সব কিছুর সঠিক তাৎপর্য বুঝা তার জন্যে সহজ হয়। এই নূরের আলোকেই সে জীবনের বন্ধুর পথে চলে, যার কারণে তার কাছে পথের এই নানাবিধ অবস্থা কোনো অজানা জিনিস বলে মনে হয় না, আর এ কারণেই কোনো অবস্থাতেই সে নিজেকে পরাজিত মনে করে না, নড়বড়ে হয় না। সে জীবনের পথ-পরিক্রমায় অকুতোভয় অনড় অবিচল হয়, কখনও চিত্ত তার বিহ্বল হয় না এবং কোনো সময়েই সে নিজেকে দিশাহারা বোধ করে না।

হাঁ, ঈমানই হচ্ছে মোমেনের প্রকৃত চোখ, যার দ্বারা সে দেখে, যার দ্বারা সে প্রতিটি বিষয়ের গভীরে তাকায়, সে সকল কিছুর তাৎপর্য ঈমানেরই মহান আলোকে বুঝতে পারে। জীবনের পথে চলতে গিয়ে ঝড় ঝঞ্ঝা যাই-ই আসুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে অস্থির হয় না এবং কোনো আঘাতেই সে ভেংগে পড়ে না। ঈমানের মধুর পরশই হয় তার সাথী, যা প্রতিটি পদে পদে তাকে সঞ্জীবিত করতে থাকে। এই ঈমানই এমন এক উজ্জ্বল আলো, যা শত হতাশার ঘন অন্ধকারেও তাকে পথ দেখাতে থাকে, তাকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বানায় এবং তার হৃদয়-প্রাণকে পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়।

ঈমান এমন এক সুশীতল শান্তির ছায়া, যা জীবনের খরতাপসম্পন্ন রৌদ্রের দিনে শ্রান্ত-ক্লান্ত মোসাফেরকে মায়াময় স্নিগ্ধ আশ্রয় দান করে, যার ধারক বাহক প্রত্যেক ব্যক্তিই এখানে পূর্ণ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে এবং এটি অন্তরকেও আনন্দ দেয়। এ এমন এক ছায়া যা সন্দেহ, হতাশা, বঞ্চনা, পেরেশানী এবং আঁধারে ঢাকা অহেতুক অমূলক অহংকারের বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়!

প্রকৃতপক্ষে ঈমানই হচ্ছে যিন্দেগী, প্রতিটি অন্তর ও প্রতিটি চেতনাকে উজ্জীবিত করার জন্যে ঈমান হচ্ছে এক জীবন্ত শক্তি। মানুষ যখন কোনো বিষয়ে মনস্থ করে এবং কোনো বিষয়ে অগ্রসর হতে চায়, তখন ঈমানই তাকে সে পথে চালিকা শক্তি যোগায়, যেমন বলা যায় ঈমান হচ্ছে কোনো নির্মাণ কাজের মূল পরিচালক এবং ঈমানই প্রতিটি উদ্যোগকে ফলপ্রসূ বানায়, এ শক্তি সরল সঠিক পথে চলার জন্যে মানুষকে শক্তি যোগায়, সাহস যোগায়– যোগায় উদ্দীপনা। ঈমানের এ শক্তিশালী বাতি নিভে যায় না এবং কখনও তা মানুষকে স্তিমিত হতে দেয় না। এর মধ্যে অর্থহীনতা বা যুক্তি বহির্ভূত কিছু নেই বা এটা কখনো ধ্বংস হবারও নয়।

অপরদিকে 'কুফর' হচ্ছে অন্ধত্ব, অন্তরের জন্যে এক বন্ধ্যাত্ব, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে 'কুফর' এমনই এক অন্ধত্ব যে, এটা কোনো যুক্তি প্রমাণ মেনে নেয় না এবং যা প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত, কুফর তা দেখতে পায় না। ঘটনাবলী এবং তার মূল্যবোধের তাৎপর্য দেখতে পায় না। দেখতে পায় না সেই মহাসত্যকে যার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বাস্তবে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে চলেছে।

'কুফর' হচ্ছে এক অন্ধকার অথবা সকল দিক দিয়েই এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অনুভূতি; তাই যখনই মানুষ ঈমানের নূর থেকে দূরে সরে যায়, তখনই তারা নানাপ্রকার এবং বিভিন্নমুখী অন্ধকারের মধ্যে পতিত হয়। এমন সংকট সমস্যার মধ্যে তারা ঘেরাও হয়ে যায় যে, সেই কঠিন অন্ধকারের জাল ছিন্ন করা তাদের জন্যে সুকঠিন হয়ে পড়ে। কুফরের কারণে এমন সব কঠিন সংকটের মধ্যে মানুষ পতিত হয় যে, কোনো জিনিসকেই তারা তার আসল রূপে দেখতে পায় না।

কুফর (সত্য অস্বীকৃতির মনোভাব) মানুষকে সত্য সঠিক বিষয় বুঝতে দেয় না; বরং সত্য থেকে তাদের বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। 'কুফর' এক প্রচন্ড তাপ প্রবাহ, যা অন্তরকে ঝলসে দেয়, অস্থিরতা, পেরেশানী, লক্ষ্য নির্ধারণে অপারগতা এবং সত্য সন্দর্শনে বা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তৃপ্তিহীনতার দুর্ভোগ এনে দেয়, পরিশেষে কুফরী মনোভাব মানুষকে জাহান্নামের ভীষণ উত্তপ্ত শাস্তির মধ্যে নিয়ে যাবে!

কুফর বা কুফরী মনোভাব হচ্ছে যেন একটি এক মৃত্যু, অন্তর ও বিবেকের দিক দিয়ে এক চরম ও কঠিন মৃত্যু। এ মনোভাব মানুষকে জীবনের মূল উৎস থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, দূরে সরিয়ে দেয় সেই পথ থেকে যা মানুষকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে নিয়োজিত থাকে। এ প্রবণতা মানুষকে সঠিক চিন্তা করতে দেয় না এবং সে সত্যের প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান করার ইচ্ছাই হচ্ছে মানব জীবনের মজ্জাগত চাহিদা, সেখানে তাকে ঢুকতেই দেয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে নিজস্ব এক প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি অনুসারে চললে তার প্রতিদান পাওয়াও তার জন্যে নির্ধারিত, আর এ জন্যেই প্রকৃতির আহ্বানে যে সাড়া দেবে আর যে দেবে না, সে কখনও বরাবর হবে না হতেও পারে না।

প্রত্যেক মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই আলাদা

আসুন এবার আমরা নবী (স.)-এর দিকে তাকাই, দেখা যাক তিনি কোনদিকে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন এবং কোন জিনিস থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিতে চাইছেন, তাঁর জীবনের বাস্তব কার্যাবলীর মাধ্যমে আমাদেরকে কোন সীমানার মধ্যে থাকতে তিনি উদ্বুদ্ধ করছেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান করায় কি ভূমিকা তিনি পালন করছেন। অতপর স্বেচ্ছাচারী শাসক ও পরিচালকবর্গের নাগপাশ থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে তিনি কি আমাদের কি প্রোগ্রাম দিচ্ছেন? এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনান তাকে যাকে তিনি (শোনাতে) চান। ...... সুতরাং দেখ, কেমন ছিলো আমার আযাব?' (আয়াত ২২-২৬)।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই মতভেদের বীজ রয়ে গেছে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের মধ্যে এবং মানুষের গঠন প্রকৃতির মধ্যে যে ভাবে পার্থক্য রয়েছে, সেই ভাবেই রয়েছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দাওয়াতকে গ্রহণ করার যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য, আর এই কারণেই আল্লাহর নযরে কেউ চক্ষুষ্মান আর কেউ অন্ধ। তারা বিভিন্ন জন সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে বিভিন্নভাবে দেখে। তারা ছায়া ও উত্তাপ, অন্ধকার ও আলো এবং জীবন ও মৃত্যুর তাৎপর্য বিভিন্নভাবে দেখে। এ সব কিছুর ওপরে রয়েছে আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে রক্ষিত মানুষের নিয়তি ও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিজ্ঞানময় মহা রহস্যভান্ডার এবং তাঁর যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা।

তারপর আসছে রসূল (স.)-এর প্রসংগ। জানান হচ্ছে যে. তিনি একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নন। অর্থাৎ সতর্ক করার পর তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তাঁর মানবীয় ক্ষমতা এই পর্যন্তই শেষ। অতপর কবরে যারা শায়িত রয়েছে তাদের শোনানোর দায়িত্ব তাঁর নয় এবং মৃত অন্তর নিয়ে যারা বেঁচে আছে তাদেরও জোর করে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার কাজও তাঁর নয়, কারণ তারাও তো মৃতদেরই শামিল। আর একমাত্র আল্লাহই যাকে ইচ্ছা তাকে শোনাতে সক্ষম, একমাত্র তাঁরই রয়েছে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা। অতএব কেউ যদি গোমরাহ হয়ে যায়, দেখে শুনে জেনে বুঝেও যদি কেউ সঠিক পথ গ্রহণ না করে, তাহলে সে বিষয়ে রসূলের কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সুন্দর সুমিষ্ট কথা দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান

জানানো। সত্যের পক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তি এবং (আল্লাহর দেয়া তথ্য অনুযায়ী) অতীতের ঘটনাবলী তুলে ধরা, এই ভাবেই তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব পালন করা এরপর আল্লাহ তায়ালা যাকে শোনাতে চাইবেন সে শুনবে, আর যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা চাইবেন না, সে শুনবে না।

ইতিপূর্বে (যেসব আলোচনা এসেছে তাতে দেখা গেছে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তুমি ওদের জন্যে চিন্তা ও আফসোস করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করে দিয়ো না।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছেন। তাঁর অবস্থা অন্য যে সব রসূল গুজরে গেছেন তাদের মতই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'প্রত্যেক জাতির কাছেই এইভাবে কোনো না কোনো সতর্ককারী এসেছে।'

এরপর যদি তিনি তাঁর জাতির মধ্য থেকে অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হন তাহলে তাঁর আর করার কি আছে। কেননা মানব জাতির ইতিহাস তো বরাবর এটাই দেখেছে, তারা সকল যামানায় রসূলদের এইভাবে অভ্যর্থনা (?) জানিয়েছে। রসূলদের কোনো ত্রুটির কারণে বা তাঁদের কথার মধ্যে কোনো যুক্তি ছিলো না বলে এমনটি হয়েছে তা নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে (তো এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়) যেহেতু ইতিপূর্বে যারা এসেছে তাদেরও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে.......।'

আর সুস্পষ্ট দলীল বলতে বুঝায় সত্যের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের দলীল প্রমাণ, যা মানবীয় বুদ্ধির খোরাক হিসাবে যথেষ্ট, এ সবের মধ্যে রয়েছে রসূলদের প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযা, যা তাদের দেয়া হয়েছে অথবা রসূলের বাগ্মিতা ও ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ, অত্যাশ্চর্য বাক্যবহ আসমানী কেতাবসমূহ যা অতি মূল্যবান উপদেশবাণীসহ পুস্তক আকারে নাযিল হয়েছে, এসেছে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও মানবীয় দায়িত্ব হিসাবে স্মরণিকা আকারে। এই ভাবে সে কেতাব সমৃদ্ধ ও সুন্দর সমুজ্জ্বলরূপে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

কিন্তু যত রসূলই দুনিয়ায় এসেছেন তাঁদের উম্মতরা তাদের বরাবর এইভাবেই অভ্যর্থনা (?) জানিয়েছে বলে জানা যায়। অতীতের সে সকল কেতাবের মধ্যে সব থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মূসা (আ.)-এর কাছে অবতীর্ণ কেতাব তাওরাত, আর অন্য সবাই ও তাদের কাছে সুস্পষ্ট কেতাব, দলীল প্রমাণ ও প্রেরিত পুস্তক। সব কিছু আসা সত্তেও তারা রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

রসূলদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে এবং তাদের আনীত হেদায়াতের পথে প্রদর্শিত দলীল প্রমাণাদির সাথে সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে এইই ছিলো জাতিসমূহের ভূমিকা। সুতরাং মোহাম্মাদুর রাসূল (স.)-এর প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার কোনো নতুন ব্যাপার ছিলো না বা এটা ছিলো না কোনো ভিন্ন ঘটনা। অতীতের ঘটনাবলীর মত এভাবেই তাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার চলতে থাকবে যারা আল্লাহ তায়ালার পথে, সত্য সঠিক পথে কাজ করতে থাকবে ও মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে থাকবে।

এখানে মোশরেকদের সামনে অতীতের সত্য বিরোধী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কঠিন পরিণতির ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে, যেন তারা সময় থাকতেই সাবধান হতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর পাকড়াও করলাম আমি তাদের যারা কুফরী করেছিলো।'

এরপর বিস্ময়ভরা এক চরম ভীতিজনক প্রশ্ন করা হচ্ছে– 'সুতরাং কেমন হলো তাদের শাস্তি?'

আসলে এ আযাব ছিলো বড়ই কঠিন এবং তাদের যখন পাকড়াও করা হল তখন তারা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। অতএব পূর্ববর্তীদের ভীষণ পরিণতির কথা স্মরণ করে পরবর্তীদের সাবধান হওয়া দরকার।

আল কোরআনের এই বিশেষ উপস্থাপন প্রক্রিয়ার সাথে আলোচ্য প্রসংগ শেষ হচ্ছে। অতপর শুরু হচ্ছে নতুন এক অধ্যায়, যা এক প্রশস্ত ও দিগন্তব্যাপী উপত্যকায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। (আয়াত ২৭-৩৮)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

রুকু ৪

২৭. হে (মানুষ,) তুমি কি (এ বিষয়টি কখনো) চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর এ (পানি) দ্বারা আমি (যমীনের বুকে) রং-বেরংয়ের ফলমূল উদগত করি, (এখানে) পাহাড়সমূহও রয়েছে (নানা রংয়ের, কোনোটা) সাদা (আবার কোনোটা) লাল, এর রংও (আবার) বিচিত্র রকমের, কোনোটা (সাদাও নয়, লালও নয়; বরং) নিকষ কালো। ২৮. একইভাবে মানুষ, (যমীনের ওপর) বিচরণশীল জীবজন্তু এবং পশুসমূহও রয়েছে নানা রংয়ের; আল্লাহ তায়ালাকে তার বান্দাদের মঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে ভালো করে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। ২৯. যারা আল্লাহ তায়ালার কেতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যারা (আমারই উদ্দেশে) গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে দান করে, (মূলত) তারা এমন এক ব্যবসায় (নিয়োজিত) আছে যা কোনোদিন (তাদের জন্যে) লোকসান বয়ে আনবে না; ৩০. কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের পুরোপুরি বিনিময় দান করবেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন; অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। ৩১. (হে নবী,) যে কেতাব আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি তাই একমাত্র সত্য, এর আগের যেসব (কেতাব) রয়েছে (এ কেতাব) তার সমর্থনকারী; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালো করেই জানেন (এবং তাদের ভালো করেই) তিনি দেখেন। ৩২. অতপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, আমি যাদের এ কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর

سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۖ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ۚ

যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; (আসলে) এটাই হচ্ছে (আল্লাহর) সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ। ৩৩. (সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ৩৪. (সেদিন) তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের মালিক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, ৩৫. যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)! ৩৬. (অপরদিকে) যারা (দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, (তখন) তারা মরে যাবে তাদের প্রতি এমন আদেশও কার্যকর হবে না, তাছাড়া তাদের আযাবও কোনো রকম লঘু করা হবে না; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি, ৩৭. (আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি (আজ) আমাদের এ (আযাব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম তা আর করবো না; (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি কি তোমাদের দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আযাবের মজা উপভোগ করো, (মূলত)

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۞ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞

যালেমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।

রুকু ৫

৩৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয় দেখা) অদেখা বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, (এমনকি মানুষের) মনের ভেতরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি ভালো করে জানেন।

তাফসীর

আয়াত ২৭-৩৮

এ অধ্যায়ের আলোচনায় সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল গ্রন্থ ও আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত কেতাবের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। বিশাল প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল গ্রন্থের সুবিস্তীর্ণ ও চমৎকার পাতাগুলো থেকে এ পাঠ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পাতাসমূহের রং বিভিন্ন, প্রকৃতি ও এর বিন্যাস বৈচিত্র্যময়। এ সব পাতা যে সব বৃক্ষ থেকে এসেছে তার ফলগুলোও নানা বর্ণের ও নানা স্বাদের; আর সেই বিশাল উপত্যকার পাশে অবস্থিত পাহাড় পর্বতগুলোও খোলা প্রকৃতির বুকে যেন আর একটি বিশাল গ্রন্থ .... অপর দিকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত কেতাবে এবং তার বর্ণনায় যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্য বিষয়গুলোর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। আর আরশে মোয়াল্লায় লিখিত এই যে আল কেতাব (যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চিরদিন সঠিক পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভাষায় তিনি নাযিল করেছেন), সে কেতাবের ওয়ারিস হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ। যুগে যুগে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম উম্মাহর (তাদের আত্মসমর্পণের ধরন ও আন্তরিকতার তারতম্য অনুসারে) বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠেছে। যেহেতু তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছে, এ জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার পর তাদের তাঁর নেয়ামত দান করবেন বলে ভরসা দিয়েছেন, তারা সেসব নেয়ামত পাওয়ার আশায় অপেক্ষারত রয়েছে, তারা নিজেদের মহান পরওয়ারদেগারের কৃপাধন্য অবস্থায় দেখতে চায় এবং তাঁর নেয়ামতভরা জান্নাতে স্থান লাভ করার জন্যে আকাংখী হয়ে রয়েছে। তারা এটাও আশা করে যে, তাদের সামনে থাকবে বিপদগ্রস্ত ও আযাবে পতিত কাফেরদের দৃশ্য। এই দীর্ঘ ও বিস্ময়কর অধ্যায়টির নানামুখী আলোচনা এই বর্ণনার ওপর শেষ হচ্ছে যে, না-ফরমানদের পরিণতি কি হবে না হবে তা সুনিশ্চিতভাবে কেউই জানে না একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া, যিনি বক্ষসমূহের মধ্যে অবস্থিত সর্ববিষয়ের খবর রাখেন .... । তাই তিনি বলছেন,

'তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিমান- ক্ষমাশীল।' (আয়াত ২৭-২৮)

জীবন ও জগতের এক বিস্ময়কর উপস্থাপনা

জীবন ও জগতের এটা এক বিস্ময়কর উপস্থাপনা। এর মাধ্যমে এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মূল উৎসের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই উপস্থাপনা ও আলোচনার বিষয়বস্তু

হচ্ছে গোটা পৃথিবী এবং এর মধ্যকার জীব ও জড় জগতের বর্ণবৈচিত্র্য, যার সাক্ষাত আমরা পাই ফল-মূল, পাহাড় পর্বত, মানব জাতি এবং বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তুর মাঝে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গোটা পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যময় জীব ও জড় জগতের আলোচনা করা হয়েছে এবং মানব হৃদয়কে এর দ্বারা আলোড়িত ও আন্দোলিত করা হয়েছে।

প্রথমেই আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের দৃশ্যটি চিত্রায়িত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, কিভাবে ওই বৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করা হয়। আলোচনায় ফলের রং বা বর্ণের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শিল্পী নেই যে তার তুলির আঁচড়ে ফলের বিচিত্র সব রঙের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কারণ, একশ্রেণীর ফলের রঙের সাথে অন্য শ্রেণীর ফলের রংয়ের মিল নেই। এমনকি একই শ্রেণীর ফলের রংয়ের মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, একই শ্রেণীর ফলের রঙের মাঝে কিছুটা হলেও পার্থক্য রয়েছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ফলের বর্ণবৈচিত্র্যের পর আসছে পাহাড় পর্বতের বর্ণবৈচিত্র্যের আলোচনা। এটাও একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ফল-মূল ও পাহাড় পর্বতের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উভয় শ্রেণীর মাঝে একটা স্বাভাবিক মিল দেখা যাবে। পাহাড় পর্বতে যে সব পাথরখন্ড পাওয়া যায় তার রংও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে এবং ফলের রঙের সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্যও রয়েছে। এমনকি আকৃতির ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় এই সাদৃশ্য এতোই গভীর থাকে যে, ফল আর পাথরের মধ্যকার পার্থক্যটুকু নির্ণয় করা আমাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে।

'পর্বতসমূহের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ.........।' (আয়াত ২৭)

আলোচ্য আয়াতে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথের উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও একটা বাস্তব সত্য। সাদা বর্ণের গিরিপথগুলোর মাঝে এমনিভাবে লাল বর্ণের গিরিপথগুলোর মাঝেও পার্থক্য দেখা যায়। কোনোটা হাল্কা বর্ণের, কোনোটা গভীর বর্ণের আবার কোনোটা মিশ্র বর্ণের। এ ছাড়া গভীর কালো বর্ণের গিরিপথও রয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, আর তা হচ্ছে, ফল-মূলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি পাথর ও গিরিপথের বর্ণবৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়া হয়েছে এবং তার মাঝে উচ্চমাত্রায় সৌন্দর্যানুভূতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে তার দৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর রূপ বিমূর্ত হয়ে ধরা পড়বে। তার দৃষ্টিতে পাথরের রূপ আর ফলের রূপ এখানে এসে একই মাত্রায় ধরা পড়বে। অথচ উভয়টির প্রকৃতি ও কার্যকারিতার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও মানুষ যখন বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তখন উভয়টির রূপের মাঝে এক অভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করে যা সত্যিই দেখার মতো এবং উপলব্ধি করার মতো।

এরপর মানব জাতির বর্ণবৈচিত্রের কথা আলোচিত হয়েছে। এই বর্ণবৈচিত্র্য কেবল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং একই গোষ্ঠী ও জাতির প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়; বরং এই বর্ণবৈচিত্র্য একই মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়া যমজ সন্তানদের মাঝেও লক্ষণীয়।

বিভিন্ন প্রজাতির জীব জন্তু ও প্রাণীর মাঝেও এই বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। চতুষ্পদ জন্তুসহ পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সব ধরনের প্রাণীর মাঝেই এই রং ও বর্ণের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। ফল-মূল এবং পর্বতগিরির বর্ণ যেমন আকর্ষণীয়, ঠিক তেমনি আকর্ষণীয় বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু ও প্রাণীর বর্ণও।

নিসন্দেহে বলা যায়, গোটা প্রাণীজগত হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থের নাম, যার প্রতিটি পৃষ্ঠা দৃষ্টিনন্দন, যার গঠন ও অলংকরণ বিস্ময়কর। এ গ্রন্থটি মানুষের চোখের সামনে মূল সত্য তুলে ধরে এবং এর পাতাগুলো মেলে ধরে। পবিত্র কোরআন বলছে, যে সকল জ্ঞানী লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে। কোরআনের ভাষা হচ্ছে এই– 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে।' (আয়াত ২৮)

জগত নামক এই বিশাল গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠাই এখানে মেলে ধরা হয়েছে। এই কয়টি পৃষ্ঠা যারা পাঠ করে এর মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারে, একমাত্র তারাই আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে, তাঁর অপার কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে এবং তার মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব অনুভব করতে পারে। ফলে একমাত্র তারাই তাঁকে সত্যিকার অর্থে ভয়ও করতে শেখে এবং যথার্থরূপে তাঁর এবাদাত বন্দেগী করতে পারে। তারা কিন্তু এটা কোনো অজানা অনুভূতি বা ভয় ভীতির বশবর্তী হয়ে করে না; বরং গভীর জ্ঞান ও প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়েই তারা এটা করে থাকে।

এই যে গোটা কয়েক পৃষ্ঠা এ হচ্ছে, জগত নামক এই বিশাল গ্রন্থের সামান্য কয়টি নমুনা। অপরদিকে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রং ও বর্ণ হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত গঠন, বিন্যাসগত সৌন্দর্যের প্রতীক, যা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। এই জ্ঞান হৃদয়ে অনুভূতি জাগায়, হৃদয়কে করে আন্দোলিত। এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সুন্দর জগতের গঠন বিন্যাস এবং এর রং ও রূপের মাঝে আল্লাহর সুনিপুণ হাতকে কর্মরত দেখতে পায়।

মনে হয় এই জগতের রূপরেখা ও আকৃতি প্রকৃতির মাঝে সৌন্দর্যের উপাদান ইচ্ছাকৃতভাবেই রাখা হয়েছে। কারণ অনেক বস্তু ও প্রাণী কেবল এই সৌন্দর্যের সাহায্যেই তার প্রাকৃতিক ধর্ম পালন করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ফুলের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বলতে পারি। ফুলের রূপ ও গন্ধের আকর্ষণেই মৌমাছি এবং প্রজাপতি ছুটে আসে, আর এর ফলে মূল কাজটি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মৌমাছি ও প্রজাপতি ফুলের রেণু বহন করে নিয়ে যায়, যার সাহায্যে ফলের সৃষ্টি হয়। তাহলে বুঝা গেলো যে, ফুল তার রূপের সাহায্যেই তার প্রাকৃতিক দায়িত্বটা পালন করে যাচ্ছে। প্রজাতির লিংগের ক্ষেত্রেও এই গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই। রূপের কারণেই বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং এর ফলে দুটো ভিন্নধর্মী লিংগের প্রাণী তার প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালন করে চলে। তাই বলতে পারি, রূপও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে থাকে।

এই জগতের গঠন ও বিন্যাসে রূপ একটি বাঞ্ছিত উপাদান বলেই পবিত্র কোরআনে এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'

অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শক্তিধর এবং কর্মফল প্রদানের ক্ষেত্রেও শক্তিধর। তেমনিভাবে তিনি ক্ষমাশীলও। অর্থাৎ যারা তাঁর অপার কুদরতের নিদর্শনগুলো দেখেও তাঁকে ভয় করে না, তাদের তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। জগত নামক গ্রন্থের আলোচনার পর এখন আলোচিত হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন, যার তেলাওয়াত করা হয় এবং যার তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ সওয়াবের আশা করে থাকে। বলা হয়েছে,

'যারা আল্লাহর কেতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে............।' (আয়াত ২৯)

আল্লাহর কেতাব পাঠ করার মাঝে ভিন্ন একটি তাৎপর্য রয়েছে, এখানে পাঠ করার অর্থ কেবল সুর করে অথবা বিনা সুরে এর বাক্যগুলো আবৃত্তি করা নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে, গভীর দৃষ্টি সংবেদনশীল মন নিয়ে পাঠ করা এবং এমনভাবে পাঠ করা যেন এর ফলে তার মাঝে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং তার আচার আচরণে সুস্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে সে নামায কায়েম করবে, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে গোপনে প্রকাশ্যে দান করবে এবং এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি রেযামন্দি কামনা করবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এটাকে বলা হয়েছে লোকসানবিহীন ব্যবসা।

কারণ, যারা আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে দান করে তারা ভালো করেই জানে যে, প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর কাছ থেকে তারা যা পাবে তা এই পার্থিব ধন সম্পদ থেকে অতি উত্তম। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, তাদের এই ব্যবসা নিশ্চিত লাভের ব্যবসা। এখানে ক্ষয় ক্ষতির কোনোই আশঙ্কা নেই। কারণ, এই ব্যবসার অপর পক্ষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এই ব্যবসা হচ্ছে পরকালীন জীবনের জন্যে। কাজেই এই ব্যবসায় লাভ সুনিশ্চিত এবং তাও হবে পরিপূর্ণ; বরং আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়ায় এই লাভ বৃদ্ধিও পাবে। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। তাই তিনি বান্দার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন এবং তার কর্মের যথার্থ মর্যাদা ও উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহর এই গুণটিকে 'শোকর' বা কৃতজ্ঞতা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কৃতজ্ঞতার মাঝে সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের একটা ভাব নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনাভংগির মাধ্যমে বান্দাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আর সেটা হলো, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজেই বান্দার কর্মের জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন, তাহলে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি বান্দার উচিত নয়?

আল্লাহর কেতাবের প্রকৃতি

এখানে আল্লাহর কেতাবের প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে এবং এর বাণী ও বক্তব্য যে সত্য সে কথাও বলা হচ্ছে। এর পর আলোচনা করা হবে এই কেতাবের ধারক বাহকদের সম্পর্কে। বলা হচ্ছে,

'আমি তোমার প্রতি যে কেতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য............।' (আয়াত ৩১)

এই মহাগ্রন্থের বাণী ও বক্তব্য যে সত্য তা এর আলোচিত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। কারণ, এই নিখিল বিশ্বের মাঝে যা কিছু সত্য ও বাস্তব, তারই যথার্থ ও সঠিক প্রতিফলন এতে ঘটেছে। তাই এই গ্রন্থটিকে বলা যায় একটি আক্ষরিক পৃষ্ঠা আর গোটা সৃষ্টি জগতকে বলা যায় এক একটি নীরব পৃষ্ঠা। তাছাড়া একই উৎস থেকে প্রাপ্ত পূর্ববর্তী অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের সত্যায়নও হচ্ছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। কারণ, এর উৎস হচ্ছে এক অভিন্ন। তবে মানুষের প্রয়োজন, চাহিদা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কেতাব অবতীর্ণ করেন। কারণ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন।'

এই গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ উম্মতকে দান করেছেন। এর জন্যে তিনি এই উম্মতকে নির্বাচিত করেছেন। বলা হয়েছে,

'অতপর আমি কেতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি।' (আয়াত ৩২)

এই মনোনয়ন একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মান প্রমাণ করে, তেমনি প্রমাণ করে এই মনোনয়নের মাধ্যমে আরোপিত গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি। এখন এই গুরুদায়িত্ব পালনে আল্লাহর মনোনীত উম্মত কি সাড়া দেবে?

এই গুরুদায়িত্বের জন্যে মনোনীত করার ফলেই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে প্রতিদানের ক্ষেত্রেও সম্মানে ভূষিত করেছেন, এমনকি এই উম্মতের কেউ ভুল ক্রটি করলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাই বলা হয়েছে,

'তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথেও অগ্রগামী। (আয়াত ৩২)

প্রথম দল হচ্ছে পাপীদের। এদের সৎকাজের তুলনায় পাপের সংখ্যা বেশী। এদের সংখ্যাই সাধারণত বেশী। সম্ভবত সে কারণেই এদের কথা প্রথমে বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে মধ্যপন্থীদের। অর্থাৎ এদের অসৎ ও সৎকাজ দুটোই সমান সমান। আর তৃতীয় দলটি হচ্ছে সতকাজে অগ্রগামীদের। আল্লাহর নির্দেশে এরা সৎকাজে এগিয়ে থাকে। পাপের তুলনায় এদের সৎকাজের পাল্লা সব সময়ই ভারি, কিন্তু আল্লাহর দয়া ও কৃপার ক্ষেত্রে এই তিনটি দলই সমান। কারণ, এদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে স্থান দেবেন এবং আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন নেয়ামত তাদের দান করবেন। অবশ্য জান্নাতে এদের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আল্লাহর মনোনয়ন ও প্রতিদানের মাধ্যমে এই উম্মতের প্রাপ্ত যে মর্যাদার কথা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তার অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যা এখানে দিতে চাই না। আয়াতের বক্তব্যে যতোটুকু বুঝা যাচ্ছে ততোটুকুই যথেষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও দয়ায় এই উম্মতের সবাই এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহর জানা ও নির্ধারিত নেয়ামত ভোগ করবে। এই জান্নাত ও এর মধ্যকার নেয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'এটাই মহা অনুগ্রহ ....।' (আয়াত ৩২-৩৫)

কোরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে দু'ধরনের নেয়ামতের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে চাক্ষুষ বস্তুজাত নেয়ামত আর অপরটি হচ্ছে অনুভব্য মানসজাত নেয়ামত। প্রথমটি দেখা যায় আর দ্বিতীয়টি অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়। যেমন বলা হচ্ছে, 'সেখানে তারা স্বর্ণ নির্মিত, মোতি খচিত কংকণ দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের '....... এই আয়াতে যেসব নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে সে গুলো নিতান্তই বস্তুগত নেয়ামত যা চোখে দেখা যায়। এগুলোর প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে, আগ্রহ থাকে। অপরদিকে আর একশ্রেণীর নেয়ামতের কথা বলা হচ্ছে যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যার সম্পর্ক মন মস্তিষ্কের সাথে। যেমন সন্তুষ্টি, শান্তি ও পরিতুষ্টি— এ বিষয়টি আয়াতে এভাবে এসেছে, 'আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী ....।' (আয়াত ৩৪-৩৫)

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাতের দুঃখ দুর্দশা দূর করার কথা বলা হয়েছে, ক্ষমার কথা বলা হয়েছে, প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে, স্থায়ী নিবাসের কথা বলা হয়েছে এবং আরাম ও শান্তির কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে বলা হয়েছে, এ সকল নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা নিতান্তই অনুগ্রহ দিয়ে বান্দাকে দান করবেন। এসব নেয়ামত অধিকারবলে বা দাবী করে কেউ লাভ করতে পারবে না; বরং আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে যাকে দান করবেন কেবল সেই এর অধিকারী হবে।

আলোচ্য আয়াতে যে পরিবেশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা আরামের পরিবেশ, শান্তির পরিবেশ ও ভোগ বিলাসিতার পরিবেশ। এই পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমন সব শব্দ চয়ন করা হয়েছে যা ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনার দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে দয়া ও মমত্বের এক অপূর্ব দৃশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। যেখানে কষ্ট নেই, ক্লান্তি নেই, আছে কেবল শান্তি ও আরাম। তাই আয়াতে এমন শব্দ পরিহার করা হয়েছে যার উচ্চারণ কষ্টসাধ্য এবং যা কঠোরতার দ্যোতনা

প্রকাশ করে। আর সে কারণেই দুঃখ শব্দের জন্যে 'হুযন'-এর পরিবর্তে 'হাম্ম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনি 'জান্নাত' শব্দের পরিবর্তে 'দারুল মোকামাহ' বা আবাসস্থল ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, 'হুয্ন'-এর তুলনায় 'হাম্ম' এবং 'জান্নাত'-এর তুলনায় 'দারুল মোকামাহ' শব্দ দুটোর উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক। মোটকথা, নম্রতা, কোমলতা ও সরলতার একটা ভাব আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এখন আমরা বিপরীত দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করছি। এখানে আমরা দেখতে পাই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার চিত্র। এই চিত্রটি আমরা নিচের আয়াতে এভাবে দেখতে পাই,

'আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন ...।' (আয়াত ৩৬-৩৭)

কাফের মোশরেকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল জ্বলতে থাকবে। তাদের এই শাস্তি কখনও লঘু করা হবে না। এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেও মৃত্যু তাদের স্পর্শ করবে না। তারা সেখানে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকবে, বিলাপ করতে থাকবে, আর্তনাদ করতে থাকবে এবং অনুনয় বিনয় করে বলতে থাকবে, 'আমাদের এখান থেকে বের করে নাও, আমরা আগের মতো আর অসৎ কাজ করবো না।' তাদের এই বক্তব্যে অপরাধের স্বীকারোক্তি রয়েছে, আর সাথে সাথে রয়েছে অনুশোচনা, কিন্তু সময় ততোক্ষণে পার হয়ে গেছে। অনুশোচনায় কোনো লাভ হবে না। তাই তাদের এই বক্তব্যের উত্তর দেয়া হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। বলা হচ্ছে,

'আমি কি তোমাদের এতোটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে?'

অর্থাৎ যে বয়স তোমাদের দেয়া হয়েছিলো তা উপদেশ গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু তোমরা এর সদ্ব্যবহার করনি। তাছাড়া তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিলো, কিন্তু তা সত্তেও তোমরা সতর্ক হওনি, উপদেশ গ্রহণ করনি। কাজেই এখন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করো। তোমাদের রক্ষা করার মতো এখানে কেউ নেই।

এখানে আমরা বেশ কিছু বিপরীতমুখী চিত্র দেখতে পাই। যেমন, সুখ শান্তির বিপরীতে রয়েছে উদ্বেগ অশান্তির চিত্র; দোয়া ও কৃতজ্ঞতার সুরেলা কণ্ঠের বিপরীতে রয়েছে আর্তনাদ ও চিৎকারের মর্ম-বিদারী কণ্ঠ। আদর আপ্যায়ন ও সাদরে গ্রহণের বিপরীতে রয়েছে উপেক্ষা এবং ভর্ৎসনার চিত্র। কোমল সুর ও সুসংহত ছন্দের বিপরীতে রয়েছে কর্কশ সুর ও তীব্র ছন্দের অস্তিত্ব। মোটকথা, আংশিক ও সামষ্টিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরতিমুখী দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হয়েছে।

এসব দৃশ্যের অবতারণার পর চূড়ান্তভাবে একটি মন্তব্য পেশ করা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই–

'আল্লাহ আসমান যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত।' (আয়াত ৩৮)

কেতাব নাযিল করা, এই কেতাবের ধারক ও বাহকদের মনোনীত করা, অত্যাচারী বান্দাদের ক্ষমা করা, সৎকর্মশীল বান্দাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করা এবং কাফেরদের জন্যে কঠিন শাস্তি ও পরিণতির ঘোষণা দেয়া– এসব কিছু করা কেবল সেই মহান সত্ত্বার পক্ষেই সম্ভব যিনি ব্যাপক জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী। এই হিসেবে উপরের মন্তব্যটি অবশ্যই একটি যথার্থ মন্তব্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন একমাত্র সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আসমান যমীনের সকল ভেদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। শুধু তাই নয়; বরং মানুষের অন্তর জগতে কি ঘটছে তার খবরও তিনি রাখেন, কাজেই এই ব্যাপক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের বদৌলতে ওপরে বর্ণিত কাজগুলো সমাধা করা একমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব। (আয়াত ৩৯-৪৫)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَٰوَٰتِ ۖ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ

৩৯. তিনিই (এ) যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন; (এখন) যে কোনো ব্যক্তিই কুফরী করবে, তার কুফরী (ও কুফরীর ফলাফল) তার নিজের ওপরই (পড়বে); কাফেরদের জন্যে (এ) কুফরী কেবল (তাদের প্রতি) তাদের মালিকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে, (তদুপরি) কাফেরদের এ কুফরী (তাদের নিজেদের) বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। ৪০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা (সেসব) শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো কি? যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে ডাকো, আমাকে দেখাও তো তারা এ যমীনের কিছু সৃষ্টি করেছে কিনা– কিংবা আকাশমন্ডল সৃষ্টির (পরিকল্পনার) মাঝে তাদের কোনো অংশ আছে কিনা– না আমি তাদের কোনো কেতাব দান করেছি যে, (এ জন্যে) তার থেকে কোনো দলীল প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, বরং এরা হচ্ছে যালেম, এরা একে অপরকে প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। ৪১. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই আসমানসমূহ ও যমীনকে স্থির করে (ধরে) রেখেছেন, যাতে করে ওরা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত না হতে পারে, যদি (কখনো) ওরা কক্ষচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে (তুমিই বলো), আল্লাহ তায়ালার পর এমন কে আছে যে এদের উভয়কে (পুনঃ) স্থির করতে পারবে, অবশ্যই তিনি মহা সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ৪২. এরাই (এক সময়) সুদৃঢ় কসম করে বলতো, যদি তাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) কোনো সতর্ককারী (নবী) আসে, তাহলে তারা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা (তার প্রতি) অধিকতর আনুগত্যশীল হবে, অতপর (সত্যিই) যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) এলো, তখন (দেখা গেলো, তার আগমন) এদের (সত্য-) বিমুখতাই শুধু বাড়িয়ে দিলো, ৪৩. বৃদ্ধি পেলো (আল্লাহর) যমীনে এদের অহংকার প্রকাশ

السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

ও (তাতে) কুটিল ষড়যন্ত্র, কুটিল ষড়যন্ত্র (জাল অবশ্য) ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করে না, তবে কি তারা অতীতে (ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে) যা কিছু ঘটেছে (এখনও) তেমন ধরনের কিছুর প্রতীক্ষা করছে? (যদি তাই হয়, তবে শুনে রাখো,) তুমি (এদের বেলায়ও) আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন দেখবে না, না কখনো তুমি (এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধান নড়াচড়া অবস্থায় (দেখতে) পাবে। ৪৪. তারা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি, তারা কি তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের পরিণাম দেখেনি, তা কেমন (ভয়াবহ) ছিলো! অথচ তারা এদের তুলনায় ছিলো অনেক বলশালী; (কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন এলো, তখন) আসমানসমূহ ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারলো না; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৪৫. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার (বিদ্রোহমূলক) আচরণের জন্যে পাকড়াও করতে চাইলে ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি জীব জন্তুকেও তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতপর একদিন যখন তাদের (নির্দিষ্ট) সময় আসবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

তাফসীর
আয়াত ৩৯-৪৫

আলোচ্য সূরার এই শেষ পর্বটিতেও বেশকিছু হৃদয়স্পর্শী আলোচনা এসেছে এবং একাধিক ব্যঞ্জনার উপস্থিতি রয়েছে। যুগ থেকে যুগান্তরে এবং কাল থেকে কালান্তরে মানবতার রূপ কি ছিলো এখানে সে আলোচনা এসেছে। ইহলোক ও উর্ধ্বলোকসহ গোটা বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো শরীকানা আছে কিনা সে আলোচনা এসেছে। আসমান ও যমীনের পরিচালনার পেছনে আল্লাহর যে কুদরতী ও অদৃশ্য হাতটি কাজ করছে, তার আলোচনা এসেছে। এরপর

আলোচনায় এসেছে সেসব লোকদের প্রসংগ যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন ও দলীল প্রমাণগুলো অস্বীকার করেছে। অথচ তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলো যে, যদি কোনো সতর্ককারীর আগমন ঘটে তাহলে তারা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এই ওয়াদা ভংগ করে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে কাংখিত সতর্ককারীর আগমনের পর তাদের ঘৃণা উপেক্ষা আরও বেড়ে যায়। এদের প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়ের মর্মান্তিক পরিণতির কথাও আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখেও এরা আল্লাহকে ভয় করে না। অনুরূপ পরিণতি যে এদেরও হতে পারে সে কথা এরা চিন্তা করে না। অথচ এরা ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর বিচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনোই উপায় নেই। সব শেষে মনে ভয় জাগানোর মতো একটি উক্তি করা হয়েছে।

কারো উত্থান কারো পতন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এক চিরন্তন রীতি

'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না'.....................তবে এটা তাঁরই অপার করুণা ও মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে সুযোগ দিয়ে থাকেন এবং এই ধ্বংসাত্মক ও প্রলয়ংকর শাস্তি মুলতবি করে দেন।

'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন................। (আয়াত ৩৯)

পৃথিবীর বুকে এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্ম আসছে। এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের উত্তরাধিকারী হচ্ছে। এক রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটছে আর এক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটছে। এক প্রদীপ নিভছে আর এক প্রদীপ জ্বলছে। এই যে বিলুপ্তি ও উৎপত্তির ধারাবাহিকতা, তা যুগ যুগ ধরে চলছে। এই চিরন্তন গতির দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালে মানুষ এতে উপদেশ গ্রহণ করার মতো এবং শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাবে। তখন অস্তিত্বমান লোকেরা বুঝতে পারবে যে, একদিন তারাও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে। পরবর্তী যুগের লোকেরা তাদের ঘটনাবলীর কথা আলোচনা করবে, তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, গবেষণা করবে, ঠিক যেমনটি তারা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের বিষয়ে করে থাকে। আর এভাবেই উদাসীন ও অচেতন লোকদের মাঝে চেতনার সৃষ্টি হবে। তখন তারা আল্লাহর কুদরতী হাতটি দেখতে পাবে, যে হাতটিতে রয়েছে মানুষের জীবন মৃত্যু, যে হাতটিতে রয়েছে ক্ষমতার ছড়ি, যে হাতটিতে রয়েছে রাষ্ট্রের উত্থান পতন। যে হাতটি হচ্ছে যাবতীয় ক্ষমতার উৎস এবং যে হাতটিতে রয়েছে প্রজন্মের উত্তরাধিকার। সব কিছুরই উৎপত্তি ঘটবে, লয় ও বিলুপ্তি ঘটবে, কিন্তু যে সত্ত্বার কোনো লয় নেই, কোনো ধ্বংস নেই, কোনো বিলুপ্তি নেই; বরং যে সত্ত্বা চিরন্তন, অমর ও অবিনশ্বর। তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ।

যে সত্ত্বার লয় ঘটে, বিলুপ্তি ঘটে, সে সত্ত্বা কখনও অমর হতে পারে না, চিরন্তন হতে পারে না। যারা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে জীবনযাত্রায় বের হয়েছে, যাদের রেখে যাওয়া কীর্তি ও নিদর্শন দেখার মত লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সর্বশেষ মুহূর্তে নিজেদের ব্যাপারে একটু সতর্ক হওয়া, নিজেদের পেছনে কিছু সুন্দর স্মৃতি রেখে যাওয়া এবং পরকালের মুক্তির জন্যে কিছু করে যাওয়া উচিত।

মানুষের সামনে যখন উৎপত্তি ও বিলুপ্তি, উত্থান ও পতন, অস্থায়ী ক্ষমতা, নশ্বর জীবন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের আগমন– এ সবের দৃশ্য আসে, তখন তার মনে এ জাতীয় চিন্তারই উদ্রেক হয়। তখন সে এই আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে পারে, 'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি

করেছেন'........ সে বুঝতে পারে, প্রতিটি মানুষ এককভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হবে। কেউ কারও দায়ভার বহন করবে না এবং কেউ কাউকে রক্ষাও করতে পারবে না। কেউ যদি আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয়; বরং উপেক্ষা করে, অস্বীকার করে এবং ভুল পথে পা বাড়ায়, তাহলে এর পরিণতি এককভাবে তাকেই ভোগ করতে হবে। সে কথাই আলোচ্য আয়াতের নিচের অংশে বলা হয়েছে,

'অতএব যে কুফরী করবে, তার কুফরী তার ওপরই বর্তাবে' (আয়াত ৩৯)

আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফরীর পরিণাম হবে আল্লাহর ক্রোধ। যদি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তাহলে তার ধ্বংসের আর কি বাকী থাকে? কারণ এই ক্ষতি ও ধ্বংসই হচ্ছে চূড়ান্ত। এর পর আর কোনো ক্ষতি ও ধ্বংস থাকতে পারে না।

পরবর্তী আয়াতে ইহলোক ও উর্ধ্বলোকে তথাকথিত দেব দেবীদের কোনো অবদান, কোনো শরীকানা বা কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'বলো, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকো? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও।.......... (আয়াত ৪০)

অত্যন্ত সুস্পষ্ট যুক্তি এবং জাজ্বল্যমান দলীল প্রমাণ এই যে, পৃথিবী এবং এর মধ্যকার প্রতিটি বস্তু মানুষের চোখের সামনে রয়েছে, এই পৃথিবীর কোনো অংশ বা বস্তু আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি সৃষ্টি করেছে বলে কেউ কি দাবী করতে পারবে? এমন দাবী করার মতো ধৃষ্টতা কেউ দেখালে সাথে সাথে এই পৃথিবীর প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি বস্তু সেই দাবী নাকচ করে দেবে এবং চিৎকার করে বলে ওঠবে, পথিবীর সব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। কারণ তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের মাঝেই এমন কিছু নমুনা ও বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে, যার দাবীদার আর কেউ হতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়। কেননা, তার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রদর্শন করার মতো ক্ষমতা এই নশ্বর সৃষ্টি জগতের কারো নেই।

এই তথাকথিত ও কল্পিত দেব-দেবীদের কোনো মালিকানা উর্ধ্বলোকে আছে কি? না, তা তো সম্ভবই নয়। পৃথিবীর কোনো অংশের মালিকানার দাবীই যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সে বিশাল উর্ধ্বজগতের মালিকানা দাবী করা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? এই কল্পিত মাবুদদের কেউ কি দাবী করে বলতে পারবে, উর্ধ্বজগতের সৃষ্টির পেছনে তার অবদান আছে অথবা এর মালিকানায় তার কোনো অংশ আছে? এমনকি যারা জ্বিন অথবা ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে তারাও কোনো দিন এমন দাবী করতে পারে না। তারা বড় জোর এতোটুকু বলে থাকে যে, জ্বিন পরীর সাহায্যে তারা গায়ব বা অদৃশ্য জগতের খবরাখবর লাভ করে। অথবা আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে ফেরেশতারা সুপারিশ করবে।

আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'না আমি তাদের কোনো কেতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে?'

অর্থাৎ সে কল্পিত শরীকদের হাতে এমন কোনো ঐশী গ্রন্থও নেই যার ওপর ভিত্তি করে তারা এমন দাবী করতে পারে। প্রশ্নটি কল্পিত দেব-দেবীদের লক্ষ্য করেও হতে পারে এবং স্বয়ং এদের পূজারীদের লক্ষ্য করেও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াবে, দেব-দেবীর পূজারীরা নিজেদের এই পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাস কোথা থেকে পেয়েছে? এই আকীদা বিশ্বাস কি তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো ঐশীগ্রন্থ থেকে পেয়েছে? না, এমন দাবী ওরা কখনও করতে পারে না। এই প্রশ্ন দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে এখানে একটি বাস্তব সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তাহলো,

আকীদা বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আর এটাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। এ জাতীয় উৎসের দাবীদার মোশরেক সম্প্রদায় কখনও হতে পারে না, অথচ আল্লাহর রসূল (স.)-ই সে দাবী করতে পারেন। কারণ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ঐশী বাণী লাভ করেছেন। এরপরও কাফের মোশরেকরা তাঁকে উপেক্ষা করছে কেন?

'বরং যালেমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে', (আয়াত নং ৪০-এর শেষাংশ)

অর্থাৎ কাফের মোশরেকদের দল সব সময়ই একে অপরকে বলে বেড়ায় যে, তাদের আদর্শই হচ্ছে পরম আদর্শ এবং অবশেষে তাদেরই বিজয় হবে, কিন্তু এসব কথা বলে এরা নিজেরাও প্রতারিত হয় এবং অন্যদেরও প্রতারিত করে। এই ধোকা প্রতারণার মাঝেই তাদের নিষ্ফল জীবন কেটে যায়।

ইহলোক ঊর্ধ্বলোক কোথাও আল্লাহর সাথে কারও কোনো শরীকানা নেই, কোনো অবদান নেই বা কোনো শরীকের অস্তিত্ব নেই– এই সত্য প্রমাণ করার পর পরবর্তী আয়াতে আর একটি সত্যের প্রমাণ দেয়া হচ্ছে। যেমন,

'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন........' (আয়াত ৪১)

এই যে আসমান এই যে যমীন, এই যে মহাশূন্যের ওপর ভাসমান অগণিত গ্রহ নক্ষত্র যা নিজ নিজ কক্ষপথে অনন্ত অসীম কাল থেকে এবং বিরামহীনভাবে, অলজ্ঘনীয় একটি নিয়মের অধীনে ঘুরে বেড়ায়, এদের ধারণ করার মতো খুঁটিও নেই, কোনো রশিও নেই। এই বিশাল বিস্ময়কর সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষ যদি গভীর দৃষ্টি এবং চিন্তাশীল মন নিয়ে তাকায়, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবে, উপলব্ধি করতে পারবে, একটি অদৃশ্য, ক্ষমতাধর ও শক্তিধর হাত এর পেছনে কাজ করছে। এই গোটা সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একে ধ্বংস থেকে রক্ষা করছে।

যদি আসমান ও যমীন নিজ নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হতো এবং এর নিয়ম শৃংখলার মাঝে বিপর্যয় ঘটতো, তাহলে এসবকে অন্য কোনো শক্তি রক্ষা করতে পারতো না। কারণ, এই বিপর্যয় যখন ঘটবে তখন গোটা সৃষ্টি জগতেরও বিলুপ্তি ঘটবে। সেই মুহূর্তে গ্রহ নক্ষত্র ধ্বংস হবে, সৌরজগত ধ্বংস হবে। এই মহাশূন্যে তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ধ্বংসের হাত থেকে একে কেউ রক্ষাও করতে পারবে না।

পার্থিব জীবনের চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের এটাই হচ্ছে নির্ধারিত সময়। এটাই হচ্ছে সেই চরম মুহূর্ত যখন মানুষ ভিন্ন একটি জগতে পাড়ি জমাবে, সে জগতের সব কিছুই হবে এই পার্থিব জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই সত্য বাস্তব তথ্যটি তুলে ধরার পর বলা হয়েছে,

'তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।'

তিনি সহনশীল, তাই মানুষকে সুযোগ দেন। তাদের পাপাচারের কারণে পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিচ্ছেন না। হিসাব নিকাশের নির্ধারিত মুহূর্তটির জন্যে তাদের সুযোগ দিচ্ছেন যেন তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হতে পারে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে এবং সৎকাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। তিনি ক্ষমাশীল, তাই তিনি মানুষকে তার প্রতিটি পাপের জন্যে শাস্তি দেন না, পাকড়াও করেন না; বরং তাদের অনেক ভুল ত্রুটিই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। যদি তাদের মাঝে কল্যাণের কোনো লক্ষণ দেখতে পান। আয়াতের এই বক্তব্যের মাঝে একটা

প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী রয়েছে। অর্থাৎ যারা গাফেল তারা যেন সতর্ক হয়ে যায় এবং তাওবার ও ক্ষমার এই বিরাট সুযোগটি হাতছাড়া না করে। কারণ, এমন সুযোগ পুনরায় আসবে না।

এখন সেই জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করে তা ভংগ করে এবং পৃথিবীর বুকে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এদের হুঁশিয়ার করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না, তিনি নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেন না। এটাই হচ্ছে তাঁর নিয়ম ও বিধান, এই নিয়মের কোনো হেরফের হয় না। বলা হচ্ছে,

'তারা জোর শপথ করে বলতো, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আগমন করলে.......।' (আয়াত ৪২-৪৩)

তৎকালীন আরব দেশের বাসিন্দারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদী জাতির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে, এদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতো। ওরা যে নবী রসূলদের হত্যা করতো এবং সত্যের প্রতি অনীহা প্রকাশ করতো সে সম্পর্কেও আরবের লোকেরা জানতো। সে কারণে তারা ইহুদী সম্প্রদায়কে এড়িয়ে চলতো এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে কসম খেয়ে বলতো যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীর আগমন ঘটলে তারা অন্য যে কোনো জাতির তুলনায় অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে। অন্য যে কোনো জাতি বলতে তারা ইহুদী জাতিকে বুঝাতো। সুস্পষ্টভাবে তাদের নাম উচ্চারণ করার ইচ্ছা তাদের ছিলো না বলেই এ ধরনের ইংগিতময় বর্ণনারভঙ্গির আশ্রয় নিতো।

এই ছিলো তৎকালীন আরব জাতির অবস্থা এবং এই ছিলো তাদের অংগীকারের ধরন। তারা এই অংগীকার এমনভাবে করতো যেন শ্রোতারা তাদের সাক্ষী হিসেবে থাকতে পারে এবং অন্ধকার যুগে তাদের ধর্মীয় চেতনা কেমন ছিলো তা বুঝতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের ইচ্ছা পূরণ করে তাদের জন্যে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করলেন, ঠিক তখনই তারা তাদের করা ওয়াদা থেকে পিছপা হয়ে পড়ে। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করলো, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেলো।' (আয়াত ৪২)

এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ। যারা এতো জোরালো কসম খেতে পারে, তাদের দ্বারা এ জাতীয় আচরণ কিভাবে প্রকাশ পায় সেটাই ভাববার বিষয়। শুধু তাই নয়, এরা উল্টো আরও বাহাদুরী দেখায়, ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়। তাদের এই ঘৃণ্য স্বভাব ও আচরণের বিষয়টি উল্লেখ করে কোরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলছে,

'কুচক্র কুচক্রীদেরই ঘিরে ধরে।' (আয়াত ৪৩)

অর্থাৎ যারা ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়, যারা কুচক্রের আশ্রয় নেয়, তারা নিজেরাই সে জালে আটকা পড়ে। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে, যে পরিণতির শিকার হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলো। এ খবর তো তাদের জানাই আছে। বিদ্রোহী জাতিগুলোর জন্যে এটাই হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন বিধান। এই বিধানের কোনো ব্যতিক্রম নেই। তাই বলা হয়েছে, 'অতএব তুমি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর রীতি নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবে না।' (আয়াত ৪৩)

মানুষের জীবনে এবং এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু ঘটছে তা অনর্থক ঘটছে না, যেমন তেমনভাবে ঘটছে না; বরং এর পেছনে অলজ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় এবং স্থিতিশীল একটি প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে। এই বাস্তব সত্যটি আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মাধ্যমে মানব

জাতির সামনে তুলে ধরছেন এবং তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে সে ঘটনাপ্রবাহকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে এবং স্থান ও কালের সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন ও জগতের শাশ্বত নিয়ম নীতি সম্পর্কে গাফেল না থাকে। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা জীবনের দায় দায়িত্ব এবং জগতের নিয়ম নীতি জম্পর্কে মানবীয় দৃষ্টিভংগিকে উর্ধ্বে তুলে ধরছেন এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই বিধান অপরিবর্তনীয়, এই নিয়ম নীতি অলজ্ঘনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোরআন তাদের সামনে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনা তুলে ধরছে।

এরপর আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা হচ্ছে, তা হলো এই,

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে, (আয়াত ৪৪)

মানুষ যদি খোলা চোখ ও সচেতন মন নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের অবস্থা লক্ষ্য করে এবং তাদের অতীত ও বর্তমানের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তা হলে তাদের মনে এর অবশ্যই একটা ছাপ পড়বে, শুভ চেতনার উদ্রেক হবে এবং আল্লাহভীতি জন্ম নেবে।

এ কারণেই পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে, বিগত জাতিগুলোর পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে এবং পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জাতি গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষগুলো দেখার কথা কোরআন পাকে বার বার বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মন মগয থেকে গাফলতির পর্দা সরিয়ে দেয়া। কারণ, মানুষ এসব দেখে না, দেখলেও তা অনুভব করে না। আবার অনুভব করলেও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে এই গাফলতির কারণেই সে আল্লাহর শাশ্বত ও চিরন্তন বিধানের কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ও এগুলোকে শাশ্বত নিয়ম নীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অথচ এটাই হচ্ছে অন্যতম মানবীয় বৈশিষ্ট্য, যার ফলে চিন্তাশীল ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাথে অন্যান্য জীব জন্তুর পার্থক্য সূচিত হয়। পশুর জীবন হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন, বন্ধনহীন ও লাগামহীন। অপরদিকে মানুষের গোটা জীবন এবং জাগতিক নিয়ম নীতি ও বিধি বিধান হচ্ছে একটি অভিন্ন একক।

অতীতের শক্তিধর ও ক্ষমতাধর জাতিগুলোর করুণ পরিণতির দিকে তাকিয়ে মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তাদের এই বিশাল শক্তি ক্ষমতা তাদেরকে এই করুণ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি, তখন সে তার চেতনায় আল্লাহর মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। সে তখন সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই সেই মহাশক্তি যাঁর সামনে টিকে থাকার ক্ষমতা কারও নেই, যাঁকে জয় করার মতো শক্তিও কারও নেই। এই সেই শক্তি যা বিগত জাতিগুলোকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, কাজেই এই শক্তি বর্তমান যুগের জাতিগুলোকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। সে কথারই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।' (আয়াত ৪৪)

কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ অক্ষম করতে পারে না। কারণ, তিনি একাধারে অসীম শক্তি এবং অপার জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই এবং তাঁর ক্ষমতার বাইরেও কোনো কিছু নেই। তাঁর হাত থেকে ছুটে যাওয়ার ক্ষমতাও কারও নেই এবং তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকার ক্ষমতাও কারও নেই। নিসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরার শেষ অংশে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর সহনশীলতা ও দয়া মায়ার প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই সহনশীলতা ও দয়া-মায়ার কারণে পরকালের সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশ ও ন্যায়বিচার আচারে কোনো প্রভাব পড়বে না। বলা হচ্ছে,

'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতেন........। (আয়াত ৪৫)

মানুষ আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করছে, পৃথিবীর বুকে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে, যুলুম অত্যাচার করছে। এ সব নিতান্তই গর্হিত ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এখন যদি আল্লাহ তায়ালা এসব গর্হিত, ঘৃণ্য জঘন্য ও গুরুতর অপরাধগুলোর জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের বাসিন্দাদের পাকড়াও করতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো, তা কেবল মানুষের জন্যেই নয়, বরং অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্যেও।

আয়াতের এই বলিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরাধগুলোর জঘন্যতা ও ঘৃণ্যতার ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সাথে সাথে এর জীবনবিধ্বংসী প্রভাবের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, সে সবের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করা হলে জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না এই পৃথিবীর বুকে, কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু সহনশীল ও ক্ষমাশীল, তাই তিনি মানুষকে সুযোগ দেন। সে কথাই বলা হচ্ছে, 'কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পার্থিব জীবন পর্যন্ত এখানে থাকার সুযোগ দেন।' গোষ্ঠীকে এই সুযোগ দেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের উত্তরাধিকার হস্তান্তর করার সময় পর্যন্ত। আর জাতিকে এই সুযোগ দেন এই বিশ্বের নির্ধারিত আয়ু এবং মহাপ্রলয়ের আগমনের মুহূর্ত পর্যন্ত, এই সুযোগ তাদের কেবল সংশোধনের আশায়ই দেয়া হয়, কিন্তু সেই চরম মুহূর্তটি যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আর এক মুহূর্তের জন্যেও সুযোগ দেয়া হবে না। এখন কাজের আর কোনো সুযোগ নেই। এখন আসবে হিসাব নিকাশের পালা। আল্লাহ তায়ালা এই হিসাব নিকাশ নিতে গিয়ে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করবেন না। কারণ, 'তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।' (আয়াত ৪৫)

এই হচ্ছে আলোচ্য সূরার শেষ বক্তব্য। শুরু হয়েছিলো আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার মধ্য দিয়ে, যিনি পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন। সে বাণীতে জান্নাতের সুসংবাদ অথবা জাহান্নাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী থাকে।

সূরার মাঝের অংশে জগত সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা ও দৃশ্য এসেছে। পরিশেষে জীবনের শেষ পরিণতি এবং মানুষের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীন

আয়াত ৮৩ রুকু ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ইয়াসীন, ২. (এ) জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ, ৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের একজন, ৪. নিসন্দেহে তুমি সরল পথের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো, ৫. পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এ (কোরআনের) অবতরণ; ৬. যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন একটি জাতির (লোকদের) সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল (হয়ে রয়েছে)। ৭. তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তায়ালার শাস্তি) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তাই তারা (কখনো) ঈমান আনবে না। ৮. আমি ওদের গলদেশসমূহে (মোটা মোটা) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যা ওদের চিবুক পর্যন্ত (ঢেকে দিয়েছে), ফলে তারা উর্ধ্বমুখীই হয়ে আছে। ৯. আমি তাদের সামনে পেছনে (জাহেলিয়াতের) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা (কিছুই) দেখতে পায় না। ১০. (এ অবস্থায়) তুমি তাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো, উভয়টাই তাদের জন্যে সমান কথা, তারা (কখনোই) ঈমান আনবে না। ১১. তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে পারো যে (আমার) উপদেশ মেনে চলে এবং (সে অনুযায়ী) দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে ভয় করে, (হ্যাঁ, যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে) তাকে তুমি ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑬ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ⑭ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ⑮ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ⑯ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ⑰ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑱ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ⑲ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, যা কিছু তারা নিজেদের (কর্মকান্ডের) চিহ্ন (হিসেবে এ পৃথিবীতে) ফেলে আসে, সেগুলো সবই আমি (যথাযথভাবে) লিখে রাখি; প্রতিটি জিনিস আমি একটি সুস্পষ্ট কেতাবে গুনে গুনে (সংরক্ষিত করে) রেখেছি।

রুকু ২

১৩. (হে নবী,) এদের কাছে তুমি একটি জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করো– যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন রসূল এসেছিলো, ১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছি তখন তারা এদের উভয়কেই অস্বীকার করেছে, এরপর আমি তৃতীয় একজন (নবী) দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলাম, অতপর তারা (সবাই তাদের কাছে এসে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। ১৫. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তোমরা তো দেখছি আমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, (আসলে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (আমাদের জন্যে) কিছুই পাঠাননি, তোমরা (অযথাই) মিথ্যা কথা বলছো! ১৬. তারা বললো, আমাদের মালিক এ কথা ভালো করেই জানেন, আমরা হচ্ছি অবশ্যই তোমাদের কাছে (তাঁর পাঠানো) কয়েকজন রসূল। ১৭. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। ১৮. তারা বললো, (কিন্তু) আমরা তো তোমাদেরই (আমাদের সব) অমংগলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা (এখনো এসব কাজ থেকে) ফিরে না আসো তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারবো, (উপরন্তু) তোমাদের অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে (আরো) কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে। ১৯. তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য (অকল্যাণ) তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে; এটা কি তোমাদের (কোনো অমংগলের কাজ) যে, তোমাদের (ভালো কাজের কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি সীমালংঘনকারী জাতি। ২০. (এমন সময়) নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি

رَجُلٌ يَسْعٰى ز قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا

وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ

مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا

يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ

وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ

السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

(এদের কাছে) ছুটে এলো এবং (সবাইকে) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা (আল্লাহর) এ রসূলদের অনুসরণ করো, ২১. অনুসরণ করো এমন এক রসূলের, যে তোমাদের কাছে (হেদায়াতের বিনিময়ে) কোনো প্রকার প্রতিদান চায় না, আসলে (যারাই তার অনুসরণ করবে) তারাই হবে হেদায়াতপ্রাপ্ত। ২২. আমার জন্যে এমন কি (অজুহাত) থাকতে পারে যে, যিনি স্বয়ং আমাকে পয়দা করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে (একদিন) ফিরে যেতে হবে, আমি তাঁর এবাদাত করবো না! ২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদ গ্রহণ করতে যাবো? (অথচ) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যদি (আমার) কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে ওদের কোনো সুপারিশই তো আমার কোনো কাজে আসবে না, না তারা কেউ আমাকে (ক্ষতি থেকে) উদ্ধার করতে পারবে! ২৪. (এ সত্ত্বেও) যদি আমি এমন কিছু করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবো। ২৫. আমি তো (এ গোমরাহীর বদলে) তোমাদের মালিকের ওপরই ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো; ২৬. (এ ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার পর) তাকে বলা হলো, যাও, তুমি গিয়ে (এবার) জান্নাতে প্রবেশ করো; (সেখানে গিয়ে জান্নাতের নেয়ামত দেখে) সে বললো, আফসোস, যদি আমার জাতি (এ কথাটা) জানতে পারতো, ২৭. আমার মালিক আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত (মানুষ)-দের দলে শামিল করে নিয়েছেন। ২৮. তার (হত্যাকান্ডের) পর (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) আমি তার জাতির ওপর আসমান থেকে কোনো বাহিনী পাঠাইনি, না (এ ক্ষুদ্র কীটদের শাস্তি দেয়ার জন্যে) আমার (তেমন) কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো! ২৯. (আমি যা করেছি) তা ছিলো একটিমাত্র বিকট গর্জন, (তাতেই) ওরা সবাই নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই মক্কী সূরাটা ঘন ঘন বিরতির সাথে ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতে পরিপূর্ণ। এজন্যে পঁয়তাল্লিশ আয়াত বিশিষ্ট পরবর্তী সূরা ফাতেরের চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও এ সূরার আয়াত সংখ্যা তিরাশি।

ঘন ও ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতের কারণে সূরাটা বৈশিষ্ট্যময় হয়ে আছে। এ কারণে সূরাটা স্নায়ুমন্ডলীর ওপর ক্রমাগত ধাক্কা ও ঝাঁকুনি দিতে থাকে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে ক্রমাগত যে দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে, তা এর আয়াতগুলোর প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে পাঠকের মনে সূরার যে ছাপ পড়ে, তা অত্যন্ত গভীর, নিবিড় ও বিচিত্র।

সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই। আকীদার ভিত্তি গড়া-ই এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। শুরু থেকেই এতে আলোচিত হয়েছে ওহীর প্রকৃতি ও রেসালাতের সত্যতা, ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম, তুমি অবশ্যই রসূলদের অন্যতম। তুমি নির্ভুল পথের ওপরে আছো। এ কেতাব মহাপরাক্রমশালী দয়াময়ের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ....।' কিছুক্ষণ পরেই আসছে গ্রামবাসীর কাছে রসূলদের আগমনের ঘটনা। এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো ওহী ও রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। ঘটনায় এই পরিণামটা দেখানো হয়েছে কোরআনের নির্ধারিত রীতি অনুসারে।

নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ঘটনাবলীর সাহায্য নেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন সব সময় এই রীতি অনুসরণ করে থাকে। সূরার সমাপ্তির কাছাকাছি গিয়ে সে এই বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করে– 'আমি তাকে কবিতা শেখাইনি এবং সেটা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো কেবল স্মরণিকা এবং সুস্পষ্ট কোরআন, যাতে সে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে, যার ভেতরে এখনো উজ্জীবনী শক্তি রয়েছে, আর যাতে কাফেরদের ওপর আল্লাহর বাণী কার্যকর হয়।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এতে শেরেকের প্রতি ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে এমন এক মোমেন ব্যক্তির মুখ দিয়ে, যে রসূলদের ব্যাপারে নিজ জাতির সাথে তর্ক করার জন্যে শহরের এক প্রান্ত থেকে এসেছিলো। সে বলছিলো, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর এবাদাত করবো না কী কারণে? অথচ তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।...... সূরার শেষভাগে এই বিষয় নিয়ে আবারো আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে বা দিয়ে কতকগুলো মাবুদকে গ্রহণ করেছে আর ভেবেছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অথচ তারা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়...........।'

যে বিষয়টার ওপর এ সূরায় সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো আখেরাত ও কেয়ামত। এ বিষয়টা সূরার একাধিক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরার প্রথম ভাগে রয়েছে, আমিই তো মৃতদের জীবন দেই, এবং তারা যা কিছু সৎকাজ করে তা ও তার ফলাফল আমি লিখে রাখি।...........'

গ্রামবাসীর ঘটনায় মোমেন ব্যক্তিটার ওপর যে শোচনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছিলো, আয়াতে তার তাৎক্ষণিক প্রতিফল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার বেহেশতে প্রবেশকে, 'তাকে বলা হলো, বেহেশতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়, আমার জাতি যদি জানতো যে, আমাকে আমার প্রভু ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন'– সূরার মাঝখানে আবার আলোচিত হয়েছে। যেমন তারা বলে, 'এই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে, যদি তুমি সত্যবাদী হও? তারা একটা চিৎকার ছাড়া আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না ....' এরপর কেয়ামতের একটা পূর্ণাংগ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শেষভাগে এ বিষয়টা একটা সংলাপের আকারে বিবৃত হয়েছে, 'সে আমার কাছে একটা নমুনা তুলে ধরেছে আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। সে বলেছে, হাড়গুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর কে ওগুলো জীবিত করবে! বলে দাও, যিনি ওগুলো প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই এখন জীবিত করবেন। তিনি তো প্রত্যেকবারের সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞ।'

আকীদাকে তার ভিত্তিমূল থেকে গড়ে তোলার সাথে সংশ্লিষ্ট এসব যুক্তিতর্ক মক্কী সূরায় বার বার উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে তা প্রত্যেকবার একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। প্রতিবার তার পটভূমিও হয় স্বতন্ত্র, তার বর্ণনাভংগিও হয় ভিন্ন রকমের এবং তার প্রভাবও পড়ে ভিন্ন ধরনের।

আলোচ্য সূরার এই সাড়া জাগানো বক্তব্যগুলো বিশেষভাবে কেয়ামতের দৃশ্যগুলো থেকে সংগৃহীত। তা ছাড়া এতে বর্ণিত কাহিনীটার বিভিন্ন দৃশ্য, তার সংলাপ ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা, যুগে যুগে যারা আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তদের ধ্বংসযজ্ঞ, রকমারি তাৎপর্যবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, যেমন উর্বর মাটিতে উর্বরতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারের দৃশ্য, দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর রাতের অন্ধকার নেমে আসার দৃশ্য, সূর্যের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণের দৃশ্য, চাঁদের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পুরনো খেজুরের ডালের মত আকৃতি গ্রহণের দৃশ্য, অতীতের মানুষদের বংশধরকে বহনকারী জাহাজের দৃশ্য, মানুষের অনুগত পশুদের দৃশ্য সবই আলোচনায় এসেছে। সামান্য এক ফোঁটা বীর্য থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত বাকপটু মানুষের জন্ম লাভের দৃশ্য এবং সবুজ গাছ থেকে আগুন জ্বলার দৃশ্য থেকে এগুলো সংগৃহীত।

এ সব দৃশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু সাড়া জাগানো চিত্র রয়েছে, যা মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করে ও জাগ্রত করে। তন্মধ্যে সেসব কাফেরের চিত্র অন্যতম, যারা ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যাদের ওপর আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ায় আর কোন নিদর্শন ও সতর্কবাণী দ্বারা তাদের কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তাদের ঘাড়ের ওপর শেকল লাগিয়েছি, যা থুতনি পর্যন্ত চলে গেছে। ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আর আমি তাদের সামনে প্রাচীর ও তাদের পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের আচ্ছাদিত করে দিয়েছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।' এর মধ্যে তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সত্ত্বার চিত্রও রয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানের সামনে সমভাবেই উন্মোচিত এবং যাকে কোনো আবরণ দিয়ে ঢাকা যায় না। এর মধ্যে তাদের সৃষ্টি পদ্ধতির বিবরণও রয়েছে, যা একটা মাত্র শব্দের মধ্যেই সীমিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি যখন কিছু চান তখন তার একমাত্র আদেশ হয়ে থাকে এই যে, তিনি বলেন, 'হও', আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।' এ সবই মানব হৃদয় স্পর্শকারী প্রভাবশালী উপকরণ। প্রকৃতির অংগনেও এগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায়।

সূরার মূল ভাষ্যে এর বিষয়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে পেশ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগটা শুরু হয়েছে দুটো অক্ষর সহযোগে অর্থাৎ 'ইয়াসীন' এই নামে শপথ করার মধ্য দিয়ে। সেই সাথে শপথ করা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) অবশ্যই রসূল এবং তিনি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর বহাল আছেন। সঠিক পথের ওপর বহাল থেকে তিনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী উদাসীন লোকদের সেই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন। সেই ভয়াবহ পরিণতি হলো আল্লাহর এই ফয়সালা যে, তারা আর কখনো হেদায়াতের পথ পাবে না এবং চিরদিনই তাদের হেদায়াতের পথে অন্তরায় থেকে যাবে, আর এ কথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ওহীর সতর্কবাণী শুধুমাত্র তাদের জন্যেই লাভজনক হয়ে থাকে যারা ওহীর স্মরণিকা অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে। ফলে তাদের হৃদয় হেদায়াতের যুক্তি প্রমাণগুলো ও ঈমানের আহ্বান গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে। এরপর রসূল (স.)-কে গ্রামবাসীর ঘটনা বর্ণনা করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে আল্লাহর নবীর দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণাম কী হয়ে থাকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর পাশাপাশি মোমেনের হৃদয়ে ঈমানের প্রকৃতি কিরূপ এবং ঈমানের সুফল কী হয়ে থাকে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ জন্যে দ্বিতীয় অংশটা শুরু হচ্ছে সেই বান্দাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যারা অনবরতই রসূলদের প্রত্যাখ্যান করতে অভ্যস্ত, যারা প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না এবং সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিপুলসংখ্যক নিদর্শন দেখেও যাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। সূরার ভূমিকায় বর্ণিত সেসব প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং কেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণও এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

তৃতীয় অংশে সূরার সব কটা আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তা কোনো কবিতা তো নয়ই, এমনকি কবিতার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই। এরপর আল্লাহর একত্বের কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর পৌত্তলিকতাকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে যে, যে সমস্ত মূর্তি তারা স্বয়ং সংরক্ষণ করে, তাদের তারা কিভাবে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়? এ অংশে কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রথম বার তাদের জন্ম হয়েছে বীর্য থেকে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যেন তারা বুঝতে পারে, মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়গোড় পুনরায় জীবিত করা প্রথম বারের জন্মের মতোই। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক ধরনের সবুজ গাছে আগুন থাকে। অথচ বাইর থেকে তা একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের মতো আরো বহু মানুষকে সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তার রয়েছে– তা ইহকালেই হোক বা পরকালেই হোক।

এরপর শেষ কথাটা বলা হয়েছে এই যে, 'তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। অতএব সেই সত্ত্বার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, যাঁর হাতে যাবতীয় জিনিসের সর্বময় ক্ষমতা ও মালিকানা নিহিত এবং তাঁর কাছেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

এবার আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

তাফসীর

আয়াত ১-২৯

'ইয়াসীন, বিজ্ঞ কোরআনের শপথ, তুমি অবশ্যই রসূল ....। (আয়াত ১-১২)

মহান আল্লাহ 'ইয়া ও সীন' এই দুটো অক্ষরের এবং কোরআনের শপথ করেছেন। একই সাথে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা অক্ষর ও কোরআনের কসম খাওয়া থেকে আমার সেই মতটাই সত্য প্রমাণিত হয়, যা আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরার শুরুতে বিদ্যমান বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা ও এগুলোর সাথে কোরআনের উল্লেখের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসংগে বলেছি। কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, তার একটা নিদর্শন এই যে, এই কোরআন এই আরবী বর্ণমালা দিয়েই লিখিত। এই বর্ণমালা ব্যবহার করা আরবদের কাছে অতি সহজ কাজ। অথচ কোরআনের ভাষাগত ও ভাবগত গাঁথুনি এতো উচ্চাংগের যে, তা এই বর্ণমালা দিয়ে তৈরী করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোরআনের কসম খেতে গিয়ে কোরআন নিজেকে 'হাকীম' অর্থাৎ বিজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেছে। হেকমত বা বিজ্ঞতা কোন বুদ্ধিমান প্রাণীরই গুণ বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। তাই কোরআনকে এই 'বিজ্ঞ' বিশ্লেষণে বিশেষিত করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাকে যেন প্রকারান্তরে একটা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট প্রাণীর মর্যাদা দেয়া হলো। বস্তুত এটা তাকে 'বিজ্ঞ' আখ্যায়িত করার স্বতস্ফূর্ত দাবী। এটা যদিও রূপক ও কল্পিত, কিন্তু এ দ্বারা একটা বাস্তবতাকে চিত্রিত করা হয়েছে ও সত্যের কাছাকাছি আনা হয়েছে। বস্তুত কোরআনের আত্মা বা রূহ আছে, কোরআন একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত গ্রন্থ। একটা প্রাণীকে যদি কোনো মানুষ অন্তর দিয়ে ভালোবাসে এবং হৃদয় উজাড় করে তার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করে, তবে সেও যেমন তার প্রতি মমত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ করে, কোরআনও ঠিক তেমনি। কোনো মানুষ যদি কোরআনের জন্যে নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত ও একনিষ্ঠ করে দেয়, তাহলে সে তার এমন বহু গোপন রহস্যের সন্ধান পাবে, যা অন্যেরা পায় না। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যেমন তার কোনো বন্ধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছু সময় অবস্থান করলে সে তার বহু গুণ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ও তার ভক্ত হয়ে যেতে পারে, তেমনি কোনো মানুষ কোরআনের ঘনিষ্ঠ হলে সেও

কোরআনের বহু মনোমুগ্ধকর গুণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভ এবং তার ভক্ত প্রেমিক হয়ে যেতে পারে। রসূল (স.) অন্যদের কোরআন পাঠ শুনতে খুবই ভালোবাসতেন। এ জন্যে তিনি কোনো বাড়ীর ভেতর থেকে কোরআন পড়ার শব্দ শুনতে পেলেই তার দরজার ওপর দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনতেন, যেমন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকার কথা শুনতে দাঁড়ায় ও মনোযোগ দিয়ে শোনে।

কোরআন প্রত্যেককে তার সাধ্য অনুপাতে সম্বোধন করে, তার হৃদয়ের তীব্র সংবেদনশীল তন্ত্রীতে আঘাত করে এবং পরিমিত ও পরিকল্পিতভাবে তাকে আহ্বান করে। যে কৌশলে ডাকলে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে ও তাকে শোধরানো যাবে, সেই কৌশল অনুসারেই ডাকে।

কোরআন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে মানুষকে লালন পালন করে এবং একটা নিখুঁত নির্ভুল বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষা দেয়। সে পদ্ধতিটা এমন নিপুণ ও অব্যর্থ যে, তা মানুষের সকল সুপ্ত শক্তির বন্ধন খুলে দেয় ও সক্রিয় করে দেয় এবং সেগুলোকে নির্ভুল ও সঠিক গন্তব্যের দিকে চালিত করে। কোরআন মানব জীবনের জন্যে এমন একটা বিধানও দেয়, যা সেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আওতায় যাবতীয় মানবীয় তৎপরতার অনুমতি দেয়।

রেসালাতের মহান ঘোষণা

মহান আল্লাহ 'ইয়া ও সীন' এবং বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম খেয়ে রসূল (স.)-এর রেসালাতের সত্যতা ঘোষণা করছেন,

'নিশ্চয় তুমি একজন রসূল।'

মহান আল্লাহর কসম খাওয়ার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোরআনের ও কোরআনের অক্ষরের কসম খাওয়া দ্বারা কোরআনের এবং তার বর্ণমালার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা মহান আল্লাহ খুব মর্যাদাশালী জিনিস ছাড়া আর কোনো কিছুর কসম খান না। তিনি এমন সব জিনিসেরই কসম খান যা কসম খাওয়ার যোগ্য।

'নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।'

এই বাচনভংগি থেকে মনে হয়, রসূলদের পাঠানো একটা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী। তবে এ বিষয়টা প্রমাণ করা এখানে আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো মোহাম্মদ (স.)-কে এসব রসূলের অন্যতম বলে প্রমাণ করা। এখনে এই কসম দ্বারা স্বয়ং রসূলকে সম্বোধন করা হয়েছে অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী মোশরেকদের নয়, যাতে এই শপথ, রসূল ও রেসালাত সব রকমের বিতর্কের উর্ধ্বে থাকে। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রসূল (স.)-কে অবহিতকরণের শামিল।

'নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি সঠিক পথের ওপর আছ।'

রসূলের সত্যতা প্রমাণ করার পর রেসালাতের স্বভাব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। রেসালাতের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হলো, তা নির্ভুল, নিখুঁত ও সহজ সরল। তা একান্ত সোজা পথ। তাতে কোনো বক্রতা নেই। এতে সত্য স্বচ্ছ, স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য। কোনো অস্পষ্টতা ও অসচ্ছতা নেই। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী বা স্বার্থের টান তাকে বিপথগামী করতে পারে না। যে চায় সে সহজেই সঠিকভাবে তা পেতে পারে।

রেসালাত নির্ভুল ও নিখুঁত হওয়ার কারণে তা সহজ সরলও বটে, এতে কোনো জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা নেই। সত্যকে তা অত্যন্ত খোলাসা করে ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করে। এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকে না এবং কোনো ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানী ও মূর্খ, নগরবাসী ও গ্রামবাসী, প্রাসাদবাসী ও কুঁড়েঘরবাসী নির্বিশেষে সকলেই এর আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজনও এ থেকে পূরণ করতে পারে এবং নিজের জীবন, জীবন যাপন পদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভুল, সঠিক ও শান্তিময় করতে পারে।

রেসালাত বিশ্ব নিখিলে প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের সাথেও সংগতিপূর্ণ। মানুষের চারপাশের যাবতীয় বস্তু এবং প্রাণীর সাথেও তা সংগতিপূর্ণ। ফলে প্রকৃতির বস্তুনিচয় পরস্পরে যেমন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, তেমনি মানুষকেও তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য করে না। সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে যতো বস্তু ও প্রাণী রয়েছে, সে সবের ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের ওপর কর্তৃত্বশীল সমস্ত নিয়মবিধির সাথেও তা সংগতিপূর্ণ, একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক।

একমাত্র রেসালাতই মানুষদের আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক, নির্ভুল ও অব্যর্থ পথ দেখায়। রেসালাতের অনুসারী কখনো তার স্রষ্টাকে হারানোর ও বিপথগামী হবার আশংকা বোধ করে না। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধান পায়।

কোরআন মানুষকে সহজ সরল পথের সন্ধান দেয়

কোরআন এই সঠিক, নির্ভুল ও সহজ সরল পথের সন্ধানদাতা ও গাইড। কোরআনকে সাথে নিয়ে মানুষ যেখানেই যাবে, দেখবে কোরআন তাকে সত্যের গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সত্যের পথ দেখাচ্ছে, সত্যের বিধি বিধান ও মূল্যবোধ যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছে।

'পরম দয়ালু মহা প্রতাপশালীর পক্ষ থেকে এর অবতরণ।'

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, যাতে তারা তাঁর নাযিলকৃত কেতাবেরও সঠিক পরিচয় পায়। তিনি মহাশক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী, যা ইচ্ছা করেন তা অবাধে করেন, তিনি বান্দাদের প্রতি আচরণে দয়ালু। আর এই কেতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো সতর্ক করা ও প্রচার করা।

'যাতে তুমি সতর্ক করতে পার সেই জাতিকে, যাদের পূর্ব-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা উদাসীন রয়ে গেছে।'

গাফলত বা উদাসীনতা মনমগয বিনষ্ট করার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। উদাসীন মন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। নিষ্ক্রিয় থাকে শিক্ষা গ্রহণ, প্রভাব বিস্তার এবং সাড়াদানেও। হেদায়াতের অকাট্য প্রমাণাদি মনের গোচরীভূত হওয়া সত্তেও মন তা অনুভব ও উপলব্ধি করে না, স্পন্দিত ও সচকিত হয় না। এ জন্যে আরব জাতি যে উদাসীনতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিলো, তা দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিলো তাদের সতর্কীকরণ। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর এই আরবদের কাছে ইসমাঈলের পর বহু প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়া সত্তেও আর কোনো রসূল তথা আর কোনো সতর্ককারী আসেনি। উদাসীন লোকদের সতর্ক করলে অনেক সময় তাদের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা দূর হয়ে যায়।

এরপর এই উদাসীন লোকদের পরিণতি এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ফয়সালা করেছেন তা জানিয়ে দিচ্ছেন,

'তাদের অধিকাংশের ওপর মহান আল্লাহর ফয়সালা কার্যকর হয়ে গেছে, ফলে তারা আর ঈমান আনবে না।'

অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে গেছে এবং তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তাদের আবেগ অনুভূতির প্রকৃত ধরন কি তা জানেন। এ জন্যে তাদের অধিকাংশের সর্বশেষ অবস্থা হবে এই যে, তারা ঈমান আনবে না। কেননা তাদের মনমগযে হেদায়াতের আলো পৌছতে পারেনি এবং তাদের হৃদয় হেদায়াতের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখতে পায়নি।

পরবর্তী আয়াতে এই মানসিক অবস্থার একটা অনুভবযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যেন কাফেররা এমনভাবে শেকলে বাঁধা যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না, ঈমান আনা ও হেদায়াত পাওয়ার পথ প্রাচীর দিয়ে আটকানো রয়েছে এবং তাদের চোখ পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে, ফলে তারা দেখতে পাবে না।

আমি তাদের ঘাড়ে শেকল পরিয়েছি, সে শেকল থুতনি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ....।' (আয়াত ৮ -৯)

অর্থাৎ তাদের হাতগুলো শেকল দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত বাঁধা এবং থুতনির নীচে রক্ষিত। এ জন্যে তাদের মাথা জোরপূর্বক উঁচু করে রাখা হয়েছে। ফলে তারা সামনে কিছুই দেখতে পায় না। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাদের দেখার ও বিবেচনার স্বাধীনতা নেই। তাদের সামনে ও পেছনে এমন প্রাচীর রয়েছে যা সত্য ও হেদায়াতকে তাদের চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছে। ফলে তাঁদের শেকলের বাঁধন শিথিল করে দিলেও প্রাচীরের কারণে তাদের দৃষ্টি সামনে পৌঁছে না। তা ছাড়া পর্দা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখায় দেখার পথও রুদ্ধ।

যদিও এই কল্পিত দৃশ্যটা অত্যন্ত ভয়ংকর, কিন্তু মানুষ এই শ্রেণীর কিছু লোকের সাথে মিলিত হয়ে থাকে। তার মনে হয় যেন সুস্পষ্ট সত্যকে দেখতে পায় না এবং সত্যের ও তার মাঝে এ ধরনের কোনো প্রতিবন্ধক আছে বলেও সে বুঝতে পারে না। হাতের ওপর এই শেকল যদি পরানো নাও হয় এবং মাথা যদি জোর করে উঁচু করে রাখা নাও হয়, তবুও তাদের মন ও অন্তর চক্ষুকেও জোরপূর্বক হেদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং হেদায়াতের সাক্ষ্য প্রমাণ প্রাচীর দিয়ে আড়াল করে রেখে দেখতে দেয়া হয় না। অনুরূপভাবে যারা কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা কোরআন সত্যের সাক্ষ্য প্রমাণ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছে; বরং প্রকৃতপক্ষে কোরআন নিজেই এতো শক্তিশালী প্রমাণ যে, কোন মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে না।

'তাদের তুমি সতর্ক করো আর নাই করো একই কথা। তারা ঈমান আনবে না।'

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তাদের অন্তরের অবস্থা জানেন এবং তার ভেতরে যে ঈমান ঢুকতে পারে না, সেটা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, তাই তিনি নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন যে, তারা কখনোই ঈমান আনবে না। কেননা যে হৃদয় ঈমান আনার জন্যে প্রস্তুত নয় এবং প্রাচীর পর্দা ও শেকল দিয়ে তাকে ঈমান থেকে দূরে রাখা হয়েছে, নিছক সতর্কীকরণে সে হৃদয়ের কোনো লাভ হবে না। সতর্কীকরণ দাওয়াত গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন জীবন্ত হৃদয়কে সজাগ সচেতন করতে পারে, নতুন করে হৃদয় সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি তো কেবল সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারবে, যে ওহীর বিধানের অনুসরণ করে ....। (আয়াত ১১)

ওহীর বিধান বা যেকের দ্বারা এখানে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোরআনের অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই সতর্কীকরণ দ্বারা উপকৃত হয়। যেন একমাত্র তাকেই সতর্ক করা হয়েছে আর কাউকে নয়। যেন রসূল (স.) সতর্কীকরণকে শুধু তার জন্যেই বরাদ্দ করেছেন। অথচ মূলত তা ছিলো সবার জন্যে। তবে তাদের হেদায়াতের পথে অনেক বাধা এসে দাঁড়ায়। তাই শুধুমাত্র কোরআনের অনুসারী ও না দেখে আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে হেদায়াত সীমিত হয়ে যায়। সতর্কীকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর এই ব্যক্তি সুসংবাদ লাভের যোগ্য হয়ে যায়। 'অতএব তাকে সুসংবাদ দাও ক্ষমার ও পরম সম্মানজনক প্রতিদানের।' 'অর্থাৎ যেসব গুনাহ তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তার ওপর সে লেগে থাকেনি; বরং দ্রুত তাওবা করতে সচেষ্ট হয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান দেয়া হবে না দেখে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং কোরআনকে অনুসরণ করার জন্যে। হৃদয়ে একই সাথে এ দুটো জিনিস অবস্থান করে। যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, সে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসরণ না করে পারে না। সেই সাথে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণে অবিচল থাকাও অবশ্যম্ভাবী।'

প্রসংগক্রমে আখেরাত ও হিসাব নিকাশের উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে, 'নিশ্চয়ই আমি মৃতদেরকে জীবিত করি ....।' (আয়াত ১২)

মৃতদের পুনরুজ্জীবন দীর্ঘকাল যাবত বিতর্কের বিষয় ছিলো। এ সূরায় এ ব্যাপারে একাধিক উদাহরণ পেশ করা হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করছেন যে, তারা যে কাজই করুক, সব গুনে গুনে লিখে রাখা হচ্ছে। এর কোনোটাই হিসাব থেকে বাদ পড়বে না বা ভুলে যাওয়া হবে না। মহান আল্লাহ স্বয়ং জীবন ও মৃত্যু দেন। তিনিই সমস্ত কৃতকর্ম ও তার ফলাফল লিখে রাখেন এবং গুনে গুনে রাখেন। কাজেই মহান আল্লাহর পক্ষে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবেই তা করা হবে।

আর 'ইমামুম মুবীন', 'লওহে মাহফুয' বা অনুরূপ অন্যান্য শব্দের সহজতম ব্যাখ্যা হলো, মহান আল্লাহর আদি ও নির্ভুল জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে ধারণ করে রাখে।

উদাহরণের সাহায্যে আখেরাতের আলোচনা উপস্থাপন

ওহী ও রেসালাত এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশের বিষয়টা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপনের পর এক্ষণে কাহিনী আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। এ কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এতে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের কী পরিণতি হয়, তা যেন চাক্ষুষ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

'তাদের কাছে উদাহরণ হিসাবে সেই গ্রামবাসীকে তুলে ধরো, যখন তাদের কাছে রসূলরা এলো।' ...... (আয়াত ১৩-১৯)

কোরআন এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর পরিচয় উল্লেখ করেনি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে।

এ পরিচয় স্পষ্ট না করা দ্বারা বুঝা যায়, এই গ্রামের নাম ও অবস্থান উল্লেখ করলে এই কাহিনীর শিক্ষা ও তাৎপর্যে কোনো হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো না। এ জন্যে নির্দিষ্ট করে নামোল্লেখ করেনি বরং কাহিনীর শিক্ষাটাই তুলে ধরেছে। এই গ্রামে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে দু'জন রসূলকে পাঠিয়েছিলেন, যেমন হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। গ্রামবাসী তাদের দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় আরেকজন রসূল পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তারপর তিন জনই ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন করে দাওয়াত দিয়ে বললেন, আমরা তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল।

এ পর্যায়ে গ্রামবাসী আপত্তি জানালো। তাদের এ আপত্তি নতুন কিছু নয়, নবুওত ও রেসালাতের ইতিহাসে এ আপত্তি বার বার তোলা হয়েছে। তারা বললো, 'তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। ..... দয়াময় আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুই নাযিল করেননি। ...... তোমরা স্রেফ মিথ্যাবাদী।' রসূলের মানবত্ব নিয়ে বার বার উত্থাপিত এই আপত্তিটা চিন্তা, উপলব্ধির ক্ষেত্রে সরলতা ও রসূলের দায়িত্ব সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতারই বহিপ্রকাশ। লোকেরা সব সময় এরূপ আশাই পোষণ করতো যে, রসূলের জীবন ও ব্যক্তিত্ব হবে রহস্যময় এবং তা নিয়ে সমাজে নানারকমের কিসসা কাহিনী প্রচলিত থাকবে। আকাশের দূত পৃথিবীতে আসবে, আর তাকে ঘিরে মজার মজার কিসসা কাহিনী চালু হবে না- এটা কেমন কথা?

রসূল নিরেট সহজ সরল ও খোলামেলা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন এবং তাকে নিয়ে কোনোই রহস্য থাকবে না- এও কি সম্ভব? মানব সমাজের সর্বত্র, হাটে-মাঠে-বাজারে, যেসব মামুলী ও নগণ্য ধরনের মানুষ ঘুরে বেড়ায়, সেই ধরনের একজন নিরীহ সাধারণ মানুষ আবার রসূল হয় কি করে? এ হচ্ছে নিরেট নির্বোধসুলভ চিন্তাধারা। রহস্যময়তা ও অসচ্ছতা নবী রসূলদের জীবনের কোনো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। বিশেষত এই শিশুসুলভ বালখিল্যতার দাবী অনুসারে তো তা হতেই পারে না। তবে একটা বিরাট রহস্য এখানে অবশ্যই রয়েছে। একটা নিরেট বাস্তব ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই রহস্যটা। সেই বাস্তব ঘটনা হলো, এই বিশাল মানব জাতির মধ্য থেকে একজন নির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে এরূপ অসাধারণ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা যে, সে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে আকাশ থেকে অবতীর্ণ ওহী গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ করে।

এ কাজটা সমাধা করার জন্যে তারা যে ফেরেশতা পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছিল, তার চেয়েও এটা অনেক বেশী বিস্ময়কর ঘটনা।

রেসালাত হচ্ছে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহর রচিত ও মনোনীত বিধান। রসূলের জীবন হচ্ছে আল্লাহর বিধানের অনুসারী জীবন কেমন হওয়া উচিত তার বাস্তব নমুনা। রসূল (স.) তাঁর জাতিকে আহ্বান জানান মানুষ হিসেবে এই নমুনা অনুসরণ করার জন্যে। সেটা করতে হলে তাদের রসূলকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে, যাতে তিনি এমন জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিতে পারেন, যা তারাও অনুসরণ করতে সক্ষম।

এ জন্যে রসূল (স.)-এর জীবন তার উম্মতের সামনে উন্মুক্ত ও দর্শনযোগ্য ছিলো। মহান আল্লাহর চিরঞ্জীব গ্রন্থ কোরআনও তাঁর জীবনের, এমনকি ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত চিরদিনের জন্যে সংরক্ষণ করেছে। কোনো কোনো সময়ে রসূলের মনের কোণে উঁকি দেয়া চিন্তা ভাবনা পর্যন্ত ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষেরা জানতে পারে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে আল্লাহর নবী হয়ে আগত এই মানুষটির অন্তকরণ কেমন, তা দেখতে পায়।

কিন্তু এই দিবালোকের মতো স্পষ্ট সত্যটার প্রতিই মানুষ চিরকাল আপত্তি জানিয়ে আসছে। সেই গ্রামের অধিবাসীরাও তাদের কাছে আগত তিন জন রসূলকে বলেছিলো,

'তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া তো আর কিছু নও।' অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছে যে, তোমরা রসূল নও, আর 'দয়াময় আল্লাহ তোমাদের কাছে কিছুই নাযিল করেননি।' অর্থাৎ তোমরা যে দাবী করো, মহান আল্লাহ আমাদের ওপর ওহী নাযিল করেছেন এবং আমাদের সবাইকে তা শুনতে আদেশ দিয়েছেন, সে দাবী সত্য নয়।

'তোমরা কেবল মিথ্যা দাবী করছো।'

অর্থাৎ তোমাদের রসূল হবার দাবী মিথ্যা।

রসূলরা যেহেতু নিজেদের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিলেন এবং তাদের কর্তব্যের সীমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তারা জবাব দিলেন,

'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা তোমাদের কাছে রসূল হয়ে এসেছি এবং কোনো রাখঢাক না করে তার দ্বীন প্রচার করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা জানেন, এটাই যথেষ্ট। আর রসূলদের দায়িত্ব দ্বীনের প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কাজ তারা সমাধা করেছেন। এরপর মানুষ কি করবে এবং কোন ফলাফল বরণ করবে, সে ব্যাপারে সে স্বাধীন। রসূল ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক শুধু এতোটুকু যে, আল্লাহর পাঠানো প্রতিটি বাণী তিনি মানুষের কাছে হুবহু পৌঁছে দেবেন। এ কাজ যখন সম্পন্ন হবে তখন আর সব কিছু আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

কিন্তু নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী পথভ্রষ্ট লোকেরা এই সহজ সরল বিষয়টাকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। তারা সত্যের আহ্বায়ক ও প্রচারকদের অস্তিত্বই বরদাশত করতে রাযি হয় না। ফলে এক ধরনের অন্যায় আভিজাত্যবোধ ও পাপাচারমূলক দম্ভ তাদের পেয়ে বসে এবং যুক্তির মোকাবেলায় নিষ্ঠুর হিংস্রতার আশ্রয় নেয়। কারণ বাতিল শক্তি অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও হৃদয়হীন হয়ে থাকে।

'তারা বললো, আমরা তোমাদের কারণে অমংগলের আশংকা করছি। তোমরা এই প্রচারকার্য যদি না থামাও, তাহলে আমরা তোমাদের পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।'

অর্থাৎ তোমাদের দিক থেকে আমরা অশুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি এবং তোমাদের প্রচারকার্য চলতে থাকলে আমরা ঘোরতর অমংগল ঘটে যাওয়ার আশংকাবোধ করছি। কাজেই তোমরা যদি এ কাজ বন্ধ না করো, তাহলে আমরা চুপ করে বসে থাকবো না এবং তোমাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে দেবো না। তোমাদের পাথর মেরে শেষ করে দেবো এবং কঠিন শাস্তি দেবো।

এভাবে বাতিল শক্তি তার আগ্রাসী চরিত্র নগ্নভাবে তুলে ধরলো, সৎপথ প্রদর্শকদের শাসানি ও হুমকি দিলো, সত্যের শান্তশিষ্ট ও মার্জিত দাওয়াতের বিরুদ্ধে গোয়ার্তুমি করলো, কথাবার্তায় ও মানসিকতায় চরম ঔদ্ধত্য এবং ধৃষ্টতার পরিচয় দিলো, কিন্তু রসূলদের ঘাড়ে যে দায়িত্ব অর্পিত ছিলো, তা তাদের উগ্র বাতিল শক্তির এই রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সত্যের পথে অবিচল থাকতে ও এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলো,

'তারা বললো, তোমাদের অমংগল তো তোমাদের সাথেই রয়েছে।'

অর্থাৎ কারো মুখ দেখলে বা কেউ দাওয়াত দিলেই অকল্যাণ হবে, এটা একটা ভিত্তিহীন জাহেলী ধারণা। রসূলরা জনগণকে বুঝালেন যে, এটা একটা কু-সংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা। কোনো জাতির ভাগ্যে ভালো বা মন্দ যা-ই ঘটুক, তা তাদের বাইর থেকে আসে না; বরং তা তাদের নিজেদের সাথেই থাকে, তাদের কার্যকলাপ ও মনমানসিকতা, তাদের উপার্জন ও পেশাগত সততা বা অসততার ওপর নির্ভরশীল। নিজেদের ভাগ্য ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা তাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ভালোই চান বা মন্দই চান, সেটা তার নিজের মন-মানসিকতা, চরিত্র ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত এবং বাস্তবায়িত হয়। তার ভাগ্যের ভালো মন্দ সে নিজেই বহন করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য ও প্রামাণ্য বাস্তবতা। কারো মুখ দেখলে অমংগল, কোনো জায়গায় অমংগল, কিংবা কোনো কথাবার্তায় অমংগল, এ জাতীয় কথাবার্তা নিতান্তই অসার কু-সংস্কার মাত্র। এর কোনো বোধগম্য ভিত্তিই নেই। তারা বললো,

তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেও?

অর্থাৎ তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম বলে কি তোমরা আমাদের পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলবে এবং শাস্তি দেবে? এই নাকি স্মরণ করানোর প্রতিদান? অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা ও মূল্যায়নে তোমরা সীমা অতিক্রমকারী। সে জন্যেই তোমাদের যখন সদুপদেশ দেয়া হয় তখন তোমরা হুমকি ও শাসানি দাও এবং দাওয়াত দিলে শাস্তি দেয়া ও পাথর মেরে হত্যা করার ভয় দেখাও।

রসূলদের দাওয়াত গ্রহণে অক্ষম ও ছিপি আঁটা মনের অধিকারী লোকদের এই ছিলো প্রতিক্রিয়া। সূরার প্রথম ভাগে এ ধরনের অন্তরের কথাই বলা হয়েছে এবং এই নমুনার মানুষেরই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর নমুনার লোকেরা, যারা কেতাবের অনুসারী এবং আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে ভয় করে, তাদের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া হতো ঠিক এর বিপরীত,।

'শহরের প্রান্ত থেকে এক লোক ছুটে এলো। সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা রসূলদের, দাওয়াত মেনে নাও। .... আমার কথা শোনো।'

এটা ছিলো সত্যের দাওয়াতের প্রতি নির্মল ও বিকারমুক্ত একটি বিবেকের সাড়া দানের ঘটনা। এই সাড়াদানে পরম নিষ্ঠা, সরলতা, প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা, উপলব্ধির বিশুদ্ধতা ও সুস্পষ্ট সত্যকে দুরন্ত তেজস্বিতার সাথে গ্রহণের মানসিকতা সক্রিয় ছিলো।

এই ব্যক্তি রসূলের দাওয়াতের কথা শুনে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে সংগে সংগেই তা গ্রহণ করে। সে তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিলো, তাতে সে সেসব অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ এবং যুক্তির উল্লেখও করেছিলো, যা বিবেচনা করার পরই সে ঈমান এনেছিলো। তার হৃদয় যখন ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করলো, তখন এ সত্য তার অন্তরের অন্তস্তলে ঢুকে তাকে অস্থির করে তুললো। তাই সে নীরব থাকতে পারলো না। নিজের চারপাশে গোমরাহী পাপাচার ও অনাচারের ধুম পড়তে দেখে সে নিজ গৃহে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা পছন্দ করেনি। তার হৃদয়ে স্থায়ীভাবে অবস্থানরত ও চেতনায় প্রবলভাবে সক্রিয় সত্যকে নিয়েই সে চেষ্টা চালালো। তার জাতি যখন দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও রসূলদেরকে হুমকি ধমকি দিয়ে বিদায় দিতে সচেষ্ট, ঠিক তখনই সে এই চেষ্টাটা চালালো। শহরের এক প্রান্ত থেকে সে এলো। তার লক্ষ্য ছিলো স্বীয় জাতিকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেয়ার কর্তব্য পালন, তাদের বাড়াবাড়ি করতে বাধা দেয়া এবং রসূলদের ওপর নির্যাতন চালাতে না দেয়া।

এটা সুস্পষ্ট যে, লোকটা কোনো প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলো না। তার নিজ গোত্র বা আত্মীয়স্বজন সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্ষেত্রে তার প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে আসবে, এমন নিশ্চয়তাও ছিলো না। বিবেকের অভ্যন্তরে নিহিত সজীব আকীদা বিশ্বাস তাকে অনুপ্রাণিত করছিলো ও শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে এসেছিলো।

'সে বললো, হে আমার জাতি, রসূলদের কথামতো চলো, যারা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চায় না এবং নিজেরাও সৎপথে পরিচালিত, তাদের পদাংক অনুসরণ করো।'

যে ব্যক্তি এ ধরনের আহ্বান জানাতে পারে, অথচ কোন পারিশ্রমিক চায় না, কোনো ধন সম্পদ চায় না, সে সত্যবাদী না হয়েই পারে না। নচেত আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট না হয়ে থাকলে কিসের খাতিরে সে এই কষ্ট করবে? কোন্ কারণে সে দাওয়াতের কাজটাকে এতো গুরুত্ব দেবে? মানুষ যে আদর্শ পছন্দ করে না, তাই নিয়ে তাদের সাথে সংঘাতের মুখে দাঁড়ানোর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? জনগণের পক্ষ থেকে অত্যাচার, নিপীড়ণ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শিকার হবার ঝুঁকি তারা কেন নেবে, যখন তা থেকে কোনো উপার্জন বা প্রতিদানের গরয নেই?

'যারা সৎপথে পরিচালিত।'

তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি দেখেই বুঝা যায় তারা সৎপথে পরিচালিত, কেননা তারা এক আল্লাহকে মেনে নেয়ার দাওয়াত দেয়, একটা সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানায়। এমন একটা আকীদা ও আদর্শের দিকে আহ্বান জানায় যাতে কোন অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও কু-সংস্কার নেই। তাই সংগতভাবেই বলা যায় তারা নিখুঁত, নির্ভুল ও বিশুদ্ধ পথের দিকে আহ্বান জানায়।

এরপর পুনরায় সে নিজের ঈমান আনার কারণ ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং তাদের মধ্যকার সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের কাছে আবেদন জানাতে থাকে,

'আমার কী হয়েছে যে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার এবাদাত করবো না? অথচ তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে .... সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবো।'

এ হচ্ছে মহান স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতন বিবেকের প্রশ্ন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তার এবাদাত করবো না, এটা কিভাবে সম্ভব? এই স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক পথ থেকে কে আমাকে দূরে সরাবে? মানবীয় বিবেক ও মন মগয প্রথম সুযোগেই তার স্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট হয়। এ থেকে সে কখনো বিপথে যায় না, যদি না তাকে তার নিজ স্বভাব প্রকৃতির বাইরের কোনো উপকরণ বিপথগামী করে।

মহান স্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট হওয়াটাই সৃষ্টির প্রথম ও সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য কাজ। এ জন্যে তার নিজ স্বভাব প্রকৃতির বাইরের কোনো আকর্ষণীয় উপকরণের কোনোই প্রয়োজন নেই। একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে এটা অনুভব করে। তাই সে অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এ কথাটা উচ্চারণ করে। এতে কোনো বক্রতা বা জোড়াতালি দেয় না।

মোমেন এটাও তা সত্যনিষ্ঠ বিবেক দ্বারা অনুভব করে যে, সকল সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবে। যেমন প্রত্যেক জিনিস তার উৎসের দিকে ফিরে যায়। তাই বলা হয়েছে, তার দিকেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে। অর্থাৎ সে প্রশ্ন রাখছে, আমি কেন আমার স্রষ্টার এবাদাত করবো না, যখন আমাকে এবং জনগণকেও তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। কেননা তিনি সকলেরই স্রষ্টা এবং তাঁর এবাদাত করা তাদেরও কর্তব্য।

এরপর এর বিপরীত পথটাও পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং তাকে সুস্পষ্ট গোমরাহী বলা হচ্ছে,

'আমি কি তাকে ছাড়া অন্যদের এবাদাত করবো ....।'

যে স্বাভাবিক যুক্তি সৃষ্টিকে স্রষ্টার এবাদাতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই যুক্তি বর্জনকারীর চেয়ে বিপথগামী আর কেউ হতে পারে না। বিনা প্রয়োজনে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো এবাদাতে নিরত হওয়ার মতো গোমরাহী আর কিছু হতে পারে না।

স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি এমন সব দুর্বল মাবুদের উপাসনা করে, যারা তাকে তার স্রষ্টা কোনো বিপদে ফেললে তা থেকে উদ্ধার করতে পারে না। সেই ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কেউ হতে পারে না।

'আমি তাহলে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবো।'

এবার এই ব্যক্তি তার স্বভাবজাত সত্যবাদী মুখ দিয়ে তার স্বজাতির মুখের ওপর নিজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে এবং তার স্বজাতির প্রত্যাখ্যান, হুমকি শাসানী ও চোখ রাঙানীর কোনো তোয়াক্কাই সে করছে না। কেননা বিবেকের কণ্ঠস্বর সকল হুমকি ও শাসানীর উর্ধ্বে,

'আমি তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি। অতএব আমার কথা শোনো।'

এভাবে সে তার সর্বশেষ ঈমানী ঘোষণা উচ্চারণ করলো এবং সবাইকে সাক্ষী রেখেই তা করলো। সেই সাথে সে তাদেরও তার মতো ঘোষণা দিতে উদ্বুদ্ধ করলো। এ ঘোষণার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, জনগণ কি বলবে, তার কোনো পরোয়া সে করে না।

কাহিনী পরম্পরা থেকে মনে হয়, তারা তাকে আর বাঁচতে দেয়নি, তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলেছে। এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা হলেও পার্থিব জীবন ও শহরবাসীর ওপর এখানে যবনিকা পড়ে গেছে। তাকে পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আমরা সোচ্চার কণ্ঠে সত্যের ঘোষণাকারী এই শহীদকে দেখতে পাই। আমরা তাকে দেখতে পাই, বিবেকের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত করে এবং নির্যাতনকারী ও হুমকিদাতাদের মুখের ওপর শেষ ঘোষণা উচ্চারণ করে পরপারে পাড়ি জমাতে। এরপরের আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারি আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে এমন সম্মান ও মর্যাদা সঞ্চিত করে রেখেছেন, যা একজন নিষ্ঠাবান মোমেন বীর শহীদের উপযুক্ত।

'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায় আমার জাতি যদি জানতো আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন ও সম্মানিত করেছেন।'

বস্তুত দুনিয়ার জীবন আখেরাতের জীবনের সাথেই যুক্ত। মৃত্যুকে আমরা শুধু ধ্বংসের জগত থেকে চিরস্থায়িত্বের জগতে স্থানান্তর হিসেবেই দেখতে পাই। মৃত্যু যেন মোমেনের একটা পদক্ষেপ, যা দ্বারা সে দুনিয়ার সংকীর্ণ পরিসর থেকে জান্নাতের বিশাল পরিসরে পৌঁছে যায়। বাতিল শক্তির আস্ফালন থেকে সে চলে যায় সত্যের অনন্ত প্রশান্তির কোলে, আল্লাহ বিরোধী শক্তির হুমকি থেকে জান্নাতের অনাবিল শান্তির ভুবনে এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে প্রত্যয়ের আলোতে।

আমরা মোমেন ব্যক্তিটাকে এখানে জান্নাতের ক্ষমা ও সম্মানের দুর্লভ নেয়ামতে ভূষিত দেখতে পাই।

সে আনন্দ ও সন্তোষের সাথে তার জাতিকে স্মরণ করছে এবং আক্ষেপ করছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে যে মর্যাদা ও সন্তোষ দান করেছেন তা যদি তারা দেখতো, তাহলে দৃঢ়তম প্রত্যয়ের সাথে সত্যকে জানতে পারতো।

এটা ছিলো ঈমানের প্রতিদান। পক্ষান্তরে বিদ্রোহ ধ্বংস করা আল্লাহর কাছে এতো সহজ যে, সে জন্যে তাঁর ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজনই পড়ে না। ওটা তার কাছে অতি মাত্রায় দুর্বল ব্যাপার–

'আমি তার জাতির ওপর তার পরে আকাশ থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি, পাঠানোর ইচ্ছাও আমার ছিলো না। সে তো ছিলো একটা চিৎকার মাত্র। তাতেই তাদের সবার প্রাণ প্রদীপ নিভে গেলো।'

এখানে সেই জাতিটাকে এতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে যে, তাদের ধ্বংসযজ্ঞের কোনো দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়নি। কেবল একটামাত্র চিৎকার তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। এরপর যবনিকাপাত ঘটে তাদের ঘৃণ্য ও অপমানজনক ধ্বংসের ওপর।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ
أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن
نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا
عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ ۖ
نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

৩০. বড়োই আফসোস (এমন সব) বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যাদের তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি! ৩১. তারা কি (এ বিষয়টি) লক্ষ্য করেনি যে, তাদের আগে আমি কতো জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা (কোনোদিনই আর) তাদের দিকে ফিরে আসবে না;

রুকু ৩

৩২. বরং তাদের সবাইকে (একদিন) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে। ৩৩. তাদের (শিক্ষার) জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নিদর্শন হচ্ছে (এই) মৃত যমীন, যাকে আমি (আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে) জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, তা থেকেই তারা (নিজ নিজ অংশ) ভক্ষণ করে। ৩৪. আমি তাতে (আরো) সৃষ্টি করি (নানা প্রকার) খেজুর ও আংগুরের বাগান, উদ্ভাবন করি অসংখ্য (নদীনালার) প্রস্রবণ, ৩৫. যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, (আসলে) এগুলোর কোনোটাই তো তাদের হাতের সৃষ্টি নয়, (এতদসত্ত্বেও) কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না? ৩৬. পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, (চাই তা) যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ (কিছু) জানেই না। ৩৭. তাদের জন্যে (আমার আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে (এই) রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে এরা সবাই (এক সময়) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ৩৮. সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গন্ডির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা); ৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি

الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

(কক্ষ পরিক্রমণের সময় ছোট হতে হতে তা এক সময়) এমন (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে, যেন তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডাল। ৪০. সূর্যের এ ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে– না রাত দিনকে ডিংগিয়ে আগে চলে যেতে পারবে; (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে। ৪১. তাদের জন্যে (আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের (এক সময় একটি) ভরা নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম; ৪২. তাদের (নিজেদের) জন্যে সে নৌকার মতো যানবাহন আমি সৃষ্টি করেছি, যাতে (মাল সম্পদসহ) তারা আরোহণ করছে। ৪৩. অথচ আমি চাইলে (মাল সামানাসহ) এদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তাদের ফরিয়াদ শোনার মতো কেউই থাকবে না, না এদের (তখন) উদ্ধার করা হবে। ৪৪. (হ্যাঁ, একমাত্র) আমার অনুগ্রহই ছিলো, (যা তাদের নিজ নিজ মনযিলে পৌঁছে দিয়েছিলো) এবং এটা ছিলো এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (এ বৈষয়িক) সম্পদ (উপভোগ করার সুযোগ)। ৪৫. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে যে (আযাব) রয়েছে তাকে ভয় করো, (ভয় করো) যা (কিছু) পেছনে আছে (তাকেও), আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। ৪৬. তাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি! ৪৭. (এমনিভাবে) যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে (কিছু অংশ অন্যদের জন্যে) ব্যয় করো, তখন (এ) কাফেররা ঈমানদারদের বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন, (হে নবী, তুমি বলো), আসলেই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) আছো!

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً

وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى

اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ

يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ

لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ

وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৪৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে (বলো, কেয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে? ৪৯. (এসব প্রশ্নের মাধ্যমে) এরা (আসলে) যে বিষয়টির জন্যে অপেক্ষা করছে, তা তো হবে একটি মহাগর্জন, তা এদের (হঠাৎ করে) পাকড়াও করবে এবং (তখনো দেখা যাবে) তারা (এ ব্যাপারে) বাকবিতন্ডা করেই চলেছে। ৫০. (এ সময়) তারা (শেষ) অসিয়তটুকু পর্যন্ত করে যেতে সক্ষম হবে না, না তাদের আপন পরিবার পরিজনদের কাছে (আর) কোনোদিন ফিরিয়ে আনা হবে।

রুকু ৪

৫১. যখন (দ্বিতীয় বার) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন মানুষগুলো সব নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মালিকের দিকে ছুটতে থাকবে। ৫২. তারা (হতভম্ব হয়ে একে অপরকে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে (এমনি করে) জাগিয়ে তুললো (এ সময় ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে তাই (কেয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) যার ওয়াদা করেছিলেন, নবী রসূলরাও (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলেছিলেন। ৫৩. (মূলত) এ (কেয়ামত অনুষ্ঠান)-টি (শিংগার) এক মহাগর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়, এ গর্জনের পর সাথে সাথে সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে। ৫৪. অতপর (ঘোষণা হবে), আজ কারও প্রতি (বিন্দুমাত্রও) যুলুম করা হবে না, (আজ) তোমাদের শুধু সেটুকুই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা (দুনিয়ায়) করে এসেছো। ৫৫. (সেদিন) অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা মহা আনন্দে বিভোর থাকবে, ৫৬. তারা এবং তাদের সংগী-সংগিনীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে (বসে) থাকবে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞٥٧ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۞٥٨ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞٥٩ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞٦٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞٦١ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞٦٢ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞٦٣ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞٦٤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞٦٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۞٦٦

৫৭. সেখানে তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে (নানা প্রকারের) ফলমূল, (আরো থাকবে) তাদের জন্যে তাদের কাংখিত (ও বাঞ্ছিত) সব কিছু, ৫৮. পরম দয়ালু মালিকের পক্ষ থেকে তাদের (স্বাগত জানিয়ে) বলা হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ষিত হোক)। ৫৯. (অপরদিকে পাপীদের বলা হবে,) হে অপরাধীরা, তোমরা (আজ আমার ঈমানদার বান্দাদের কাছ থেকে) আলাদা হয়ে যাও। ৬০. হে বনী আদম, আমি কি তোমাদের (এ মর্মে) নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের গোলামী করো না, কেননা সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, ৬১. (আমি কি তোমাদের একথা বলিনি,) তোমরা শুধু আমারই এ বাদাত করো, (কেননা) এটিই হচ্ছে সহজ সরল পথ। ৬২. (আর শয়তান)– সে তো (তোমাদের আগেও) অনেক লোককে (এভাবে) পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিলো; (তা দেখেও) তোমরা কি বুঝতে পারলে না? ৬৩. (হ্যাঁ,) এ (হচ্ছে) সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে (বার বার) করা হয়েছিলো। ৬৪. আজ (সবাই মিলে) তাতে গিয়ে প্রবেশ করো, যা (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা অস্বীকার করছিলে! ৬৫. আজ আমি তাদের মুখের ওপর সীলমোহর দেবো, (আজ) তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা-গুলো (আমার কাছে) সাক্ষ্য দেবে, এরা কি কাজ করে এসেছে। ৬৬. (অথচ) আমি যদি চাইতাম, (দুনিয়ায়) আমি এদের (চোখ থেকে) দৃষ্টিশক্তি বিলোপই করে দিতাম, তেমনটি করলে (তুমিই বলো) এরা কিভাবে (তখন চলার পথ) দেখে নিতো!

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৭. (তাছাড়া) যদি আমি চাইতাম তাহলে (কুফরীর কারণে) তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই তাদের আকৃতি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম, সে অবস্থায় এরা সামনের দিকেও যেতে পারতো না, আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!

রুকু ৮

৬৮. যাকেই আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকেই আমি সৃষ্টিগত (দিক থেকে) তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই; (এটা দেখেও) কি তারা বুঝতে পারে না (কে তাদের দেহে এ পরিবর্তনগুলো ঘটাচ্ছে)?

তাফসীর

আয়াত ৩০-৬৮

যে মোশরেকরা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে মিথ্যাবাদী বললো এবং তাঁর আনীত ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো, তাদের সম্পর্কে সূরার প্রথম অধ্যায়ে যে পাঠ দান করা হয়েছে, তার মধ্যে তাদের বুঝানের জন্যে পল্লীবাসী কয়েকজন মানুষের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এবং পরিশেষে তাদের পরিণতি কি হবে সে বিষয়ে আলোচনার পর আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে শিক্ষা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে বলা হচ্ছে, 'অতপর ওরা (আল্লাহর প্রেরিত শাস্তিতে) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। .... এরপর আলোচ্য অধ্যায়ে বলা হচ্ছে যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব ও ব্যবহার সকল জনপদে একই প্রকার থাকতে দেখা গেছে। তারপর জানানো হচ্ছে যে, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলী জানার পরও সাধারণভাবে যে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না তাতে তাদের লাভ কি! তারা তো পূর্ববর্তীদের মতো সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আর কখনও ফিরে আসবে না। তাই বলা হচ্ছে,

'সবাই সেদিন আমি মহান সম্রাটের দরবারে একত্রিত হবে।'

এরপর শুরু হচ্ছে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর ক্ষমতার নানা প্রকার নিদর্শনের বর্ণনা। এ সব নিদর্শন রয়েছে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, ছড়িয়ে রয়েছে পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর মধ্যে এবং অতীতের ইতিহাসের পাতায় পাতায়................. এতদসত্ত্বেও ওরা সত্যকে অস্বীকার করে চলেছে। অথচ এসব মানুষ, 'আযাব কেন আসছে না, কত দেরী হবে আযাব আসতে, নিয়ে এসো না তোমার আযাব' এসব বলে বলে ব্যস্ততা দেখায়। কারণ তারা আযাব আসার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা বলে, কখন সংঘটিত হবে তোমাদের প্রতিশ্রুত সে আযাব, নিয়ে এসো না জলদি করে, যদি তোমরা (তোমাদের ওয়াদায়) সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

ওদের জলদি আযাব নাযিল করার দাবীর জওয়াবে কেয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য বিভিন্ন আযাবের মধ্য থেকে কিছু কিছু শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে, যা শুনে তারা নিজেদের প্রত্যাবর্তনের স্থান (অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে) এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যেন তারা তাদের (বাহ্যিক) চোখ দিয়ে সে কঠিন আযাব তাদের সামনে হাযির দেখতে পাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হায় আফসোস মানুষের জন্যে..... সেদিন সবাই আমার কাছে জড়ো হবে।' (আয়াত ৩০-৩২)

আল্লাহ তায়ালা কখনো মানুষের দুর্গতি দেখতে চান না

পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে মানুষের দুর্গতি বড়ই কঠিন, এ জন্যে তিনি উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সাথে তাদের জন্যে আফসোস করছেন। কেননা সেই ভয়ানক দিনে তারা আযাব থেকে বের হওয়ার জন্যে যতো আহাজারি করতে থাকবে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না। সেদিন কিন্তু মহাবিচারক আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে আর এতোটুকু আফসোস করবেন না। তাই আজকেই তিনি জানাচ্ছেন, সেদিনকার ঘটনার বৃশ্চিকতা যারা অনুভব করবে তারা অবশ্যই আফসোস করবে! সেদিনকার অবস্থা তো এতোই কঠিন ও দুঃখজনক হবে যে, তার থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না এবং পাপাচারী মানুষেরা ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হবে। এ অবস্থা হবে মানুষের জন্যে মহাবিপজ্জনক।

হায় আফসোস, মানুষের জন্যে, আজকে তাদের সে ভয়ানক দিনের আযাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ তারা গ্রহণ করছে না, বরং তারা এ সকল সুযোগ জেনে বুঝে হেলায় হারাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর পরম বিশ্বস্ত মহান রসূলের দেয়া এ সম্পর্কিত খবর নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, উল্টা তাঁকেই মিথ্যাবাদী ঠাওরাচ্ছে। অথচ তাদের সামনে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস রয়েছে, সেসব ইতিহাস তারা দেখছে, পড়ছে, জানছে, তা সত্তেও তা থেকে তারা কোনো শিক্ষা নিচ্ছে না। অপরদিকে মহা দয়াময় পাক পরওয়ারদেগার তাদের সামনে তাঁর রহমতের দরজা তাঁর বাছাইকৃত বান্দা ও রসূলদের মাধ্যমে খুলে দিয়েছেন, যারা কিছু দিন পর পরই আগমন করেছেন এবং ভ্রান্ত মানবকে পথ দেখানোর জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তারা আল্লাহর রহমতের দরজাগুলো নিজেদের আচরণ দ্বারা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং আল্লাহর সাথেও বেয়াদবী করতে কসুর করছে না। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'যে কোনো রসূলই তাদের কাছে এসেছে, তার সাথে তারা ঠাট্টা মস্কারি করেছে– উপহাস বিদ্রূপ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'ওরা কি দেখেনি, আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) তাদের পূর্বে কত শত শত জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি যে, তারা আর কখনোই ফিরে আসবে না।'

অবশ্যই অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব জাতি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না তারা বহু বছর ও বহু যুগ ধরে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে এ কথার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে; কিন্তু বলদর্পী মানুষেরা– যারা আজকে শক্তিমদমত্ত হয়ে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে না যে, তাদের থেকে আরও বহু বহুগুণে শক্তিশালী বহু জাতি দুনিয়ায় বার বার এসেছে এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেদের ভূমিকা পালন করে অবশেষে অসহায় অবস্থায় দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছে যে, আজ তাদের কোনো নাম-নিশানা আর বাকি নেই, কিন্তু হলে কি হবে। অবশ্যই সেদিনটি আসবে যেদিন সবাইকে একই প্রত্যাবর্তনস্থলে জড়ো হতে হবে! সুতরাং অতীতের জাতিসমূহের অবস্থার মতো আজকের এই দুঃখজনক অবস্থা লক্ষ্য করুন, এর থেকে অধিক আর কোনো দুঃখজনক অবস্থা কি তারা দেখতে চায়?

আজকের অনেক জীবজন্তু মানুষের ব্যর্থ প্রচেষ্টাসমূহ প্রত্যক্ষ করছে এবং সাধ্যমতো তাদের অস্তিত্বের সত্যতা দ্বারা তাদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু কি হলো এই হতভাগা মানুষের! তারা দেখছে তাদেরই সামনে নেমে আসা কত মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয়। এরপরও কি তারা মনে করছে যে, তাদের পথের সকল কাঁটা তারা দূরীভূত করতে সক্ষম হবে? হাঁ, অহংকারই তাদের সঠিক কথাটি বুঝতে দিচ্ছে না এবং

মানতে দিচ্ছে না সেই সঠিক কথাটি, যা মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে সকল যামানায়ই বলে আসা হয়েছে! আর এ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে আলোচিত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের সেই সুস্পষ্ট কথা, যার সত্যতা মানুষের চোখের সামনে ভাসছে; কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মানুষরা এগুলো দেখেও দেখতে চায় না, এমন অন্ধ হয়ে থাকার ভান করে যেন সত্যিই তারা দেখে না!

আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে যেসব জাতি, যারা আর কখনও তাদের উত্তরসূরীদের কাছে ফিরে আসবে না, তারা কিছুতেই আল্লাহর নযর থেকে বাদ পড়বে না, এমন হবে না যে তারা সীমাহীন সৃষ্টির বুকে হারিয়ে যাবে এবং সময়ান্তরে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাবে............ তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের সবাইকেই আমার কাছে একত্রিত করা হবে (সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমি, আমিই তাদের আজ একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি) .... ।'

আমার শক্তি-ক্ষমতা বুঝার জন্যে তাদের সামনে যে জাজ্বল্যমান নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে যা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, মৃত পৃথিবীকে পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের (শিক্ষার) জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নিদর্শন হচ্ছে (এই) মৃত যমীন, যাকে ......মানুষ (এ পর্যন্ত) আদৌ (কিছু) জানেই না। (আয়াত ৩৩-৩৬)

ওরা রসূলদের অস্বীকার করছে, তাদের মিথ্যাবাদী বানানোর চেষ্টা করছে এবং তাদের আনীত সংবাদগুলো প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ এ যালেমদের পরিণতি অতীতে কি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কি হতে পারে, সে বিষয়ে একবারও তারা ভেবে দেখছে না। তাদের সামনেই তো রয়েছে সৃষ্টির বুকে কত দৃষ্টান্ত, কত সাক্ষ্য-প্রমাণ। সেগুলো তারা দেখছে, তাদের মনের মুকুরে ভেসে রয়েছে যালেমদের শাস্তির দৃশ্যাবলী, তবুও তারা হঠকারিতা থেকে বিরত হচ্ছে না। তারা একটুও চিন্তা করছে না রসূলদের ভূমিকা কি! কেন তারা মরণপণ করে সত্য প্রচারে আত্মনিবেদিত। তারা তো ওদের আল্লাহর দিকেই আহ্বান জানাচ্ছেন। একটু খেয়াল করলে অবশ্যই তারা একথা বুঝতে পারবে যে, তাদের চতুষ্পার্শে ছড়িয়ে থাকা বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছু প্রতিনিয়ত তাদের মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অবহিত করছে, তাঁর উপস্থিতির কথা জানাচ্ছে এবং তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আর তাদের অতি কাছের যে জিনিসটি তারা সবসময় দেখছে, তারই উদাহরণ দিয়ে তাদের আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে জানাচ্ছেন। দেখুন এই পৃথিবী ও তার মাটি, যা কঠিন রৌদ্রের তাপে ঠন ঠন করতে তাকে এবং এ মাটি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্জীব বলে মনে হয়, সেই মাটিতে আল্লাহর মেহেরবানীতে যখন বৃষ্টিধারা নেমে আসে তখন সেই মরে যাওয়া মাটি আবার যিন্দা হয়ে আসে এবং তার থেকে আবার সুন্দর শ্যামল শস্য ও চোখ জুড়ানো ফলে ফুলে সুশোভিত গাছ-গাছালি বেরিয়ে আসে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মতো নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী বেরিয়ে আসে, উৎপন্ন হয় খেজুর ও আংগুরের বাগিচা, প্রবাহিত হতে শুরু করে ঝর্ণাধারা, যা জীবনের গতিতে শক্তি জোগায়।

আর জীবনই বা কি? এটা কি এক অলৌকিক ব্যাপার নয়? একটু খেয়াল করলে মানুষ বুঝতে পারবে, মানুষের জীবনটাই এক মোজেযা, কেননা এ জীবনটাকে সজীব সচল রাখার ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। অবশ্যই এই অত্যাশ্চর্য জীবনকে একমাত্র আল্লাহর হাতই জারি রেখেছে, আর মৃতদের মধ্যে জীবনের প্রবাহ ঘটানো তারই মহান হাতের কারিশমা। আর দেখুন

সে ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্যামল ফসলের দিকে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সবুজের বাগ-বাগিচার সমারোহ। গাছে গাছে পরিপক্ক ফলমূলের দিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকান তাহলে আপনার চোখ ও অন্তর খুলে যাবে এবং আপনার মন ডাক ছেড়ে বলে ওঠবে, এ সবই সকল কিছুর সৃষ্টিকারী আল্লাহর কুদরতেই অস্তিত্বে এসেছে। সেই মহান হাতই মাটি ফাটিয়ে তার থেকে বের করছেন ফুলে ফলে ও পত্রপল্লবে ভরা অগণিত এ সব গাছপালা। তিনি ব্যবস্থা করছেন উন্মুক্ত আকাশে প্রবাহমান এই আলো বাতাস, সূর্য ও তাপে বর্ধিত হচ্ছে গাছের কান্ড, ডালপালা ও পত্রপুষ্পে সুশোভিত হচ্ছে গোটা পরিবেশ; ফুল ফুটছে, ফল পাকছে, তারপর ফসল কাটা ও ফল পাড়ার সময় আসছে ...'যাতে করে ওরা খেতে পারে এর ফল এবং গ্রহণ করতে পারে তাদের হাতের উপার্জন থেকে।' .... চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর কুদরতী হাতই তাদের কাজ করার যোগ্যতা দান করছে, যেমন করে সে হাতই ফসল উৎপন্ন করার শক্তি যোগাচ্ছে, যোগাচ্ছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার ও বেড়ে ওঠার ক্ষমতা। 'তারা কি (এর জন্যে) শোকরগোযারীর করবে না?'

এসব গভীর আবেগপূর্ণ আলোচনার পরও যারা উদাসীনতা দেখাচ্ছে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং পাশাপাশি সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদের যেন তাঁরা তাদের রবের প্রশংসা-গীতি গাইতে পারে, জপতে পারে তাঁর নাম, যিনি তাদের জন্যে পয়দা করেছেন গাছপালা ও ফলমূল এবং উৎপন্ন করেছেন নানা প্রকার ফসল। যার মধ্যে মানুষের মতো এবং জানা অজানা অন্যান্য প্রাণী ও প্রাণহীন পদার্থের মত নারী ও পুরুষ বীজ বর্তমান রয়েছে। এসব প্রাণী বা বস্তু সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এরশাদ হচ্ছে,

'মহা পবিত্র সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর পেট থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের নিজেদের মধ্য থেকেই সবাইকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন, আরও তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন কিছুকে যা তারা জানে না।'

আর এই সকল তাসবীহ বা প্রশংসাগীতি (আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা) সকল সময় এবং সকল স্থানেই চলছে, আর এই প্রশংসাসূচক আনুগত্যের মাধ্যমে এই সৃষ্টির রহস্যরাজির মধ্যে অবস্থিত সব থেকে বড় যে সত্যটি প্রকাশ পাচ্ছে, তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই। তিনিই আল্লাহ তায়ালা যিনি ছাড়া আর সৃষ্টিকর্তা নেই। অতএব গোটা বিশ্বলোকে আইনও চলবে তাঁর। এই সৃষ্টি কাজের রহস্য ও প্রধান বৈচিত্র্য হচ্ছে, এই যে জানদার ও বেজান যা কিছু রয়েছে তিনিই সৃষ্টি করেছেন সেসব, এই বিশ্বজাহানে সবাইকেই তিনিই জোড়া জোড়া বানিয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু ও জড় পদার্থ 'এসবের মধ্যে রয়েছে, তোমরা জান না এমন কিছু'। অন্যান্য জানা ও অজানা সব কিছুকে জোড়া জোড়া পয়দা করার মাধ্যমে সম্ভবত তিনি দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন; এক, তিনি ছাড়া একক আর কেউ নেই। দুই, সৃষ্টি কাজ দুনিয়ায় যা কিছু চলছে চলবে, সবাই ও সবকিছু সম্ভব হবে দুইয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায়। এককভাবে কোনো কিছুই বিশ্ব জাহানে চলে না, চলবে না। এই সেই একক শক্তি যিনি সকল শক্তি ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সব কিছুর সূচনা করেছেন। এ কথা দ্বারা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিয়ম বুঝা যাচ্ছে যে, চেহারা-ছবি ও আকৃতি-প্রকৃতি যার যাই-ই হোক না কেন সবার মালিক ও সৃষ্টিকর্তা একজনই। যতো শ্রেণীর বস্তু এবং আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে যতো প্রকার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবজন্তু ও পদার্থ সকল দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, সেসবের পুরো খবর তিনি ছাড়া আর কেউ রাখে না। আর কেই বা জানে কোথায় কি আছে। জীবজন্তু ও জড় পদার্থ এবং এ সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান প্রতিটি বস্তু কিভাবে ব্যবহার করা হবে এসব খবর একমাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়বই রাখেন। সারা

বিশ্বের মধ্যে সরিষা পরিমাণ একটি বীজও যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে বা তার থেকে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো বীজ যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা সবই আল্লাহর জানা রয়েছে এবং সবাই পয়দা হয়েছে জোড়া জোড়া বস্তুকণার মাধ্যমে। এই বস্তুর শেষ পর্যায় হচ্ছে ইলেকট্রন এবং এর মধ্যেও রয়েছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রশ্মি। এই দুইয়ের সম্মিলনে যে কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করছে! এইভাবে তারকারাজির মধ্যেও রয়েছে এই দ্বিত্ব। দুটি দুটি তারা একত্রে মিলিত হয় ও পরস্পর আবদ্ধ হয়ে থাকে, তারা উভয়ে একই কক্ষপথে চলে যেন দুই জনে একযোগে গান গেয়ে চলেছে!

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই মৃত পৃথিবীর মধ্য থেকেই তো বেরিয়ে আসছে জীবন ও জীবন্ত প্রাণী........ এগুলো থেকে নিয়ে আকাশের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে যাবতীয় নিদর্শনসমূহ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে চলছে সব কিছু, যা মানুষ তাদের বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। এ সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অদৃশ্য হাত অলৌকিকভাবে প্রতিনিয়ত পরিচালনা করছে।

'তাদের (জ্ঞান চক্ষু খুলে দেয়ার) জন্যে (আমার আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে (এই) রাত, আমি .... এরা প্রত্যেকেই (বিশাল) শূন্যলোকে সাতার কেটে চলেছে।' (আয়াত ৩৭-৪০)

বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা বিরাজমান

অহরহ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ঘোর কাল রাত্রি যা দিনের আলোকে আড়াল করে দিচ্ছে এবং অন্ধকার নেমে আসছে ..... এ এমন দৃশ্য যা পৃথিবীর সকল অঞ্চলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বার বার মানুষ প্রত্যক্ষ করছে (অবশ্য এই নিয়ম থেকে সে দুটি মেরু অঞ্চল ব্যতিক্রম যেখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস ধরে কখনও রাত থাকে আর কখনও থাকে দিন)। এগুলো ব্যতীত পৃথিবীর (দৈনিক এই) আহ্নিক গতি আমাদের অবাক বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় এবং বিদগ্ধ মানুষের মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে আরও গভীরভাবে সৃষ্টি রহস্যের দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে।

এসব বিষয়ে আল কোরআনে যে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে তা তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এখানে যে কথাটি উল্লেখিত হয়েছে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। এখানে দিনের ছবিটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন তাকে রাত্রির পোশাক পরানো হয়েছে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা দিনকে রাত্র থেকে সরিয়ে নেন তখন তারা গভীর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যায়। আর প্রকৃত সত্য বিষয়ের তাৎপর্য বুঝার জন্যে যদি সঠিকভাবে আমরা চিন্তা করি তাহলে এই বিরল রহস্যের কথা আমরা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবো। অতপর খেয়াল করুন, বলের মতো গোলাকার পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যখন নিজ মেরু রেখার ওপর আহ্নিক গতিতে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তখন এর প্রতিটি বিন্দু সূর্যের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে। তারপর যখন এই বিন্দুটিতে দিন হয় এবং সূর্যের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে করতে এই বিন্দুটি সূর্য থেকে আড়াল হয়ে যায়, তখন দিন শেষ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর অংশটিতে অন্ধকার ছেয়ে যায়। এভাবে ভূপৃষ্ঠার প্রতিটি বিন্দুতে পর্যায়ক্রমে এবং এক বিশেষ নিয়মে দিনের আগমন ঘটে এবং এক নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর দিনের আলো নিভে যায় ও রাত্রি আসে। এটিই হচ্ছে প্রাকৃতিক অবস্থার সেই আসল চিত্র যা প্রতিনিয়ত পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে সদাসর্বদা পরিভ্রমণ করে চলেছে।'

অর্থাৎ সূর্যও তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সদাসর্বদা আবর্তিত হচ্ছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় সূর্য নিজের সেই স্থানে স্থির হয়ে রয়েছে যা আভ্যন্তরীণভাবে আবর্তিত

হচ্ছে। অর্থাৎ আল কোরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছে যে, চাঁদ সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র যেথায় যা কিছু আছে সবই এবং সবাই তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে থেকে আবহমান কাল ধরে অবিরামভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে, যা অতি সাম্প্রতিককালের জ্যোতির্বিদদের জ্ঞান-গবেষণায় ধরা পড়েছে। তারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে, একই গতিতে এবং একই লক্ষ্যে আবর্তনরত এসব গোলক অত্যাশ্চর্য এক গতিতে চলছে, যার আনুমানিক দ্রুততা হচ্ছে সেকেন্ডে বারো মাইল! আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সবের মালিক, তিনি এদের সম্পর্কে, এদের গতি সম্পর্কে এবং এদের সবার গন্তব্যস্থল বা পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত; তাই তো তিনি বলছেন, 'এরা চলছে এদের নির্দিষ্ট গতি পথে। এই গতি পথের অবস্থান কোথায় কিভাবে রয়েছে এবং কবে কিভাবে এই আবর্তনের অবসান ঘটবে তা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না কার শেষ পরিণতি কি হবে।'

আর আমরা যখন পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সূর্যের আয়তনের কথা চিন্তা করি এবং আরও যখন চিন্তা করি এ বিশাল জগতের মহাশূন্যতায় কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া আবর্তনরত কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের কথা, তখন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের কথা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারি। বুঝতে পারি, সৃষ্টিজগত পরিচালনায় মহান আল্লাহর হাত ও তাঁর জ্ঞান কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এটিই হচ্ছে মহাশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর ফয়সালা,'

'আর চাঁদের জন্যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি অবস্থা ধারণ করার, যা অবশেষে খেজুরের একটি শুকনা শাখার আকারে পৌঁছে যায়।'

অর্থাৎ চাঁদকে মানুষ সেসব কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ে দেখতে থাকে। প্রথমে তো এর জন্ম হয় কাস্তের অগ্রভাগের ন্যায়, তারপর প্রতি রাতে বাড়তে বাড়তে অবশেষে ষোলকলায় পূর্ণ হয় এবং নতুন এ চাঁদটি চৌদ্দ তারিখে পূর্ণিমার চাঁদ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকেই আবার এ পূর্ণ চাঁদটি কমতে শুরু করে এবং কমতে কমতে অবশেষে বাঁকা ধনুকের রূপ ধারণ করে; বরং তা পুনরায় খেজুরের শুকনা ডালের আকারে ফিরে আসে। 'উরজূন' বলতে খেজুরের সেই কান্দি বুঝায় যাতে থরে থরে খেজুরের গাঁথুনি সজ্জিত থাকে।

কোনো ব্যক্তি উপর্যুপরি কয়েক রাত ধরে চাঁদকে খেয়াল করে দেখতে থাকলে আল কোরআনের এই চমৎকার বর্ণনার মজা টের পাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশেষে সে ফিরে যায় তার পূর্বাবস্থায়, যেন তা খেজুরের একটি শুকনা পুরাতন ডাল।'

বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হচ্ছে 'কাদীম' শব্দটি। কারণ চাঁদ প্রথম দিকে একটি বাঁকা ধনুকের মতো দৃশ্যপট ভেসে ওঠে সুদূর ওই নীল আকাশের ভালে, অতপর পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার পর পুনরায় কমতে কমতে চাঁদটি আবার বাঁকা কাস্তের মতো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এ জন্যে শুরুতে যেমন এর নাম হেলাল (কাস্তের মতো বাঁকা ক্ষীণ চাঁদ), তেমনি এর শেষ স্তরে এসেও এটা পূর্বের মতো সেই একই নাম ধারণ করে; তবে যখন চাঁদ উদিত হয় তখন অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও তার মধ্যে কিছু উজ্জ্বলতা থাকে, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে কমতে কমতে চাঁদ যখন শেষ অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং বিলীন হওয়ার পূর্বে যখন কাস্তের বক্র অগ্রভাগের মতো পরিদৃষ্ট হয়, তখন খেয়াল করলে বুঝা যায় যে, শুক্লপক্ষের প্রথম দিনের চাঁদের তুলনায় তা অত্যন্ত ম্লান থাকে, উজ্জ্বলতাবিহীন ও শুধু সাদা রেখা আকারে থেকে অবশেষে নিভে যায়। আল কোরআনে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই বিশেষ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপ্রমাণিত করা সম্ভব হয়নি!

একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন এই আকাশপানে, কেমন করে সুন্দর সুকোমল চাঁদটি মুঠো মুঠো স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের জীবনকে মধুময় করে তুলছে। শুক্লপক্ষে একের পর এক রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে চাঁদের আলো তার সকল মাধুরী নিয়ে স্নিগ্ধ ও মায়া মমতার পরশ বুলিয়ে আমাদের হৃদয় মনকে পরম পুলকে ভরে দিতে থাকে। কোথাও এমন কেউ নেই যার হৃদয়ের তারে চাঁদের এই মধুর রাগিনী ঝংকার না তোলে, নেই এমন কোনো বেরসিক যার হৃদয় রাজ্য চাঁদের মধুর রসে সিঞ্চিত না হয়, এর সুমহান সৌন্দর্য প্রেমিকের কোমল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত না করে, বিদগ্ধ জনতাকে আকাশমন্ডলীর বিস্ময়কর বস্তুসমূহ সম্পর্কে চিন্তা না জাগায়; তারা সীমাহীন এ মহাকাশের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের রহস্যরাজি বুঝতে পারুক আর নাই পারুক, চাঁদের মাধুরীতে তারা মুগ্ধ হতে বাধ্য এবং কিছু না কিছু চিন্তা তাদের মধ্যে জাগবেই জাগবে।

সবশেষে বিশাল এই সৃষ্টিজগতের সেই সূক্ষ্ম নিয়ম শৃংখলার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যার অধীনে চলছে গোটা সৌরজগত এবং উর্ধ্বলোকে নভোমন্ডলে যে কাজ চলছে সেই সর্বজনবিদিত বাহ্যিক রহস্যরাজি সম্পর্কে জানানো হচ্ছে, এই একক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রশিতে বাঁধা এক অপরিবর্তনীয় নিয়ম শৃংখলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আল কোরআন জানাচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধান অনুযায়ী যখন প্রত্যেকে এবং প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ কাজ করে চলেছে, তখন কেউ কারও কাছে হস্তক্ষেপ করতে বা বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সূর্যের পক্ষে চাঁদকে ধরে ফেলা (তার চলার পথে এসে তার পরিক্রমাকে বাধাগ্রস্ত করা) কখনও সম্ভব নয়, আর (নির্দিষ্ট সময় ছাড়া) রাতও দিনের আগে যেতে পারে না এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।'

প্রত্যেকটি তারা এবং প্রতিটি গ্রহের জন্যে রয়েছে (তার নিজস্ব) কক্ষপথ অথবা পরিভ্রমণের রাস্তা, চলবার সময় কেউ সে পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলতে পারে না; আর তারকারাজি ও গ্রহগুলোর চলার পথসমূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, রয়েছে অকল্পনীয় দূরত্বের ব্যবধান। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদদের জ্ঞান গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল, আর এই দূরত্ব কোনো দূরত্ব বলেই মনে হয় না যখন সৌরজগৎ ও অপর আকাশে অবস্থিত সব থেকে নিকটবর্তী তারকার মধ্যে দূরত্বের কথা আমাদের চিন্তায় আসে। এই দূরত্বের পরিমাপ অনুমান করতে গিয়ে একটা হিসাব এইভাবে বের করা হয়েছে যে, সৌরজগৎ থেকে নিকটবর্তী তারার দূরত্ব অতিক্রম করতে চারটি আলোক বছরের সময় লাগে (অর্থাৎ, সেকেন্ডে আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল হলে এক বছরে আলো যতো মাইল চলে, তার চার গুণ বেশী হবে সৌরজগৎ থেকে নিকটবর্তী তারকাটির দূরত্ব। আর একভাবে হিসাব কষা যায়। ১০১৬ দশকে যদি পর্যায়ক্রমে ষোল বার গুণ করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে ততো মাইল দূর হচ্ছে সৌরলোক থেকে নিকটতম তারকার দূরত্ব।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনই এই মহা সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সৌরলোককে সুদূর আকাশে অবস্থিত তারকারাজির সাথে (এতো বিশাল দূরত্বের ব্যবধান সত্তেও) এমন এক রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, যা কখনও ছিঁড়বার নয় এবং গোটা সৃষ্টিজগতকে তাদের সবার পারস্পরিক সহযোগিতায় টিকিয়ে রেখেছেন। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার এই পরিমন্ডলকে তিনিই অটুট

রেখেছেন, যেন গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকাগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে চলতে কাছাকাছি হয়ে না যায় এবং কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। আর এভাবেই সুপরিজ্ঞাত পরিসমাপ্তির দিন না আসা পর্যন্ত এইভাবেই তারা চলতে থাকবে। সুতরাং সূর্যের পক্ষে কোনোভাবেই চাঁদকে ধরে ফেলা সম্ভব নয়, আর রাত্রিও (তার জন্যে নির্ধারিত নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে) দিবাভাগের সামনে কখনও এগিয়ে আসবে না, অথবা তার চলার পথে কোনো পরিবর্তন আসবে না। কারণ রাত ও দিনের জন্যে পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত নিয়মের মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন আসবে না, যার যা নিয়ম সে নিয়মেই তারা প্রত্যেকে চলবে। এ নিয়ম ভেংগে কেউ কারো আগে বা পরে আসবে, এমনটি কখনও হবে না। আবার চলার পথে কেউ কারও জন্যে কোনো প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণরত রয়েছে।'

মহাশূন্যলোকে নভোমন্ডলের এই মহাবিস্ময়কর পরিক্রমাকে তুলনা করা যেতে পারে মহাসাগরের বুকে ভাসমান জাহাজগুলোর সাথে। এসব জাহাজ যতো বড়ই হোক না কেন, সেই মহা বারিধির বুকে সন্তরণরত অবস্থায় এগুলোকে মনে হয় কিছু বিন্দুর সমাহার মাত্র। এই বিশ্ব চরাচরে মানুষের অবস্থান অতি ক্ষুদ্র, এতদসত্তেও সে কোটি কোটি নক্ষত্রের দিকে তাকায়, তাকায় সেই সীমা-সংখ্যাহীন সদা সচল তারকারাজির দিকে, তাকায় মহাশূন্যলোকে সদা-সর্বদা সন্তরণরত গ্রহ-উপগ্রহগুলোর দিকে, আর দেখে কোটি কোটি এ সব তারকার অবস্থানের বাইরে বহু প্রশস্ত শূন্যতা বিরাজমান। তখন তাদের বুদ্ধি, তাদের চিন্তা-শক্তি সবই খেই হারিয়ে ফেলে; হয়রান পেরেশান হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তারা উর্ধ্বলোকে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়ালোকে পরিভ্রমণরত সকল সৃষ্টির দিকে শুধু তাকিয়ে থেকে যায়। (আয়াত ৪১-৪৪)

এ প্রসংগে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এ বিশাল জগতের সীমাহীন মহাশূন্যতায় পরিভ্রমণরত তারকারাজি ও গ্রহ উপগ্রহাদির সাথে অকূল সাগরের বুকে ভাসমান আদম সন্তানদের বহনকারী জাহাজসমূহের মধ্যে বেশ চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। বহু দিক দিয়ে এ সাদৃশ্য বুঝা যায়; যেমন আকৃতি-প্রকৃতি, গতিবিধি ও উভয় বস্তুনিচয় একইভাবে আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। একদিকে যেমন দেখা যায় নভোমন্ডলে অবস্থিত সকল কিছুকে আল্লাহ তায়ালা পরস্পর সংঘর্ষ লেগে যাওয়া থেকে হেফাযত করছেন, অপরদিকে একইভাবে বিশ পঁচিশ হাজার ফুট গভীর ও হাজার হাজার মাইলব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মহাবারিধির বুকে ভাসমান (মহাসাগরের তুলনায়) তুচ্ছাতিতুচ্ছ জাহাজগুলোকেও সর্বশক্তিমান রব্বুল আলামীনই ঝড় তুফান ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতার এসব অসংখ্য নিদর্শন মানুষ প্রতিনিয়ত অবলোকন করছে। কিন্তু হায়, অকৃতজ্ঞ অর্বাচীন এ সব নরপশু একটুও চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছে না। যদি তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার এ সব নিদর্শন বুঝবার জন্যে তাদের হৃদয়-দুয়ারকে অবারিত করতো, তাহলে এগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া তাদের জন্যে খুব সহজ হয়ে যেতো।

এখানে উল্লেখিত 'আল ফুলকিল মাশহুন' (মানুষ ও জীবজন্তুতে ভর্তি জাহাজটি) দ্বারা সম্ভবত মানবকুলের দ্বিতীয় পিতা হযরত নূহ (আ.)-এর নির্মিত জাহাজটি বুঝানো হয়েছে, যিনি সে জাহাজে করে আদম (আ.)-এর (মোমেন) বংশধরকে বহন করেছিলেন। তারপর সে জাহাজের মতোই মানুষ তৈরী করেছে অসংখ্য জাহাজ, যা মহাসাগরের বুকে উত্থিত উত্থাল তরংগমালার মধ্যে নীল বারিধির বুক চিরে চিরে মানুষ ও মালামাল বহন করে দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। আকাশের মহাশূন্যতায় পরিক্রমণরত সকল নক্ষত্রমালাও মহাসাগরের বুকে ভ্রমণরত জাহাজসমূহের মধ্যে একইভাবে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা সক্রিয় রয়েছে বলে বুঝা যায়। এ দুটি

বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, সৃষ্টির বুকে অন্যত্র যেখানে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অদৃশ্য পরিচালনায় নিশিদিন কাজ করে চলেছে। দেখুন না, অকূল সমুদ্রের বুকে কেমন করে, কোন বিশেষ নিয়মে এতো বিপুল পরিমাণ লোহালক্কড় সম্বলিত জাহাজগুলো কেমন অবলীলাক্রমে মাসের পর মাস ধরে ভ্রমণ করে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছে। এই পাড়ি জমানোর মধ্যে বিচিত্র যেসব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেগুলোর দিকে তাকালে একবার জাহাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্ময় জাগে, বিস্ময় জাগে পানির ধারণ ক্ষমতার দিকে যখন তাকানো হয়, তেমনি অবাক বিস্ময়ে বিদগ্ধ মানুষ হতবাক হয়ে যায় বায়ু ও বায়বীয় বাষ্পের ধারণ ক্ষমতায়, অথবা হতবাক হয়ে যায় তখন যখন অণু ও আণবিক শক্তির অকল্পনীয় ক্ষমতা সে অনুভব করে। এভাবে চিন্তাশীল মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আরও কত যে শক্তি-ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে আর তখন সে অকুতোভয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করে যে, বিশ্বের সকল কিছু চলছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমে এবং তাঁরই ফয়সালা অনুসারে। তাই পাক পরওয়ারদেগারের ঘোষণায় জানা যাচ্ছে,

'আর যদি আমি চাইতাম, তাহলে তাদের সে কূল কিনারাহীন সমুদ্র বক্ষে ডুবিয়ে দিতে পারতাম, আর তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারত না। কিছুতেই তাদের সে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পারতো না; কিন্তু আমার রহমত ও সুনির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত তাদের বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্তের কারণেই তারা অকূল পাথারে পাড়ি জমায় এবং সকল বিপদ আপদের মধ্যে দিয়েও পুনরায় নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে।'

মহাসাগরের বুকে প্রচন্ড বাতাসের তাড়নে যখন জাহাজগুলো পাখীর পাখনার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভেসে বেড়াতে থাকে এবং এ জাহাজগুলো যতো ভারীই হোক না কেন বা এদের নির্মাণ কৌশল যতো নিপুণই হোক না কেন, ভীষণ ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজগুলো মুহুর্মুহু আছড়ে পড়তে থাকে, যাত্রীরা হাহাকার করতে তাকে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা প্রমাদ গুনতে থাকে যে, আজ বুঝি আর রক্ষা নেই, কোনো উপায় নেই এ কঠিন বিপদ থেকে বাঁচার, আর বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, শক্তিমান আল্লাহর রহমত না থাকলে রাত দিনের মধ্যে যে কোনো সময়ে এসব জাহাজ ধ্বংস হয়ে যেতো। ট্রলার, ছোট ছোট নৌকা বা সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে যারা সমুদ্র ভ্রমণ করেছে, তারা দেখেছে সমুদ্রবক্ষের ভয়াবহতা। তারা দেখেছে এ ভ্রমণকালে মানুষের অনুসৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর, তারা দেখেছে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় সমুদ্র কেমন রুদ্র রূপ ধারণ করে।

এ কঠিন অবস্থার মধ্যে আল্লাহর মেহেরবানীতে যারা বেঁচে যায় এবং স্থলভাগে প্রত্যাবর্তন করে, তারা সঠিকভাবে রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী বুঝতে পারে এবং হৃদয় দিয়ে তাঁর ক্ষমতা অনুভব করতে পারে। তীব্র বাতাসের তোড়ে অথবা ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে সমুদ্রের বুকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, উত্তাল তরংগাভিঘাতে যখন পাহাড়সম উচ্চতা ও তৎপরবর্তীকালে যখন পাতালসম নীচুতা পয়দা হয়, তখন বৃহৎ থেকে বৃহৎ জাহাজগুলোও শোলার মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে, সে কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং যাত্রীদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসা সম্ভব হয় একমাত্র আল্লাহরই রহমতে, তাঁরই অপার করুণায় মানুষ আবার জীবনের স্বাদ ফিরে পায়। প্রকৃতপক্ষে ভুক্তভোগী ছাড়া সে অবস্থাটা সঠিকভাবে আঁচ করা, সাধারণভাবে অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আকাশে-বাতাসে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র আল্লাহর রহমত বিরাজ করছে। তিনি অবশ্যই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন, তারপর তাঁরই কুদরতে এসে যাবে সেই শেষ দিনটি, যেদিন সবই নিশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'জীবনসামগ্রী ভোগ করার জন্যে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতার এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সারা বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরিণামদর্শী বান্দারা গাফলতির ঘুমে মগ্ন রয়েছে। তাদের নযর পড়ে না এই নিদর্শনসমূহের দিকে এবং তাদের অন্তরও জাগ্রত হয় না। যার কারণে তারা নবী (স.)-কে উপহাস বিদ্রূপ করা থেকে বিরত হয় না, তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা থেকে তারা থেমে যায় না; বরং তারা আযাব জলদি নাযিল করার জন্যে দাবী জানাচ্ছে এবং সদাসর্বদা ব্যস্ততা দেখিয়েই চলেছে, যার ব্যাপারে রসূলরা তাদের সতর্ক করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদের বলা হয় .... যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (আয়াত ৪৫-৪৮)

হায়, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আসা এসব নিদর্শন তাদের অন্তরে কোনো দাগ কাটে না, কোনো চিন্তা অনুভূতিও জাগায় না বা কোনো ভয়ভীতিও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। অথচ যে কোনো জাগ্রত হৃদয়ের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করার জন্যে, কম্পন আনয়নের জন্যে বা তাদের অন্তরকে বিপ্লবী বানানোর জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরত বর্ণনাকারী ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো যথেষ্ট ছিলো, যথেষ্ট ছিলো সৃষ্টির সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা। উন্মুক্ত এ বিশ্ব প্রকৃতি আমাদের সামনে যেন একখানি সুবিশাল গ্রন্থ, যা আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে আল্লাহর মহিমা দেখিয়ে দিচ্ছে, তাঁর মহত্ত্বের কথা জানাচ্ছে, আমাদের তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা ও তাঁর অমোঘ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করছে, কিন্তু মৃত হৃদয়ের কাফেরদের নযরে এ সবের কোনো কিছুই ধরা পড়ে না, আর কখনও এসবের দিকে যদি চোখ মেলে তারা চায়ও, এ সবের ওপর কোনো চিন্তা তারা করে না এবং এসব থেকে কোনো শিক্ষাও তারা গ্রহণ করে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এতোই মেহেরবান এবং আদিগন্ত বিস্তৃত তাঁর রহমত এতো প্রশস্ত যে, তিনি তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের নোংগরবিহীন জাহাজের মতো অকূল সাগরে দিশেহারা হয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেন না, তাদের তাঁর প্রেরিত রসূলের পরিচালনামুক্ত হয়ে জীবনের প্রতি পদে পদে হোঁচট খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেন না, তিনি তাদের সেসব নির্বাচিত ও পরীক্ষিত পরিচালকদের পরিচালনা থেকে বঞ্চিত করেন না যারা জীবনের বাঁকে বাঁকে তাদের সতর্ক করার জন্যে সর্বদা নিয়োজিত থেকেছে এবং গোটা সৃষ্টিরাজ্যের প্রতিপালকের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান জানানোর জন্যে নিবেদিতপ্রাণ। যারা এসব ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের মনের ওপর প্রভাব ছড়ানোর জন্যে, তাদের মনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ভয়ভীতি ও সতর্ক হয়ে চলার অনুভূতি জাগানোর জন্যে এবং তাঁর গযব ও আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে তীব্র মর্মবেদনা নিয়ে সংকল্পবদ্ধ। এসব নবী রসূলদের জানানো হয়েছে যে, মানুষের সামনে ও পেছন থেকে অসংখ্য লোভনীয় বস্তু এবং বিষয় এসে তাদের অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করার জন্যে সদা সর্বদা হাতছানি দিয়ে চলেছে, যার জন্যে তাদের প্রতি পদে পদে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে তাদের দৃষ্টিকে আল্লাহর যমীনে সেসব নিদর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার, যা তাঁর প্রেরিত বাণীর সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু হায়, এসব সত্ত্বেও তারা অন্ধত্বের আঁধারে হাবুডুবু খেয়ে মরছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তাদের বলা হয় যে, তোমরা তোমাদের সামনে ...... আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!' (আয়াত ৪৫-৪৬)

আর যখন অভাবগ্রস্তদের খাওয়ানোর জন্যে তাদের সম্পদ থেকে খরচ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়, তখন তারা বিদ্রূপাত্মক ভংগিতে এবং দোষারোপের ভাষায় উক্তি করতে থাকে—

'আমরা কি খাওয়াবো তাদের যাদের চাইলে আল্লাহ তায়ালাই নিজেই তো খাওয়াতে পারেন?'

যারা তাদের নেকী অর্জনের জন্যে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করার জন্যে আহ্বান জানায়, তাদের বরাবর এইভাবে সেই হতভাগারা বিদ্রূপ করতে থাকে এবং বলে,

জীবন পরিচালনায় আল্লাহকে না জানা কুফরীরই নামান্তর

'অবশ্যই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে রয়েছ।'

বান্দাদের জীবনে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যে বিধান বা নিয়ম কানুন দিয়ে রেখেছেন তা সঠিকভাবে না জানার কারণে তারা জীবন সম্পর্কে যেসব ধারণা পোষণ করে, তাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিয়মকেই অস্বীকার করা হয়, কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে জানা দরকার যে, সবার রুজির মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তিনিই সবাইকে খেতে পরতে দেন, তিনি মানুষের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু যেমন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন, তেমনি জীবজন্তু, কীট পতংগ এবং পৃথিবীর বুকে আমাদের জানা অজানা সবার ও সব কিছুর জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা একমাত্র তিনিই করে থাকেন। তারা নিজেরা কেউ তাদের কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করেনি, তৈরী করতে পারে না, মূলত, কারও পক্ষেই কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, মানুষকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী লাভ করার জন্যে চেষ্টা ও কষ্ট করতে হবে। যমীনে চাষবাস করা, খনিজ দ্রব্যাদি আহরণ করা, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে মালামাল বহন করা এবং বিভিন্ন কালের দাবী পূরণ করতে গিয়ে মালের পরিবর্তে মালের লেনদেন করা ও মুদ্রার বিনিময়ে বেচাকেনা, এ সবই হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সরকারের চাহিদা ও নীতি নির্ধারণের কারণে। বিভিন্ন যামানায় বিভিন্ন শাসক বা খলীফারা (গণপ্রতিনিধিত্বকারী সরকার) তাদের যোগ্যতা অনুসারে জনগণের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করেছে, এবং এভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (খেলাফত) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। এ সব সরকার শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন মেটানোর কাজে নিয়োজিত থাকেনি; বরং এরা মানুষের অধিকার আদায় করার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে খেলাফত কায়েম করার চেষ্টা করে গেছে। এ দায়িত্বের মধ্যে মানুষের খাদ্য খাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা অন্যতম।

বিশাল এ পৃথিবীতে খেলাফত বা রাষ্ট্রের অজস্র প্রয়োজন ও দাবী দাওয়া মানুষের প্রতিভা এবং তার জীবনকে সচল, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্যে জরুরী যোগ্যতা, উপকারী দ্রব্যাদি ও পর্যায়ক্রমে আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও অভাব অনটন মানুষের জীবনের নিত্যদিনের এক জীবন্ত ইতিহাস। এ সমস্যা কোনো একটি দেশ বা বিশেষ কোনো এক যুগের বা শতাব্দীর ব্যাপারেই যে সত্য তা নয়; বরং সারা পৃথিবীর সব দেশের, সর্বযুগের ও সর্বকালের এ এক অবিসংবাদিত সত্য তথ্য। মহাকালের জানা অজানা ইতিহাসের মধ্যে মানব জাতির সংকট ও সচ্ছলতা, শান্তি সমৃদ্ধি ও ধ্বংসলীলার অসংখ্য ইতিবৃত্তে, যা নিহিত রয়েছে এসব কিছু নিয়েই ইসলামের পদযাত্রা। মানব জীবনের সকল সমস্যা অপনোদন করে তাদের ইহকাল ও পরকালের অবিমিশ্র সুখ শান্তির সন্ধানদান ইসলামের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি, পরিবার সমাজ ও বৃহত্তর মানবতার কল্যাণ বিধান করার জন্যেই যুগে যুগে ও দেশে দেশে আল্লাহর বাছাইকৃত প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন ঘটেছে। মানুষের মধ্যে মজ্জাগতভাবে বর্তমান রয়েছে লোভ লালসা ও তারতম্য করার প্রবণতা, যা তাদের অসম প্রতিযোগিতায় নামায়, তাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য আনে। স্বার্থের এই হানাহানি তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখী করে তোলে। মানুষের হাতে মানুষের জন্যে নেমে আসে লাঞ্ছনা বঞ্চনা, কলহ বিবাদ, সংঘাত, সংকট সমস্যা এবং সর্বোপরি শৃংখলাহীনতার ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তাহীনতার সয়লাব জনজীবনের সর্বত্র বয়ে যায়। যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে থাকা এ সব গ্লানি দূরীভূত করে মানুষে মানুষে দরদ-সহানুভূতি, মায়া মমতা, সহযোগিতা সহমর্মিতার ফল্গুধারা প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে ও দেশে দেশে আগমন ঘটেছে ইসলামের নিশানবর্দারদের, যার চূড়ান্ত রূপ, পরিপূর্ণ ছবি শেষ নবী ও রসূল মোহাম্মদ

(স.)-এর জীবনী ও শিক্ষাতে এবং তাঁর কর্মধারার বাস্তবায়নে ফুটে ওঠেছে। তাই ইসলামের এ শিক্ষায় দেখা যায়, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে বড় হয়েছে সে আরও বড় হতে থাকবে আর যে একবার অভাব অভিযোগের শিকার হয়েছে, সে ধীরে ধীরে নেমেই যেতে থাকবে, জীবনের হৃত আশা ভরসা আর কোনোদিন পার পাবে না— এমনটি হবার নয়; ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবায়নে এ নযির স্থাপিত হয়েছে যে, সমাজের বিত্তবানদের সম্পদের একটি অংশ এমনভাবে বেরিয়ে আসবে যা দ্বারা দরিদ্র জনগণের নিরাপত্তা ও জীবনের স্থিতিশীলতা গড়ে তোলা হবে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ইসলামী সরকার নিজ দায়িত্বে বিত্তবানদের সম্পদের হিসাব নিকাশ করে, তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর অবশিষ্ট বা অতিরিক্ত সম্পদ থেকে শতকরা দুই দশমিক পাঁচ (২.৫) ভাগ যাকাত স্বরূপ নিয়ে নেবে এবং সকল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সংগৃহীত এসব সম্পদ দ্বারা ইসলামী সরকারই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য খাবার থেকে নিয়ে অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেবে। এর ফলে অভাবী লোকদের চিরদিন একইভাবে অভাবের অভিশাপ বহন করতে হবে না; উপরন্তু যাকাত হিসেবে আদায় করা এ দান একটি ফরয এবাদাত হওয়ার কারণে কারও মনে অহংকার বা এহসান প্রদর্শন করার প্রবণতা আসার কোনো সুযোগ নেই, নেই যাকাত গ্রহীতার মনে হীনমন্যতার ব্যাধি পয়দা হওয়ার কোনো আশংকা, আর এর ফলে ধনী গরীব সবাইকে সমান সমান মৌলিক প্রয়োজন মেটানোরও কাছাকাছি আসার সুযোগ দান করা যাবে। ইসলাম ধনী-গরীবের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে যাকাত দান করার ব্যবস্থা চালু করেছে এবং এই যাকাতের মধ্যে তাহারাত বা পবিত্রকরণের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর হুকুমে যাকাত আদায় করা বাধ্যকতামূলক হওয়ায় এ ব্যবস্থা অবশ্যই অন্যতম প্রধান প্রতীকী এবাদাত। শুধু অন্যতম প্রতীকী এবাদাতই নয়, এ এবাদাতের সাথে বান্দার হক জড়িত থাকায় ইসলাম এর গুরুত্ব এতো বেশী দিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনপদ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (যেমন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর আমলে এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছিলো)। এই যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমেই ধনী-গরীবের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর হয়ে এমন এক বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, যা তাদের বিশ্ব মানব সভায় এক অত্যুজ্জ্বল আসন করে দিয়েছে।

ইসলাম মানব জাতির ইতিহাসে যে স্বর্ণ-যুগের সূচনা করেছে এবং মানব সমস্যা সমাধানে ইসলামী ব্যবস্থা যে অবদান রেখেছে, তা একমাত্র হঠকারী ও অন্ধজন ছাড়া যে কোনো বিদগ্ধ ও জ্ঞানপিপাসু জনগোষ্ঠীকে চমৎকৃত করেছে। ইসলাম এই যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার এমন এক সমাধান দিয়েছে, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই।

দেখুন, যাকাত ব্যবস্থা সম্পর্কে আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণমনা ও চোখে পর্দা-পড়া সে হতভাগা ব্যক্তিদের উক্তি, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মর্ম বুঝতে পারেনি, 'আমরা কি খাওয়াব তাদের যাদের চাইলে আল্লাহ নিজেই খাওয়াতে পারেন?' এতোটুকু বলেই তারা থেমে যায়নি; বরং যারা আল্লাহর বিধান চালু করার আহ্বান জানাচ্ছেন তাদেরকেই তারা বিপথগামী বলতে দ্বিধাবোধ করেনি। তারা বলেছে, 'তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত জনতা ছাড়া আর কিছুই নও।'.......... আল্লাহর বিধানের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে তারাই যে প্রকৃতপক্ষে ভুল পথে রয়েছে তা তারা বুঝতে পারছে না, তারা জানতে পারছে না জীবন স্পন্দনের তাৎপর্য কি, তারা উপলব্ধি করতে পারছে না এই স্পন্দনের গুরুত্ব কি, তারা খেয়াল করছে না তাদের জীবনের লক্ষ্য কত মহান, অথচ সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্যে তাদের কতো প্রতিভা ও কতো যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, আর এ সব যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে তাদের অর্থ সম্পদ ও খাদ্য খাবারের কত বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ দেয়া হয়েছে।

ইসলাম এমনই এক ব্যবস্থা দিয়েছে যার মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তার মধ্যে নিহিত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানুষ সাধারণভাবে জানে না তার মধ্যে কত অফুরন্ত সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে রয়েছে, জানে না বিধায় আল্লাহর রাজ্যে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলাম তাকে যথাযথভাবে জানানোর ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের এই গুরুদায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছে। তারপর তার মধ্যে সকল প্রকার মন্দ প্রভাবের অনিষ্ট রোধ করার জন্যে প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে আসছে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কিত আল্লাহর ওয়াদার বিষয়ে তাদের সন্দেহ সংশয়ের ওপর আলোচনা, আরও আলোচনা এসেছে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ধমক সম্পর্কে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষপাত সম্পর্কিত কথা। দেখুন আল্লাহর এরশাদে কি বলা হচ্ছে,

'আর ওরা বলে, কখন আসবে সেই ওয়াদা করা কেয়ামতের দিন? (বলো না জলদি) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।!'

কিন্তু মানুষ ব্যস্ত হচ্ছে বলে ওয়াদা করা সেই ভয়ংকর দিনটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এসে যাবে, এমনটি কখনও হবে না। আর যদি তারা 'আযাব বিলম্বিত হোক' বলে কামনা করে তাতেও তা বিলম্বিত হবে না। অর্থাৎ যা কিছু হবে সবই পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনামাফিক হবে। কোনো অবস্থাতেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে ওয়াদা করা সে কঠিন পরিণতি আসবে না। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে এক সুনির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ই তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে। অবশ্যই আল্লাহর চিরন্তন ও অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হবে, এটাই আল্লাহর হেকমাতের দাবী, এটাই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিশাল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত শৃংখলার প্রধান বৈশিষ্ট্য যা সবার সামনে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে।

কেয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় দৃশ্য

এখন তাদের এ অপ্রিয় প্রশ্নের জওয়াবে শুধু কেয়ামতের কিছু ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে যেন তারা বুঝতে পারে সেখানে কি কঠিন অবস্থা হবে, কিন্তু ঠিক কখন আসবে সেই কঠিন মুহূর্ত তা বলা হচ্ছে না......... (কারণ তাদের অন্তর প্রাণ জানে মোহাম্মদ অবশ্যই নবী এবং তাঁর মুখনিসৃত বাণী অবশ্যই সত্য)! এ জন্যে কেয়ামতের কঠিন অবস্থাসমূহের মধ্য থেকে যেটুকু তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তাতেই তাদের হৃদকম্প শুরু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হায়, দুনিয়ার নানাপ্রকার স্বার্থ; কখনও অর্থের স্বার্থ, কখনও নেতৃত্বের স্বার্থ, আবার কখনও বা ইন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খলতার স্বার্থ, এগুলো এমনই বালাই যা মানুষকে বুঝেও বুঝতে দেয় না। এইভাবেই জেনে বুঝে যারা পার্থিব লাভ ও লোভকে গুরুত্ব দেয় এবং 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য দাও'-এর তালীম গ্রহণ করে, সাময়িক ও স্থায়ী জীবনের পার্থক্য নির্ণয় করে না, তাদের জন্যে অবশ্যই রয়েছে সে বৃশ্চিক সাজা। সে ভয়াবহ দিনের প্রতি বিশ্বাস তাদের অভ্যন্তরে রয়েছে বলেই তাদের সামনে এ ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে।

'দেখবে তারা শুধুমাত্র একটি চিৎকারধ্বনি তাদেরকে পেয়ে বসছে.......আর তৎক্ষণাৎ তারা সবাই হাযির হয়ে যাবে।'

'(মূলত এসব প্রশ্নের মাধ্যমে) এরা যে বিষয়টির জন্যে অপেক্ষা......সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।' (আয়াত ৪৯-৫৩)

'(আজ) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা জিজ্ঞেস করছে, বলো কখন আসবে সেই ওয়াদাকৃত দিবসগুলো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো?'

এর জওয়াবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বলা হচ্ছে, সেদিন এমন এক বিকট শব্দ উত্থিত হবে

যার কারণে সকল প্রাণী বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে এবং এ শব্দের তোড়ে সকল জীবন ও জীবন্ত প্রাণের অবসান ঘটবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা দেখতে পাবে এমন একটি প্রচন্ড শব্দ উত্থিত হচ্ছে, যা তাদের সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে। এমন সময়ে তাদের প্রচন্ড শব্দ পাকড়াও করে বসবে যখন তারা নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকবে। সুতরাং সে অবস্থায় তারা কাউকে উপদেশ দান করা বা নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।'

এ অবস্থা, হঠাৎ করেই তাদের পেয়ে বসবে যখন তারা জীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে নানা প্রকার ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকবে। এই অবস্থায় কিছুতেই তাদের ধারণায় আসবে না যে, এমন একটা কঠিন অবস্থা তাদের ওপর আসতে হতে পারে। এরকম কঠিন অবস্থা পূর্বাহ্ণে আঁচ করতে পারলে হয়তো তারা ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত হতে পারতো। ওরা সবাই যে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায়ই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। সমসাময়িক কাউকে বা পরবর্তী কারও জন্যে কোনো উপদেশ দেয়ার মতো কোনো ক্ষমতা বা সুযোগ কারও থাকবে না, আর নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে কোনো একটি কথাও তারা বলতে পারবে না। ওরা সবাই নিজ নিজ স্থানেই শেষ হয়ে যাবে!

তারপর আসবে সেই মহাভয়ংকর দিন, যেদিন পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, আর অমনি কবরের মধ্য থেকে মাটি ঝেড়ে মুছে ফেলে কবরস্থ ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসবে এবং দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে। ভয় ও জ্ঞানহারা অবস্থায় তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। বলবে–

'কে তুললো আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে?'

তারপর বেহুশ অবস্থা একটু কমে আসলে তারা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারবে এবং জানতে পারবে তাদের প্রকৃত অবস্থা। তখন তারা বলে উঠবে।

'হাঁ, হাঁ এই অবস্থা আসবে বলেই তো মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন এবং অবশ্যই রসূলরা সত্য কথা বলেছিলেন।'

এরপর আবারও একবার এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হবে, গর্জে উঠবে একটিমাত্র প্রচন্ড শব্দ আর অমনি হয়রান পেরেশান হয়ে দ্রুতগতিতে সবাই দৌড়াতে থাকবে, কিন্তু সম্বিতহারা ও দিশাহারা এসব অসংখ্য মানুষ বুঝতে পারবে না কোথায় যাবে, কি করবে। এর অব্যবহিত পরে তাদেরও জ্ঞান ফিরে আসবে। 'অতপর তারা সবাই আমার (আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর) কাছে এসে হাযির হয়ে যাবে ......।' তখন তারা সুশৃংখলার সাথে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সবাই মুহূর্তকালের মধ্যে বিচারার্থে হাযির হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদালতে, আর তখন মহান রব্বুল আলামীনের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের প্রত্যেক দলের দাঁড়ানোর জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং তাদের সবার জন্যে ঘোষণা আসবে,

'আজকের দিনে কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না, আর তোমরা যা কিছু করতে থেকেছ তারই প্রতিদান ছাড়া অন্য কিছু তোমাদের দেয়া হবে না।'

আর এই দ্রুত ফয়সালা দানের সাথে সাথে এই তৃতীয় অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে এবং সেসব সন্দেহবাদী ও দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের সেই ওয়াদা করা দিনে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এরপর অন্যদিকে এগিয়ে আনা হবে মোমেনদের, তাদের হিসাব নেয়া হবে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের হিসাব নেয়ার কাজ শেষ করা হবে। ন্যায্য পাওনা হিসাবে তাদের জান্নাত দেয়া হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই জান্নাতবাসীরা আজকের এই দিনে আনন্দের মাঝে উল্লসিত হয়ে থাকবে, তারা ও তাদের সংগী সংগিনীরা ছায়াঘেরা মহাসম্মানজনক আসনে সমাসীন থাকবে এবং আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে আরামে বসে থাকবে।'

'(সেদিন) অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা মহা আনন্দে .... পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ষিত হোক)।' (আয়াত ৫৫-৫৮)

অর্থাৎ, ওরা ব্যস্ত থাকবে নেয়ামতভরা জান্নাতের মধ্যে, আল্লাহর মহাদান ও পুরস্কার পেয়ে তারা পরম পুলকিত থাকবে। স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা পরিবেশে উপবিষ্ট থেকে তারা মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহমান মধুর বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকবে। আর তারা ও তাদের সংগীরা মহা আরামের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে সেই মহাসম্মানজনক আসনে। সেখানে তাদের জন্যে উপাদেয় ফলমূল থাকবে, সেখানে তাদের জন্যে আরও থাকবে সেসব ভোগ্য সামগ্রী যা তারা চাইতে থাকবে আর তাদের সেসব জিনিসও দেয়া হবে পাওনা হিসাবে যেসব জিনিসের জন্যে তারা দাবী জানাতে থাকবে। আর সকল কিছু স্বাদযুক্ত জিনিসের সাথে তাদের মধ্যে থাকবে জান্নাতের মালিকানা লাভের মহাসম্মান। অতপর তাদের রবের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হতে থাকবে 'শান্তি শান্তি।' এইভাবে তাদের জন্যে বিশেষভাবে বর্ষণ করা হবে শান্তিবাণী, অর্থাৎ তাদের প্রদত্ত অভ্যর্থনা জানানোর ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হবে 'শান্তি শান্তি।' মহাদয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হবে তাদের এই মধুময় অমীয় বাণী।

অপরদের অবস্থা হবে এই যে, তাদের হিসাব নিকাশের অবস্থানটি সহজে শেষ হয়ে যাবে না; বরং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা তিরস্কার অবিরতভাবে চলতেই থাকবে। বলা হবে,

'হে অপরাধীরা, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও.........।' (আয়াত ৫৯-৬৪)

এখানে অপরাধীদের লাঞ্ছিত অপমানিত করা হয়েছে। মোমেনদের দল থেকে তাদের পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্যে বলা হয়েছে।

এই অপরাধীদের পরের আয়াতে 'আদমের সন্তান' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার উদ্দেশে, অর্থাৎ তোমরা আদমের সন্তান হয়ে সেই শয়তানেরই আনুগত্য করছো যে তোমাদের পিতা আদমকে চক্রান্ত করে বের করে এনেছিলো। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার আনুগত্য অনুসরণ না করার জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম। তারপরও তোমরা সেই অভিশপ্ত শয়তানের কথাই মেনে চলছো। আমি তোমাদের একমাত্র আমার এবাদাত বন্দেগী করতে এবং আমার নির্দেশিত সত্য পথে চলতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা করনি এবং তোমাদের প্রধান শত্রুর ব্যাপারেও তোমরা সতর্ক হওনি। তাহলে তোমরা কি নির্বোধ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের শাস্তির বিষয়টিও জেনে নাও। তোমাদের শাস্তি হবে জাহান্নামের আগুন।

'এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছে। তোমাদের কুফরীর কারণে আজ এতে প্রবেশ করো।' (আয়াত ৬৩-৬৪)

ওদের মর্মান্তিক শাস্তির দৃশ্যের এখানেই শেষ নয়। সামনে আরও ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর দৃশ্য আসছে। বলা হচ্ছে,

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।' (আয়াত ৬৫)

সেভাবেই তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। তাদের প্রতিটি অংগ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাদের গোটা অস্তিত্ব এক এক করে একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পরস্পরকে দোষারোপ করবে, অস্বীকার করবে। প্রতিটি অংগ পৃথক পৃথকভাবে নিজ প্রভুর সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। কি অদ্ভুত, কি ভয়াবহ এই দৃশ্য! এর কল্পনা করতে গিয়েই মানুষের মন আতংকিত হয়ে পড়ে।

এই অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের বর্ণনা উপরের আয়াতে এভাবেই শেষ হয়েছে। দৃশ্যটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অপরাধীদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তাদের হাত কথা বলছে

এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিচ্ছে। অবশ্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সাথে অন্য ব্যবহারও করতে পারতেন, তাদের ওপর ভিন্ন ধরনের শাস্তিও প্রয়োগ করতে পারতেন। নিচের আয়াতে সে জাতীয় দুটো শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম।' (আয়াত ৬৬-৬৭)

ওপরের আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা কেবল শাস্তিই নয়; বরং তা এক ধরনের বিদ্রূপ এবং উপহাসও। সত্যকে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং যারা উপহাস করে বলতো, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, সেই ওয়াদা করা আযাব কখন আসবে' তাদের এখন উপহাস করা হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্যে আমরা অপরাধীদের দৃষ্টিশক্তি রহিত অবস্থায় দেখতে পাই। এই অবস্থায়ও তারা জান্নাতের পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে ভিড় জমাবে, হুড়োহুড়ি করবে, কিন্তু বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, অন্ধের ন্যায় হাতড়াতে থাকবে। কারণ, তারা তো কিছুই দেখতে পারবে না। তাদের দৃষ্টিশক্তি তো ছিনিয়ে নেয়া হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা এসব অপরাধীদের নিজ নিজ জায়গায় পাথরের মূর্তির ন্যায় অনড় ও স্থবির দেখতে পাই। নড়াচড়া করার মতো শক্তি তাদের নেই। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও তারা দৌড়াদৌড়ি করেছে, হুড়োহুড়ি করেছে।

দুটো দৃশ্যেই এদের খেলনা বা পুতুলের মতো মনে হবে, তাদের এ জাতীয় অবস্থা হাসি তামাশার সৃষ্টি করবে। অথচ এরাই এককালে আল্লাহর ওয়াদা করা আযাবের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মস্করায় মেতে ওঠতো।

ওপরে যে অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা ঘটবে সেই চরম মুহূর্তটিতে, যার আগমনের জন্যে ওরা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু ওদের যদি পৃথিবীর বুকেই দীর্ঘ আয়ু দিয়ে টিকিয়ে রাখা হতো এবং নির্ধারিত চরম মুহূর্তটি কিছু কালের জন্যে স্থগিত রাখা হতো, তাহলে ওরা আর এক আপদের সম্মুখীন হতো যে আপদের চেয়ে তাদের মৃত্যুই ভালো। কারণ, এই দীর্ঘ আয়ুর কারণে ওদের চরম বার্ধক্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে এবং দৈহিক শক্তি ও বোধশক্তি হারিয়ে বসতে হবে। সে প্রসংগে বলা হচ্ছে,

'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? (আয়াত ৬৮)

শৈশবের অবস্থায় ফিরিয়ে যাওয়ার নামই হচ্ছে বার্ধক্য। যদিও বৃদ্ধদের মাঝে শিশুদের সেই লাবণ্য, কোমলতা ও নিষ্পাপ আচরণ থাকে না। তবুও তাদের অনেক আচরণই শিশুসুলভ হয়ে থাকে। বয়সের ভারে তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ফলে অনেক জানা কথাই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। দৈহিক শক্তিও লোপ পেয়ে যায়। চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। ধারণ ক্ষমতাও স্তিমিত হয়ে আসে। শিশুদের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই তাদেরও পেয়ে বসে। তবে পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, শিশুদের আধো আধো বোলও শুনতে ভালো লাগে, ওদের বোকামিও মানুষের মনে আনন্দ দেয়, কিন্তু বৃদ্ধ লোকদের ছেলেমি কেউ ভালো চোখে দেখে না, তাদের বোকামিও কেউ সহজে মেনে নিতে চায় না। হয়তো অনেকে করুণাবশত তাদের এসব আচরণ মেনে নেয়, কিন্তু অন্যরা এগুলো নিয়ে রীতিমত হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কঠিন শাস্তি এবং বার্ধক্যজনিত শাস্তি এই দুই ধরনের শাস্তিই কাফের মোশরেকদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যাদের ভাগ্যে ঈমান জুটেনি, যাদের আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের গৌরবে ভূষিত করেননি।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝ لِّيُنْذِرَ

مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ

مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ

وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ وَاتَّخَذُوْا

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ

جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا

يُعْلِنُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

৬৯. (তোমরা এও জেনে রেখো,) আমি এ (রসূল)-কে কাব্য (রচনা) শেখাইনি এবং এটা তাঁর (নবী মর্যাদার) পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (আর তাঁর আনীত গ্রন্থ) তা তো হচ্ছে একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন, ৭০. যাতে করে সে তা দ্বারা যে (অন্তর) জীবিত তাকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং (যা দ্বারা) কাফেরদের ওপর শাস্তির ঘোষণা সাব্যস্ত হয়ে যায়। ৭১. এরা কি লক্ষ্য করে না, আমার নিজের হাত দিয়ে বানানো জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আমি তাদের (কল্যাণের) জন্যে পশু পয়দা করেছি, আর (এখন) তারা (নাকি) এগুলোর মালিক হয়ে বসেছে! ৭২. (অথচ) আমি এগুলো তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, এর কিছু হচ্ছে তাদের বাহন আর কিছু এমন যার (গোশত) থেকে তারা খাদ্য গ্রহণ করে। ৭৩. তাদের জন্যে তার মধ্যে (আরো) উপকারিতা রয়েছে, রয়েছে পানীয় বস্তুও; তবুও কি তারা (তার) শোকর আদায় করে না (যিনি তাদের এগুলো দান করেছেন)! ৭৪. (এ সত্ত্বেও) তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের মাবুদ বানায়, (তাও) এ আশায়, (তাদের পক্ষ থেকে) এদের সাহায্য করা হবে! ৭৫. (অথচ) তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কেয়ামতের দিন তাদের) সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্নামে এসে) জড়ো হবে। ৭৬. (অতএব, হে নবী,) এদের (এসব জাহেলী) কথাবার্তা যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে। অবশ্যই আমি জানি যা কিছু এরা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়। ৭৭. এ মানুষগুলো কি দেখে না, আমি তাদের একটি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছি, অথচ (সৃষ্টি হতে না হতেই ক্ষুদ্র কীটের) সে (মানুষটিই আমার সৃষ্টির ব্যাপারে) খোলাখুলি বিতন্ডাকারী হয়ে পড়লো! ৭৮. সে আমার (সৃষ্টি ক্ষমতা) সম্পর্কে (নানা) কথা রচনা (করতে শুরু) করলো (এবং এক সময়) সে (লোকটি) তার নিজ সৃষ্টি (কৌশলই) ভুলে গেলো; সে বললো, কে (মানুষের এ) হাড় পুনরায় জীবিত করবে যখন তা পচে গলে যাবে!

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي

جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ

وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৭৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হ্যাঁ, তাতে প্রাণ সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি প্রথম বার এতে জীবন দিয়েছিলেন; এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি (কৌশল) সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, ৮০. তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ (সতেজ) বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন (প্রক্রিয়া সম্পন্ন) করেছেন এবং তা দ্বারাই তোমরা (আজ) আগুন জ্বালাচ্ছো। ৮১. যিনি নিজের ক্ষমতাবলে (একবার) আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (পুনরায়) তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? (হ্যাঁ) নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ। ৮২. তিনি যখন কিছু একটা (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন 'হও'– অতপর তা সাথে সাথে (তৈরী) হয়ে যায়। ৮৩. অতএব, পবিত্র ও মহান সে আল্লাহ তায়ালা, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক এবং তাঁর কাছেই (একদিন) তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তাফসীর

আয়াত ৬৯-৮৩

'আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয় ...।' (আয়াত ৬৯)

সূরার এই শেষ অংশটিতে বেশ কয়টি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে, সেগুলো আলোচ্য সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। যেমন ওহী কি এবং এর প্রকৃতি কি? মাবুদ বা উপাস্যের গুণাবলী কি? একত্ববাদ বা তাওহীদের দাবী কি? শেষ বিচারের দিনে হাশর-নশর কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়। বিষয়গুলো অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও গভীর ব্যঞ্জনাময় ভংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে এই সত্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে যে, গোটা সৃষ্টি জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে একটি অদৃশ্য শক্তিশালী হাত কাজ করছে। সেই হাতটির প্রতিই ইংগিত করে সূরার শেষে বলা হয়েছে, 'অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।'

অর্থাৎ এই নিপুণ ও শক্তিধর হাতই মানব জাতির জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করে তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছে। এই হাতই শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই হাতই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া হাড়গুলোর মাঝে পুনরায় জীবন সঞ্চার করবে, যেমনটি প্রথম বার করেছিলো। এই

হাতই সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপন্ন করেছে। এই হাতই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে গোটা সৃষ্টিজগতের মালিকানা এই হাতেই ন্যস্ত হবে। আয়াতের শেষ বক্তব্যে এই সত্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ওহী সম্পর্কে কাফেরদের মিথ্যা প্রচারণার অপনোদন

'আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি..............................। (আয়াত ৬৯)

আলোচ্য সূরার গোড়াতে ওহীর প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিলো,

'নিশ্চয়ই তুমি প্রেরিত রসূলদের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। যাতে আপনি...................। (আয়াত ৩-৬)

এখন এই ওহী সম্পর্কিত একটি গুজব ও মিথ্যা প্রচারণার উত্তর দেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করতো এবং প্রচার করে বেড়াতো, রসূলুল্লাহ (স.) হচ্ছেন একজন কবি এবং তিনি কোরআনের বরাত দিয়ে যা কিছু বলেন ও শুনান সেগুলো কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ কোরায়শ বংশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিষয়টি ভালো করেই জানতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে যে বাণী আসছে তার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের ব্যবহৃত ভাষার সাথে এর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া কোরআনের বাণী আর কবিতার ভাষার মধ্যকার পার্থক্য বুঝার মতো জ্ঞান তাদের ছিলো না এমন নয়। কিন্তু তা সত্তেও সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি দল মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর নতুন দ্বীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। এই প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে তারা পবিত্র কোরআনের ছন্দময় ও আবেগপূর্ণ বর্ণনাভংগি ব্যবহার করে। কারণ, এর ফলে জনগণকে বিভ্রান্তির সহজ শিকারে পরিণত করা সম্ভব হতো। তাদের পক্ষে তখন কোরআনের ভাষা ও কাব্যের ভাষার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যেতো।

এখানে আল্লাহ তায়ালা অস্বীকার করে বলছেন যে, তিনি তাঁর রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেননি, আর তিনি যদি শিক্ষা নাই দিয়ে থাকেন তা হলে তার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যা জানান, ততোটুকুই মানুষ জানতে পারে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কবিতা নবী-রসূলদের জন্যে শোভা পায় না। কারণ, কাব্যের নিয়ম নীতির সাথে নবুওতের নিয়ম নীতির কোনো মিল নেই। কাব্য হচ্ছে আবেগনির্ভর। এর ভাষাও হয় আবেগধর্মী, আর এটা জানা কথা, আবেগ পরিবর্তনশীল, প্রতি মুহূর্তে এর ওঠানামা হয়। অপরদিকে নবুওত হচ্ছে ওহীনির্ভর, আর এই ওহী হচ্ছে স্থির নিয়ম-নীতি ও সরল-সোজা পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর চিরন্তন বিধান যা গোটা সৃষ্টিজগত নিয়ন্ত্রণ করছে। সাময়িক ভাবাবেগের কারণে এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। অপরদিকে কাব্য আবেগ অনুভূতির সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এবং কোনো এক অবস্থায় টিকে থাকে না।

তাছাড়া নবুওত হচ্ছে আল্লাহর সাথে স্থায়ী যোগাযোগের নাম, ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি বাণীপ্রাপ্তির নাম এবং জীবনকে আল্লাহমুখী করার অবিরাম প্রচেষ্টার নাম।

অপরদিকে কাব্যের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে নান্দনিকতা ও পরিপূর্ণতার প্রতি মানবীয় আকাংখার বহিপ্রকাশ, তার মাঝে থাকে মানবীয় দুর্বলতা এবং চিন্তা চেতনার সীমাবদ্ধতা, কিন্তু এই কাব্যই যখন নিচু স্তরে নেমে আসে তখন তা পর্যবসিত হয় নিছক আবেগ ও কামনায়, যাতে থাকে দেহের উল্লাস ও রক্ত মাংসের উদ্দামতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নবুওত ও কাব্য হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো জিনিস। উচ্চমার্গীয় কাব্যকে বলতে পারি ধূলির ধরা হতে উত্থিত অনুরাগ ও

বাসনা। অপরদিকে নবুওতকে বলতে পারি উর্ধ্বলোক হতে প্রেরিত হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। বলা হয়েছে, 'এটা এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন বৈ কিছু নয়, ' (আয়াত ৬৯)

এখানে একই বস্তুর জন্যে দুটো বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে উপদেশ আর অপরটি হচ্ছে কোরআন। অর্থাৎ কার্যকারিতার দিক থেকে এটি উপদেশ আর তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দিক থেকে কোরআন। উপদেশ বা স্মরণ হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার আর তেলাওয়াত বা আবৃত্তি হচ্ছে জিহ্বার ব্যাপার। এই মহাগ্রন্থটি যে বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা হলো,

'যেন তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যেন কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।' (আয়াত ৬০)

পবিত্র কোরআন এখানে জীবনের বিপরীতে কুফর শব্দের উল্লেখ করে এ কথা বুঝাতে চায় যে, কুফর হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর। অপরদিকে ঈমান হচ্ছে জীবন। এরপর এই মহাগ্রন্থ রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি কেন অবতীর্ণ করা হলো, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে তিনি জীবনীশক্তির অধিকারী লোকদের সতর্ক করবেন। কারণ, জীবনীশক্তির অধিকারী লোকেরাই কেবল কোরআনের হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হতে পারবে এবং তাদের সতর্ক করলে কাজ হবে। আর যারা আল্লাহদ্রোহী ও কাফের তারা তো মৃত। কাজেই সতর্ককারীর কথা তাদের কানে পৌঁছবে না; বরং তাদের ক্ষেত্রে কোরআনের বাণী হচ্ছে প্রাপ্য শাস্তির ঘোষণাপত্র। এর মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য শাস্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়, প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কাউকে কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন তার কাছে ঐশী বাণী পৌঁছার পরও সে জেনে শুনেই তা অস্বীকার করে। ফলে তার কাছে আর কোনো যুক্তি থাকে না, কোনো ওযর আপত্তি থাকে না। আর তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংস করে দেন।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীকে জানাতে চান যে, কোরআনের প্রশ্নে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল এর আহ্বানে সাড়া দেয়; সুতরাং তারা জীবনীশক্তির অধিকারী। আর দ্বিতীয় দল এর আহ্বানে সাড়া দেয় না; সুতরাং তারা জীবনীশক্তি থেকে বঞ্চিত, তারা মৃত। এই দলটির জানা উচিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা চূড়ান্ত; আল্লাহর আযাব তাদের ক্ষেত্রে অবধারিত।

এরপর একক উপাস্যের বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর প্রসংগও এসেছে, যাদের অসংখ্য নেয়ামত দান করার পরও তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বলা হয়েছে,

'তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি।........... (আয়াত ৭১-৭৬)

তারা কি দেখে না? কারণ এখানে সব কিছুই তো তাদের চোখের সামনে রয়েছে। কোনো কিছু তো অদৃশ্য নেই, নাগালের বাইরে নেই এবং এমন অস্পষ্ট দুর্বোধ্যও নয় যে, তা বুঝার জন্যে চিন্তা করতে হবে, মাথা ঘামাতে হবে। এই যে চতুষ্পদ জন্তু, এগুলো আল্লাহ তায়ালাই তো তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন, তাদের এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলো নিজেদের বাহন হিসেবে ব্যবহারে, এগুলোর দুধ পান করে এবং এগুলো দ্বারা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়। এই সবই তো আল্লাহরই কুদরত, তাঁরই কর্ম, তাঁরই কৌশল। আর এই কুদরত ও কৌশলের ফলেই তিনি মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে দুটো ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা, আর চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন

মানুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে তার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর যোগ্যতা ও মানসিকতা। এ সবের কোনো কিছুই করার ক্ষমতা মানুষের মাঝে নেই। কারণ, গোটা মানব জাতি একত্রিত হয়েও একটি মাছি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি মাছিকে নিয়ন্ত্রণ করার বা বশে আনার ক্ষমতাও তাদের নেই, যদি মাছির মাঝে সেই বৈশিষ্ট্য ও গুণ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি না করেন। এতো সবের পরেও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

মানুষ যখন এ সব বিষয় পবিত্র কোরআনের আলোকে এবং এই বিশেষ দৃষ্টিভংগিতে দেখার চেষ্টা করে, তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করতে পারে যে, সে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের মাঝে ডুবে আছে, তার আশপাশের প্রতিটি বস্তুর মাঝে এই নেয়ামতের পরিচয় সে দেখতে পাবে। যে মুহূর্তে সে কোনো সওয়ারীর ওপর আরোহণ করবে, অথবা এক টুকরো গোশ্ত মুখে তুলে নেবে, অথবা এক চুমুক দুধ পান করবে, অথবা এক টুকরো মাখন অথবা পনির খাবে, অথবা রেশমী বা পশমী কোনো কাপড় পরবে, সেই মুহূর্তেই তার মনের মাঝে এক বিশেষ অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করবে, যে অনুভূতির মাঝে রয়েছে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর রহমত ও নেয়ামতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই অনুভূতি আরও গভীর হবে যখন সে তার আশপাশের বস্তুগুলোর দিকে তার দৃষ্টি ফেরাবে এবং এই বিশাল জগতের কোনো জীবন্ত অথবা জড় বস্তু ব্যবহার করবে। শুধু তাই নয়; বরং সে আজীবন আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করবে এবং দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করবে।

কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ! আল্লাহর এতো সব নেয়ামত ভোগ করার পরও এদের অনেকেই দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে। তাদেরকেই আল্লাহর পরিবর্তে মাবুদ মনে করে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করে নিয়েছে যাতে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে। (আয়াত ৭৪-৭৫)

পৌত্তলিকতার বিবিধ রূপ

অতীতে কোনো মূর্তি বা প্রতিমা অথবা কোনো বৃক্ষ বা কোনো গ্রহ বা কোনো ফেরেশতা বা জ্বিন জাতির পূজা-অর্চনা করা হতো। পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব এখনও পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায়, কিন্তু যারা এসবের পূজা-অর্চানা করে না তারাও কিন্তু পুরোপুরি তাওহীদবাদী হতে পারছে না। কারণ এদের অনেকেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো শক্তির ওপর আস্থা রাখে, বিশ্বাস রাখে। তারা গায়রুল্লাহর ওপর ভরসা করে। এগুলোও শেরেক। স্থান কালভেদে শেরেকেরও পরিবর্তন ঘটে।

অতীতে মানুষ নিজেরাই কাল্পনিক দেব দেবীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করতো। অর্থাৎ তারা নিজেরাই এ সবের রক্ষক ছিলো, প্রহরী ছিলো। সে দিকে ইংগিত করেই বলা হয়েছে, তাদের এগুলোর বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে, কি হাস্যকর ব্যাপার! কি নীচুতা ও দীনতা। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ বাহ্যিক দিক থেকে এই নীচুতার উর্ধ্বে ওঠলেও প্রকৃতপক্ষে তারা এখনও অতীতকালের কাল্পনিক দেব দেবীর পূজা আর্চনার স্তরেই পড়ে রয়েছে। যারা বর্তমান যুগের স্বৈরাচার ও যুলুমবাজ শাসকগোষ্ঠীকে দেবতার পর্যায়ে মনে করে তারা মূর্তিপূজকদের স্তর থেকে খুব বেশী উর্ধ্বে নয়। কারণ, এরাও স্বৈরাচারদের রক্ষক ও প্রহরী এবং একই সাথে তাদের পূজারীও।

মোটকথা পৌত্তলিকতা একাধিক রূপে প্রকাশ পায়। তাওহীদের বিশ্বাসে যখনই কোনো বিশৃংখলা দেখা দেবে তখনই বুঝতে হবে, পৌত্তলিকতার আবির্ভাব ঘটেছে। এই আবির্ভাব কখনও

শেরেকের আকারে হয় আবার কখনও জাহেলিয়াতের আকারে হয়। তাই নির্ভেজাল ও খাঁটি তাওহীদের বিশ্বাস ব্যতীত মানবতার মুক্তি নেই, রক্ষা নেই। এই বিশ্বাসের ধারক বাহক হয়ে একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত বন্দেগী করতে হবে, একমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করতে হবে, একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করতে হবে, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার জন্যে একমাত্র তাঁর সামনেই মাথা নত করতে হবে।

পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, 'অতএব তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে.......... ।' (আয়াত ৭৬)

এই আয়াতে রসূলকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। যারা গায়রুল্লাহকে মাবুদ মনে করে, যারা আল্লাহর শোক্র আদায় করে না এবং যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তাদের অসৎ আচরণ ও কথাবার্তায় রসূল যেন মনোক্ষুণ্ন না হন, সে জন্যে তাঁকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, ওদের সব কিছুই আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত। ওরা যে সব ফন্দি-ফিকির করে, যেসব চক্রান্ত করে তা সবই আল্লাহর চোখের সামনে রয়েছে। কাজেই ওরা রসূলের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। শক্তিধর মহান আল্লাহ ওদের ঘেরাও করে রেখেছেন। যখন মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহদ্রোহীদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহর চোখের সামনে রয়েছে, তাঁর হাতের মুঠোর ভেতরে রয়েছে, তখন সে কোনো কিছুকেই ভয় করে না। আর এভাবেই আপদে বিপদে ও কঠিন মুহূর্তে মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পায়। পরবর্তী আয়াতে শেষ বিচারের দিনে পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান কিভাবে ঘটবে এবং তা কতটুকু যুক্তিসংগত, সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে, অতপর তখনই সে হয়ে গেলো প্রকাশ্য বাক বিতন্ডাকারী। .... ।' (আয়াত ৭৭-৮২)

মানুষকে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা করার আহবান

এখানে প্রথমেই মানুষকে তার নিজের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। কিভাবে তার উৎপত্তি হলো, কি ভাবে তার বিবর্তন ঘটলো, এসব বিষয় তার জীবনের এক জ্বলন্ত বস্তবতা। এই বাস্তবতা মানুষ তার জীবনে অহরহ প্রত্যক্ষ করছে, অনুভব করছে, কিন্তু এর তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ হচ্ছে না। সে এর দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করছে না যে, যে আল্লাহ তাকে জীবন দান করেছেন তিনিই মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাকে হাশরের ময়দানে এনে দাঁড় করাবেন, এটা সেই মহান আল্লাহরই ওয়াদা। বলা হয়েছে, 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে?'

যে বীর্যকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের মূল বলে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে সেই বীর্যের প্রকৃত রূপটা কি? নিসন্দেহে এটা হচ্ছে এক ফোঁটা না-পাক তরল পদার্থ। সাধারণত এর কোনো চাহিদা নেই, কোনো মূল্য নেই। এর এক একটি ফোঁটার মাঝে থাকে হাজার হাজার কোষ। এই হাজার হাজার কোষের মধ্য থেকে মাত্র একটি কোষ দ্বারা ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। আর এই ভ্রূণই পর্যায়ক্রমে মানুষের রূপ ধারণ করে। অথচ এই মানুষই কিন্তু সৃষ্টির সাথে সাথে স্বয়ং তার স্রষ্টার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তাঁর কাছেই তার অস্তিত্বের দলীল প্রমাণ দাবী করে।

বলাবাহুল্য আল্লাহর সৃজনশীল শক্তিই এই নিকৃষ্ট তরল পদার্থ থেকে সেই প্রকাশ্য বিতর্ককারীকে সৃষ্টি করছে। কি বিরাট ব্যবধান তার উৎপত্তি ও শেষ পরিণতির মাঝে! অথচ সে এই সৃজনশীল শক্তিকেই বিলুপ্তি ও ধ্বংসের পর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান করার ব্যাপারে অক্ষম বলে মনে করে। ওদের বক্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায় ....।' (আয়াত ৭৮-৭৯)

কি সহজ ও স্বাভাবিক যুক্তি! কি চাক্ষুষ ও বাস্তব প্রমাণ! মানুষ কি মনে করে, পচা গলা ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গুলোর তুলনায় এই এক ফোঁটা বীর্যের মাঝে খুব বেশী কিছু শক্তি, সম্ভাবনা বা মূল্য রয়েছে? সে বীর্য থেকেই কি মানুষের সৃষ্টি হয়নি? এই বীর্যই কি তার প্রথম উৎপত্তির কারণ নয়? যে মহান সত্ত্বা এই এক ফোঁটা বীর্যকে মানুষে রূপান্তরিত করেছেন এবং তাকে প্রকাশ্য বিতর্ককারী রূপে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্ত্বার কি ক্ষমতা নেই, পচা গলা হাড়ের মাঝে পুনরায় জীবন সঞ্চার করার এবং পূর্ণাংগ জীবে পরিণত করার? নিশ্চয়ই আছে। আর এটা এতোই সহজ ও বাস্তব যা প্রশ্নাতীত। এর পরও কেন এতোসব বিতর্ক? এই বিতর্কের জবাবে বলা হচ্ছে,

'বলো, যিনি প্রথম বার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন, তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।' (আয়াত ৭৯)

আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে, যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন, তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।' (আয়াত ৮০)

আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর। মানুষ প্রতিদিন এই বিস্ময়কর বিষয়টির সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু সেটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখছে না। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার যে, কাঁচা ও তরতাজা গাছগুলোর পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। আবার সেই গাছগুলোই সেই আগুনের ইন্ধনে পরিণত হয়ে পড়ে। গভীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বৃক্ষ-তরু-লতা সৌরশক্তি থেকে তাপ শুষে নিয়ে তা জমা করে রাখে। পরবর্তীতে যখন গাছগুলোর মাঝে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তখন তা থেকে আগুন উৎপন্ন হয়, ঠিক যেমন জ্বালানোর ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। অথচ গাছগুলো থাকে একদম কাঁচা ও তরতাজা। এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বিষয়টিকে মানুষের কাছে আরও সুস্পষ্ট এবং আরও জাজ্বল্যমান সত্যরূপে তুলে ধরেছে। বৃক্ষ-তরুলতার মাঝে এই যে দাহ্য ক্ষমতা তা মহান সৃষ্টিকর্তার অপার কুদরতেরই বাস্তব নিদর্শন। তিনি বস্তুনিচয়কে কেবল সৃষ্টিই করেননি; বরং সেগুলোকে স্বধর্মে পরিচালিতও করেছেন, কিন্তু আমরা বস্তুজগতকে এই খোলা দৃষ্টিভংগি নিয়ে দেখি না, এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করি না, আর সে কারণেই এর বিস্ময়কর রহস্যও আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয় না এবং জগত স্রষ্টার সন্ধানও আমরা পাই না, কিন্তু আমরা যদি খোলা হৃদয়-মন নিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যেতাম তাহলে এই প্রকৃতিই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দিতো না জানা অনেক তথ্য ও রহস্য এবং আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে পারতাম প্রকৃতির নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা ও গুণ কীর্তন।

পরবর্তী আয়াতে গোটা মানব জাতির সামনে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে এবং জন্ম ও পুনর্জন্মের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।' (আয়াত ৮১)

ইহজগত ও উর্ধ্বজগত্ হচ্ছে এক বিস্ময়কর জগত বিশাল জগত, এবং রহস্যময় জগত। এই যে পৃথিবী, যার বুকে আমরা বাস করছি এবং আমাদের সাথে আরও কোটি কোটি প্রাণী বাস করছে, এর আয়তন সম্পর্কে আমরা কতোটুকু জানতে পারি? এর প্রকৃতি সম্পর্কে কতোটুকু জানতে পেরেছি? এ পর্যন্ত যতোটুকু জানতে পেরেছি তা নিতান্তই নগণ্য। এই পৃথিবীটা হচ্ছে সূর্যের অধীনস্থ একটি ছোট্ট গ্রহ মাত্র। সূর্যের আলো ও তাপের মাঝেই টিকে আছে পৃথিবী নামক

আমাদের এই গ্রহটি। আর এই সূর্যটা কি? সূর্যটা হচ্ছে একটিমাত্র ছায়াপথের অধীন দশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র, সে নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নিকটবর্তী জগত। এই ছায়াপথ ছাড়াও মহাশূন্যে আরও অনেক ছায়াপথের অস্তিত্ব রয়েছে। জ্যোতির্বিদরা তাদের সীমিত দূরত্বের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ পর্যন্ত দশ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন। এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের ছায়াপথ এবং তার নিকটবর্তী ছায়াপথের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় সাত শত পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ (এক আলোকবর্ষ হচ্ছে ছাব্বিশ বিলিয়ন মাইলের সমান)। এ ছাড়াও বিশাল বিশাল বলয় দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে এই বিশাল সৌরজগতের এই সামান্য অংশই ধরা পড়েছে। এই অগণিত সৌরজগতের প্রতিটির রয়েছে নিজস্ব কক্ষপথ, যাকে কেন্দ্র করে এগুলো আবর্তিত হচ্ছে। আবার এদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে অন্যান্য গ্রহ। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। এগুলো অবিরামভাবে ঘুরে চলেছে, ছুটে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই, বিরতি নেই এবং কোনো বিশৃংখলা নেই, গোলযোগ নেই। যদি তাই হতো, তাহলে এই দৃশ্যমান জগত ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সংঘর্ষ বেধে যেতো মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর মাঝে।

এই যে মহাশূন্য যেখানে ছোট ছোট কণার মতো কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ভেসে বেড়াচ্ছে, এর চিত্রায়ন এবং কল্পনাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এর বিশালতার কথা চিন্তা করতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

যে মহান সত্ত্বা এই বিশাল জগত সৃষ্টি করে রেখেছেন তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন না? এই বিশাল জগতের তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব কতোটুকু? নিশ্চয়ই তিনি মহান স্রষ্টা, মহান জ্ঞানী। তিনি সব কিছুই পারেন। তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। ছোট বড় সব কিছুই তাঁর আওতাধীন। কাজেই কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয় না, কোনো কষ্ট করতে হয় না। কারণ, তিনি কেবল 'হও' নির্দেশ করতেই সব কিছু হয়ে যায়। আয়াতে বলা হয়েছে,

'তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' আর তখনই তা হয়ে যায়।' (আয়াত ৮২)

এই কোনো 'কিছু' বলতে আকাশও হতে পারে অথবা পৃথিবীও হতে পারে। তেমনিভাবে একটি মশাও হতে পারে এবং পিঁপড়াও হতে পারে। মোটকথা, আল্লাহর নির্দেশ 'হও',-এর ক্ষেত্রে সব কিছুই সমান। আল্লাহর নির্দেশের সামনে, আল্লাহর উচ্ছার সামনে কঠিন বলতে কিছু নেই, সহজ বলতেও কিছু নেই, কাছে বলতে কিছু নেই এবং দূরে বলতেও কিছু নেই। কোনো কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর কাম্য হলে তার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুঝানোর জন্যে তার সীমিত জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির উপযোগী পন্থাই গ্রহণ করে থাকেন।

আলোচ্য সূরার শেষ পর্যায়ে এসে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজগতের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (আয়াত ৮৩)

আয়াতে 'রাজত্ব' শব্দ ব্যবহার করে গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যে মহান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত, সেই কঠিন বাস্তব সত্যটির প্রতিই এখানে ইংগিত করা হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, এই শক্তিধর ও ক্ষমতাধর সত্ত্বার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস সাফফাত

আয়াত ১৮২ রুকু ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨ الْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝١٢ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۝١٣ وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً

১. শপথ (সে ফেরেশতাদের) যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ২. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা সজোরে ধমক দেয়, ৩. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা (সদা আল্লাহর) যেকের তেলাওয়াত করে, ৪. অবশ্যই তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন; ৫. তিনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও মালিক, (তিনি আরো) মালিক (সূর্যোদয়ের স্থান) পূর্বাচলের; ৬. আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি; ৭. (তাকে) আমি হেফাযত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে, ৮. ফলে তারা উর্ধ্বজগতের (কথাবার্তার) কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়, ৯. এই তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ) নয়– তাদের জন্যে অবিরাম শাস্তিও রয়েছে, ১০. (তা সত্ত্বেও) যদি কোনো (শয়তান) গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে। ১১. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন– না (আসমান যমীনসহ) অন্য সব কিছু– যা আমি পয়দা করেছি (তার সৃষ্টি বেশী কঠিন); এ (মানুষ)-দের তো আমি (সামান্য কতোটুকু) আঠাল মাটি দিয়ে পয়দা করেছি। ১২. (হে নবী,) তুমি (এদের কথায়) বিস্ময়বোধ করছো, অথচ (তোমার কথা নিয়েই) ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে, ১৩. এদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা (তা) স্মরণ করে না, ১৪. (আবার) কোনো নিদর্শন দেখলে (তা নিয়ে)

يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ

دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا

هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا

تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ

উপহাস করে, ১৫. তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, ১৬. (তারা প্রশ্ন তোলে, এ আবার কেমন কথা,) আমরা মরে গিয়ে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (পুনরায়) জীবিত করা হবে? ১৭. আমাদের পিতৃপুরুষদেরও (এভাবে ওঠানো হবে)? ১৮. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, হ্যাঁ (অবশ্যই, সেদিন) তোমরা লাঞ্ছিত হবে, ১৯. যখন (কেয়ামত) হবে, (তখন) একটি মাত্র প্রচন্ড গর্জন হবে– সাথে সাথেই এরা (সবকিছু) দেখতে পাবে। ২০. (যারা অস্বীকার করেছিলো) তারা (সেদিন এটা দেখে) বলবে, পোড়া কপাল আমাদের, এটাই তো হচ্ছে (সেই) প্রতিদান পাওয়ার দিন! ২১. (তাদের বলা হবে) হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা (নিরন্তর) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

রুকু ২

২২. (ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,) তোমরা যালেমদের এবং তাদের সংগী-সংগিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, তাদের (দোসরদের)-ও, যারা তাদের গোলামী করতো (এদের সবাইকে এক জায়গায় একত্র করো), ২৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাবুদ বানাতো) তাদেরও (এক সাথে) জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও। ২৪. হ্যাঁ, (সেখানে পাঠাবার আগে) তাদের (এখানে) একটুখানি দাঁড় করাও, তারা অবশ্যই (আজ) জিজ্ঞাসিত হবে, ২৫. তোমাদের এ কী হলো, (জবাব দেয়ার সময়) তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছো না যে! ২৬. (না,) আজ তো (দেখছি) এরা সবাই সত্যি সত্যিই আত্মসমর্পণকারী (বনে গেছে)! ২৭. (এ সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ২৮. (দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে) বলবে, তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে, ২৯. তারা বলবে

تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾

(আমাদের দোষারোপ করছো কেন), তোমরা তো আদৌ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীই ছিলে না, ৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো (জবরদস্তিমূলক) কর্তৃত্বও তো ছিলো না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমালংঘনকারী। ৩১. (এ সময় তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে,) আজ আমাদের (উভয়ের) ওপর আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে, (আজ) আমরা (উভয়েই জাহান্নামের) শাস্তি আস্বাদনকারী। ৩২. আমরা (আসলেই) তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত! ৩৩. সেদিন তারা (সবাই) এই আযাবে সমভাগী হবে। ৩৪. আমি না-ফরমান লোকদের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকি। ৩৫. এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা হতো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো, ৩৬. এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের মাবুদদের (আনুগত্য) ছেড়ে দেবো? ৩৭. (অথচ আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং সে এসেছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এবং সে (আগের) নবীদের সত্যতাও স্বীকার করছে। ৩৮. (হে অপরাধীরা,) তোমাদের (আজ) অবশ্যই (জাহান্নামের) ভয়াবহ আযাব ভোগ করতে হবে, ৩৯. তোমরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতে (আজ) তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে, ৪০. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা, ৪১. তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) সুনির্দিষ্ট (উত্তম) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে, ৪২. থাকবে রকমারি ফলমূল, (তদুপরি) তারা হবে মহাসম্মানে সম্মানিত, ৪৩. নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে (তারা অবস্থান করবে), ৪৪. তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাসীন থাকবে। ৪৫. ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা তাদের পরিবেশন করা হবে, ৪৬. শুভ্র ও সমুজ্জ্বল– যা (হবে) পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু,

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ
قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَإِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾
فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا
مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾ أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

৪৭. তাতে কোনো রকম মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের সাথে (আরো) থাকবে সলজ্জ, নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা, ৪৯. তারা যেন (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণ (সুন্দরী)। ৫০. অতপর এর (জান্নাতের) অধিবাসীরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (নিজেদের হাল অবস্থা) জিজ্ঞেস করবে। ৫১. (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো, ৫৫. যে (আশ্চর্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমিও কি (কেয়ামত) বিশ্বাসীদের একজন? ৫৩. (তুমিও কি বিশ্বাস করো,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরুত্থিত হবো এবং) আমাদের সবাইকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে? ৫৪. (এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের সে সাথীকে এক নযর) দেখতে চাও? ৫৫. অতপর সে (একটু ঝুঁকে) তাকে দেখতে পাবে, (সে রয়েছে) জাহান্নামের (ঠিক) মাঝখানে। ৫৬. (তাকে আযাবে জ্বলতে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ তায়ালার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে, ৫৭. (আমার ওপর) আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আজ (তোমার মতো আযাবে) গ্রেফতার করা এ (লোকদের) দলে শামিল থাকতাম। ৫৮. (হ্যাঁ, এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না! ৫৯. অবশ্য আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা– (এখন তো) আমাদের (আর কোনো রকম) আযাবও দেয়া হবে না। ৬০. (সমস্বরে তারা সবাই বলবে,) অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড়ো ধরনের সাফল্য। ৬১. এ ধরনের (মহা সাফল্যের) জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করে যাওয়া উচিত। ৬২. (বলো তো! আল্লাহর বান্দাদের জন্যে) এ মেহমানদারী ভালো না (আযাবের) যাক্কুম বৃক্ষ (ভালো)?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৩. যালেমদের জন্যে আমি তা বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি। ৬৪. (মূলত) তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়, ৬৫. তার ফলগুলো এমন (বিশ্রী), মনে হবে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা; ৬৬. (যারা জাহান্নামের অধিবাসী) তারা এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তাদের পেট ভর্তি করবে; ৬৭. অতপর তার ওপর ফুটন্ত পানি (ও পুঁজ) মিলিয়ে তাদের (পান করার জন্যে) দেয়া হবে, ৬৮. তারপর নিসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে (অতলান্ত) জাহান্নামের দিকে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার মতোই এই মক্কী সূরাটা ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত, অত্যন্ত দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী, বিচিত্র দৃশ্য চিত্রণকারী, প্রচন্ডভাবে আঘাতকারী ও তীব্র আবেগ সৃষ্টিকারী বর্ণনার সমষ্টি।

অন্য সমস্ত মক্কী সূরার মতো এটাও অন্তরে ঈমানের আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চায়, সব ধরনের শেরেকের কলুষতা থেকে অন্তরাত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র করতে চায়। তবে আরবে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান এক বিশেষ ধরনের শেরেকের মূলোৎপাটন-এর বিশেষ লক্ষ্য। এই বিশেষ ধরনের শেরেক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে তার উচ্ছেদ সাধনে নানাভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। শেরেকের এই বিশেষ ধরনটা আরবের জাহেলী যুগে খুবই সমাদৃত হতো। ধারণাটা ছিলো এ রকম যে, মহান আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জ্বিনদের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং সেই স্ত্রীর পেটে ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছিলো, আর এই ফেরেশতারা সবাই নাকি মেয়ে সন্তান এবং তারা সবাই আল্লাহর মেয়ে। (নাউযু বিল্লাহ!)

এই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর ওপর এই সূরায় প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে। এতে এই ধারণার প্রতি প্রচন্ড ধিক্কার দেয়া হয়েছে এবং একে অত্যন্ত জঘন্য ও একেবারেই ভুয়া অভিমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার এটা একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই ফেরেশতাদের বিভিন্ন দলের উল্লেখ করেই সূরার সূচনা করা হয়েছে। 'শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অতপর যারা ধমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে, অতপর যারা মুখস্থ আবৃত্তি করে.......... ' এর অল্প পরেই রয়েছে বিদ্রোহী শয়তানদের প্রসংগ, যাদের উর্ধ্বজগতের

কাছে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে উল্কা নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হয়। উল্কা নিক্ষেপের ফলে তারা উর্ধ্বজগতে যা কিছু আলোচিত হয় শুনতে পায় না। জাহেলী সমাজে ভূত-প্রেত শয়তানদের যতোটা শক্তিশালী ও মর্যাদাশালী মনে করা হতো, তা যদি সত্য হতো, তাহলে এভাবে উল্কার ধাওয়া খেয়ে তাদের পালাতে হতো না। অনুরূপভাবে জাহান্নামে যে যাক্কুম গাছের ফল দিয়ে অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়া হবে, তার আকৃতি শয়তানের মাথায় মতো বলে শয়তানকে ধিকৃত ও নিন্দিত করা হয়েছে। সূরার শেষভাগে আবার সেই কল্পিত তত্ত্বের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালানো হয়েছে এভাবে,

'অতএব তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রতিপালকেরই কি সমস্ত কন্যা সন্তান, আর ওদের সমস্ত পুত্র সন্তান? আমি কি তাদের চোখের সামনেই ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে সৃষ্টি করেছি? (আয়াত ১৪৯-১৫৮)

জাহেলী যুগের বিভিন্ন রকমের শেরেকের মধ্য থেকে এই বিশেষ ধরনের শেরেকটার সমালোচনা ছাড়া এ সূরায় সাধারণ মক্কী সূরাগুলোর ন্যায় অন্যান্য আকীদার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দ্বারা তাওহিদী মতাদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের মাবুদ একজন। তিনি আকাশ পৃথিবী, উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার এবং পূর্ব দিকের প্রতিপালক।' (আয়াত ৪-৫)

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এই শেরেকই হবে আযাব ভোগ করার কারণ। 'তারা সেদিন একই সাথে আযাব ভোগ করবে। আমি অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করে থাকি।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় পুনরুত্থান ও কেয়ামতের হিসাব নিকাশের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন 'তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু। আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনরুজ্জীবিত হবো নাকি? .... ' এরপর এ প্রসংগে কেয়ামতের এক সুদীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ওহী ও রেসালাতের বিষয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'আমরা একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো নাকি? অতপর এর জবাবে বলা হয়েছে, 'বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং রসূলদের সত্য প্রতিপন্ন করেছে।'

তাদের বিপথগামিতা ও প্রত্যাখ্যান প্রসংগে বেশ কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, তার পুত্ররা, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুসের কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব কাহিনীতে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যানকারীদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করে থাকেন। যেমন 'তাদের পূর্বে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। আমি তাদের কাছে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছি। দেখো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিলো। তবে আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।'

এ সব কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্টতার দাবী রাখে পুত্র ইসমাঈলের সাথে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী। এ কাহিনীতে আছে হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টা ও তার পবিবর্তে দুম্বা কোরবানী হওয়ার কথা। এতে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর কাছে আত্মসর্পণের সবচেয়ে বিস্ময়কর সবচেয়ে মহৎ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ আনুগত্য এতো উঁচুস্তরে পৌঁছেছে, যে একনিষ্ঠ ঈমান ছাড়া আর কোনোভাবে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সূরার আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপনের সাথে সাথে যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রথমত আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, উল্কা ও উল্কা দিয়ে বিতাড়নের দৃশ্যে। যেমন,

'নিশ্চয় আমি সর্বনিম্ন আকাশকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে। প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে...........'

দ্বিতীয়ত কেয়ামতের দৃশ্যাবলীতে, কেয়ামতের লোমহর্ষক ঘটনাবলীতে, তার নযিরবিহীন আকস্মিকতা এবং তার তীব্র প্রভাবের বর্ণনায় এ সূরায় যে দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে, তা যথার্থই নযিরবিহীন এবং যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তৃতীয়ত বিভিন্ন কাহিনী ও তার শিক্ষা সংক্রান্ত মন্তব্যে, বিশেষত হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টার ঘটনা হৃদয়ের মর্মমূলে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দেয়। এ ছাড়া ছন্দোবদ্ধ সুরের মূর্ছনা এ সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলী, দৃশ্যাবলী, শিক্ষা ও নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরাটি তার আলোচ্য বিষয়গুলো মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে পেশ করেছে।

প্রথম অংশটায় রয়েছে শপথের মাধ্যমে সূরার সূচনা। এই শপথ করা হয়েছে ইতিপূর্বে বর্ণিত কয়েক শ্রেণীর ফেরেশতার নামে। এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ধমক দিয়ে ভীতি সঞ্চারকারী ও আবৃত্তিকারী ফেরেশতারা। শপথ করা হয়েছে এই মর্মে যে, উদয়াচলসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আকাশকে নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। এরপর রয়েছে শয়তানের প্রসংগ, উর্ধ্বজগতের ফয়সালাগুলো তাদের আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা এবং তাদের উজ্জ্বল উল্কা দিয়ে বিতাড়িত করার বিবরণ। তারপর মানব জাতির কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, সৃষ্টির দিক দিয়ে তাদের সৃষ্টিই কি জটিলতর, না আমার অন্যান্য সৃষ্টি? অর্থাৎ ফেরেশতা, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, শয়তান ও উল্কা। এ প্রশ্ন দ্বারা আখেরাত সম্পর্কে তাদের কথাবার্তা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ এবং তারা যা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করে ও যা নিয়ে বিদ্রূপ করে তার বাস্তবতা ও অকাট্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ জন্যে আখেরাতে পুনরুত্থান, হিসাব, বেহেশতের নেয়ামত ও দোযখের শাস্তির দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিবরণ যথার্থই নযিরবিহীন।

দ্বিতীয় অংশের শুরু হয়েছে যে বক্তব্যের মাধ্যমে তা হলো, এসব বিপথগামী লোকের (মক্কার মোশরেকদের) সাদৃশ্য অতীতের কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের কাছেও নবী ও রসূলরা সতর্কবাণী নিয়ে আসতেন। তথাপি তাদের অধিকাংশই বিপথগামী থেকে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে রয়েছে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুস (আ.)-এর জাতিসমূহ। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের পরিণাম কেমন ছিলো এবং যারা ঈমান আনেনি তাদের পরিণাম বা কেমন হয়েছে, তা স্মরণ করতে ও চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে রয়েছে সেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর বিবরণ, অর্থাৎ জ্বিন ও ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর আত্মীয়তার কাহিনী। এতে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিরও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূলদের বিজয়ী করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্যে ইতিপূর্বে আমার প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তাদের অবশ্যই সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীগুলো অবশ্যই বিজয়ী হবে।' এ অংশটা সূরার সমাপ্তি পর্যন্ত চলেছে, যেখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর রসূলদের ওপর সালাম প্রেরণ করে মহান আল্লাহর সারা বিশ্বজগতের প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, এই হচ্ছে সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এবার বিস্তারিত তাফসীর আলোচনা করবো।

তাফসীর

আয়াত ১-৬৮

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যারা ধমক দিয়ে ভীতি সঞ্চার করে ....? (আয়াত ১-৫)

সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, ধমকদানকারী ও আবৃত্তিকারী– এরা হচ্ছে কয়েক শ্রেণীর ফেরেশতা, যাদের তাদের ওপর অর্পিত কাজগুলোর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, যারা নিজেদের পা বা ডানাগুলো নামাযের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বিছিয়ে রেখে আল্লাহর আদেশের জন্য প্রতীক্ষারত থাকে। আর 'ধমকদানকারী' বলতে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের প্রাণ সংহার করার সময়, কেয়ামতের মাঠে সমবেত করার সময়, জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অথবা অন্য কোন অবস্থায় ও সময়ে ধমকদানকারী ফেরেশতাদের। আর আবৃত্তিকারী অর্থ কোরআন বা আল্লাহর অন্য কোনো কেতাব আবৃত্তিকারী বা আল্লাহর স্মরণকারী।

মহান আল্লাহ এই কয় শ্রেণীর ফেরেশতার নামে শপথ করে নিজের একত্বের কথা ঘোষণা করছেন, 'তোমাদের মাবুদ এক ও অদ্বিতীয়।' আগেই বলেছি, এই শপথের কারণ হলো জাহেলী যুগের এই অলীক ধারণা যে, ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে বিধায় তাদেরও উপাসনা করা উচিত।

এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের এমন একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যা তাঁর একত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে গুণটা হলো, 'আকাশ পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক এবং সকল উদয়াচলের প্রতিপালক।' আকাশ ও পৃথিবী বান্দাদের সামনেই দাঁড়িয়ে থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশাল বিশ্ব জগতের একজন স্রষ্টা, পরিকল্পক ও শাসক রয়েছেন। এ বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষমতার দাবী তিনি ছাড়া আর কেউ করে না। আর এর স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতা এবং তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের কথা কেউ অস্বীকারও করতে পারে না। 'উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে,' অর্থাৎ বাতাস, মেঘ, আলো, কিরণ, তাপ এবং অন্যান্য সূক্ষ্মতর সৃষ্টি, যার সম্পর্কে মানুষ মাঝে মাঝে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারে, তবে অধিকাংশ তথ্যই তাদের অজানা।

আকাশ, পৃথিবী ও তার মাঝখানে যা কিছু আছে, এগুলোর কোনোটা বিশাল আকৃতির, কোনোটা ক্ষুদ্রকার, কোনোটা অতি সূক্ষ্ম, কোনোটা সুন্দর ও চমকপ্রদ, আর সবই বিচিত্র রকমের। ফলে এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে একজন সচেতন মানুষ এ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে ও দীর্ঘস্থায়ী চিন্তায় নিমগ্ন না হয়ে পারে না। কেবলমাত্র যার হৃদয় নির্জীব হয়ে গেছে, সেই এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং চিন্তাভাবনা না করে থাকতে পারে। এ ধরনের চেতনাহীন মানুষ বিস্ময়কর এই মহাবিশ্বের কোনো দৃশ্য দ্বারাই প্রভাবিত হয় না।

উদয়াচল ও অস্তাচলে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব

'উদয়াচলসমূহের প্রতিপালক।'

প্রত্যেক নক্ষত্রের একটা উদয়াচল রয়েছে। প্রত্যেক গ্রহের একটা উদয়াচল রয়েছে। এভাবে বিশাল আকাশের বিভিন্ন দিকে বহু উদয়াচল রয়েছে। এ কথাটার আরো একটা অর্থ হতে পারে, যা আমাদের এই পৃথিবীর বাস্তব অবস্থানের সাথে সংগতিশীল। পৃথিবী যখন সূর্যের সামনে প্রদক্ষিণ করে, তখন তার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর উদয়াচল ও অস্তাচল ঘুরতে থাকে। পৃথিবীর কোনো অংশ যখন সূর্যের সামনে আসে, তখন সে অংশের ওপর সূর্য উদিত হয়। তাই ওটা একটা

উদয়াচল হয় সে অংশের জন্যে। এর ঠিক বিপরীত দিকে পৃথিবীর অস্তাচল থাকে। ফলে পৃথিবী যখন চলতে থাকে তখন সেখানে পরবর্তী অংশের জন্যে আর একটা উদয়াচল হয় এবং তার বিপরীত অংশের জন্যে হয় আর একটা অস্তাচল। এ সত্যটা কোরআন নাযেল হবার সময়কার মানুষের জানা ছিলো না। অথচ এই একটা কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই প্রাচীন যুগেই মানুষকে এ সত্যটা জানিয়ে দিলেন।

পৃথিবীর সামনে এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো উদয়াচল আসতে থাকার এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটা এবং উদয়াচলসমূহে প্রকৃতিকে উদ্ভাসনকারী এই মনোমুগ্ধকর ও চমকপ্রদ দৃশ্য মানুষের মনে এই উপলব্ধি জাগরূক করতে সক্ষম যে, এ বিচিত্র সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা তিনি নিসন্দেহে এক ও একক এবং অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী। কেননা এ সব বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতিতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই এবং এ সবের সৃষ্টির লক্ষণসমূহ এক ও অভিন্ন।

মহান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্য থেকে এখানে এই একটা গুণের উল্লেখের এটাই কারণ। পরবর্তীতে নক্ষত্র, উল্কা, শয়তান ও তার বিতাড়নের উল্লেখ প্রসংগে আমরা দেখবো যে, আকাশ ও উদয়াচলের উল্লেখের আরো কিছু কারণ রয়েছে।

'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা সজ্জিত করেছি।' (৬ থেকে ১০ নং আয়াত)

সূরার শুরুতে ফেরেশতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কল্পকাহিনীর উল্লেখের পর এখানে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত কল্পকাহিনীর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা মনে করতো যে, আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিনদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে জাহেলী যুগের কেউ কেউ শয়তানের পূজাও করতো। এর আরো কারণ ছিলো এই যে, তারা মনে করতো, উর্ধ্বজগতের সাথে শয়তানের যোগাযোগ আছে এবং এই যোগাযোগের কল্যাণে শয়তান অনেক অদৃশ্য তথ্য জানে।

আকাশ, পৃথিবী, উভয়ের মাঝখানের যাবতীয় জিনিস এবং উদয়াচল সমূহের উল্লেখের পর নক্ষত্রমন্ডলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে নক্ষত্র মন্ডলী দ্বারা সুশোভিত করেছি।'

আকাশের দিকে একটা নযর বুলানোই এই অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য দেখার জন্যে যথেষ্ট। বিশ্বজগতের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৌন্দর্য যে একটা ঈপ্সিত জিনিস, মহাবিশ্বের দিকে চোখ মেলে তাকালেই তা বুঝা যায়। মহাবিশ্বের প্রতিটা সৃষ্টি নযিরবিহীন এবং এগুলোর পারস্পরিক সমন্বয় এক অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। সৌন্দর্যই এর স্বাভাবিক ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী নয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং কাজের পূর্ণতা এই দুটোই এখানে সমভাবে পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে বিদ্যমান। সব কিছুই এখানে পরিমিত এবং এর প্রত্যেকটা জিনিস নিজের করণীয় কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে থাকে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টিজগতই তাই অপরূপ সুন্দর।

আর আকাশ ও আকাশের সর্বত্র বিস্তৃত নক্ষত্রমন্ডল প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর ও চমকপ্রদ দৃশ্য। যতো দীর্ঘ সময়ই এর দিকে তাকনো হোক ক্লান্তি বোধ হয় না। প্রতিটা গ্রহ তার প্রতিফলিত আলো এবং প্রতিটা নক্ষত্র তার মিটিমিটি জ্যোতি এমনভাবে বিকিরণ করে যে, মনে হয় ওটা তোমার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তুমি যেই তার দিকে স্থিরভাবে তাকাও, অমনি সে চোখ বন্ধ করে ও নিজেকে লুকায়। আর যেই তুমি তার দিক থেকে চোখ সরাও, অমনি সে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলতে থাকে। আর এক রাতের পর আর এক রাতে ক্রমান্বয়ে তার কক্ষপথ পরিবর্তন করতে থাকায় এমন এক উপভোগ্য মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি হয় যে, তা দেখে কারো মনে ক্লান্তি ও একঘেঁয়েমি বোধ হয় না।

আবার পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এই সব গ্রহ-নক্ষত্র অন্যান্য কাজও করে থাকে। যেমন কতক নক্ষত্র শয়তানকে বিতাড়িত করার কাজে ব্যবহৃত হয়, যাতে শয়তান উর্ধ্বজগতের কাছে না যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে। যাতে তারা উর্ধ্বজগতে কান পাততে না পারে এবং সকল দিক থেকে তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয় ....। (আয়াত ৭-১০)

বস্তুত কিছু নক্ষত্র এমনও রয়েছে, যা আল্লাহদ্রোহী শয়তানদের কবল থেকে আকাশকে রক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উর্ধ্বজগতে যা কিছু হয়, তা যাতে তারা শুনতে না পায় সে জন্যে তাদের প্রতি উল্কা ছুঁড়ে মারা হয়। যখনই কোনো শয়তান আড়ি পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করে, অমনি চারদিক থেকে উল্কা মেরে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। উপরন্তু আখেরাতে তার জন্যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে। কখনো কখনো শয়তান অনেকের জন্যে কান পেতে উর্ধ্ব জগতের কিছু তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু তৎক্ষণাত সমস্ত উল্কা এসে তাকে আঘাত করে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

শয়তান কিভাবে আড়ি পেতে শোনে, কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এবং কিভাবে জ্বলন্ত উল্কার আঘাতে বিতাড়িত হয়, তা আমরা জানি না। কেননা এ সবই অদৃশ্য তত্ত্ব। আমাদের মানবীয় বিবেক বুদ্ধি এগুলো কল্পনা করতে পারে না। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র করণীয় হলো যা কিছু আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। আমাদের চোখের সামনে যে প্রাকৃতিক জগত রয়েছে, তার সম্পর্কেও তো আমরা ছিটেফোঁটা তথ্য ছাড়া কিছুই জানি না। সুতরাং যে জগত সম্পূর্ণ অদৃশ্য, তার সম্পর্কে আল্লাহর জানানো তথ্যের বাইরে কিছু জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যে জাতি সম্পর্কে জাহেলী যুগের লোকদের ধারণা হচ্ছে, তারা আল্লাহর আত্মীয় তথা শালা-সম্বন্ধী ও শ্বশুর ইত্যাদি, সেই জ্বিন বংশোদ্ভূত শয়তানদের উর্ধ্ব জগতের কাছেও ঘেঁষতে দেয়া হয় না এবং সেখানকার কিছুই শুনতে দেয়া হয় না। তাদের এই দাবী যদি সত্য হতো, তাহলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। আল্লাহর তথাকথিত শালা-সম্বন্ধী ও শ্বশুরদের এমন শোচনীয় পরিণতি হতো না এবং এভাবে তাদের তাড়ানো ও জ্বালানো হতো না।

ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে বিরাজমান যাবতীয় সৃষ্টি, নিম্নতম আকাশকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার এই নক্ষত্রমন্ডলী এবং বিদ্রোহী শয়তানদের দল ও তাদের বিতাড়নের বিষয় উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন মোশরেকদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না এ সব সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা? এসব সৃষ্টি যখন অধিকতর শক্তিশালী ও কঠিন, তখন তারা আখেরাতের জীবন নিয়ে বিস্মিত হচ্ছে কেন এবং ব্যংগ বিদ্রূপই বা করছে কেন? কেনই বা পরকালকে তারা অসম্ভব মনে করছে? কেননা দুনিয়ার সৃষ্টিজগতের সাথে আখেরাতের সৃষ্টির কোনো তুলনাই চলে না।

'অতপর তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না আমি অন্য যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন?.................. (আয়াত ১১-১৭)

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ওদের জিজ্ঞেস করো, ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সব কিছু, শয়তানরা, গ্রহ-নক্ষত্র, ও উল্কাগুলো সবই যখন আল্লাহর সৃষ্টি, তখন এগুলো সৃষ্টি করার চেয়ে কি তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন?

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবের অপেক্ষা করছেন না। কেননা ব্যাপারটা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত। এ প্রশ্নের মাধ্যমে আসলে তাদের বিস্ময়কর অবস্থান সম্পর্কে বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। চারপাশের সৃষ্টিজগতের প্রতি তাদের উদাসীনতায় ক্ষোভ এবং মোশরেকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জিনিসের মূল্যায়নে বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ জন্যে তাদের প্রথম সৃষ্টির উপাদানটা কি তা তাদের জানানো হচ্ছে। সে উপাদানটা হলো নরম চটচটে মাটি, যা এই পৃথিবী থেকেই নেয়া হয়েছে। আর পৃথিবীটা হলো আল্লাহর সেই শক্তিশালী সৃষ্টিগুলোর অন্যতম।

'আমি তাদের সৃষ্টি করেছি কাদামাটি থেকে।'

অতএব তাদের সৃষ্টি করা কিছুতেই সেসব সৃষ্টির চেয়ে কঠিন নয়। আর তা যখন নয়, তখন তাদের অবস্থা তো বিস্ময়কর। অথচ তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে এবং ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দেখে ব্যংগ বিদ্রূপ করে। তাদের এই ব্যংগ বিদ্রূপ দেখে রসূল (স.)-এর মনে বিস্ময় জাগে। অথচ তারা তাদের বর্তমান ভূমিকা অব্যাহত রেখে চলেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং তুমি অবাক হচ্ছো আর তারা ঠাট্টা করছে।' (আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

আর তাদের অবস্থা দেখে রসূল (স.)-এর অবাক হওয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। কেননা মোহাম্মদ (স.) যেভাবে আল্লাহকে দেখেন, সেখানে যে মোমেন আল্লাহকে হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী এতো সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়, সে মোমেন নিশ্চয়ই অবাক হবে যে, মানুষ কিভাবে এ সব নিদর্শন না দেখে পারে এবং কিভাবে সে এমন বিস্ময়কর অবস্থান গ্রহণ করে?

রসূল (স.) যখন তাদের ব্যাপারে এতোই বিস্মিত, তখন তারা তাদের কাছে রসূল (স.) কর্তৃক উপস্থাপিত তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এ সময় তাদের মন বিকৃত ও অচল হয়ে যায়, ফলে তা আর কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না। এ সময় তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি প্রচন্ড উপহাস বিদ্রূপ করে, বিস্ময় প্রকাশ করে। 'ইয়াসতাসখেরূনা' শব্দ দ্বারা উপহাসের প্রচন্ডতা প্রকাশ করা হয়েছে। এ জন্যেই কোরআন বলেছে,

'তারা বলেছে, এতো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নয়। আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো? আর আমাদের পূর্বপুরুষরাও?'

বস্তুত আল্লাহর অসীম কুদরতের যে নিদর্শনাবলী তাদের চারপাশে ও তাদের নিজ সত্ত্বার মধ্যে রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিলো। আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সকল জিনিসের সৃষ্টিতে, গ্রহ নক্ষত্র ও উল্কাগুলোর সৃষ্টিতে, ফেরেশতা ও শয়তানদের সৃষ্টিতে এবং নরম কাদামাটি থেকে তাদের সৃষ্টিতে যে অসীম ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলো না। তারা ও তাদের পিতৃপুরুষদের মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হওয়া তারা অসম্ভব মনে করতো। অথচ আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পক্ষে এটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। যদি তারা তাদের সত্ত্বায় ও চারপাশে বিরাজমান নিদর্শনাবলীর আলোকে চিন্তা ভাবনা করে।

এ সব নিদর্শনা নিয়ে তারা যখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের তীব্র শ্লেষাত্মক কথাবার্তা এবং আখেরাতের কষ্টকর দৃশ্যাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের সচেতন করে দিচ্ছেন।

'বলো, হাঁ, আর তোমরা অপমানিত হবে।'

অর্থাৎ হাঁ, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে মাটিতে মিশে যাওয়া সত্তেও পুনরুজ্জীবিত হবে, লাঞ্ছিত ও আত্মসমর্পিত হয়ে সমবেত হবে। কিভাবে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা

এক বিরাট দৃশ্যের সামনে সমবেত হবে। সেখানে থাকবে যতোসব জীবন্ত দৃশ্যাবলী ও ধারাবাহিক কর্মকান্ড। এতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে, আবার বর্ণনার মাধ্যমেও। এ সব বিবরণের মাঝে মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে। এভাবে জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য এতে ফুটে ওঠেছে।

'সেটা হবে শুধু একটা ধমক। এতে তারা তাকিয়ে থাকবে।' এখানে ধমক বা ঝাজরা শব্দটার ভেতরে এক ধরনের কঠোরতা ও কষ্টের অনুভূতি বিদ্যমান। 'তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এটা তো বিচারের দিন।'

এভাবে তারা যখন বিস্ময়ে হতভম্ভ হয়ে যাবে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে,

'এ হচ্ছে সেই মীমাংসার দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।'

শেষ বিচার দিনের আলোচনা

এভাবে খবর থেকে সম্বোধনের দিকে চলে যাওয়া হয়েছে এবং যারা বিচারের দিনকে অবিশ্বাস করতো, তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। এটা একটা কঠোর ও চূড়ান্ত ঘোষণা। এরপর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–

'যারা যুলুম করেছে তাদের ও তাদের সহগামীদের সমবেত করো।' (আয়াত ২২ -২৩)

অর্থাৎ 'যারা যুলুম ও অন্যায় করেছে তাদের ও তাদের মতো পাপাচারীদের একত্রিত করো।' এখানে আদেশটিতে এক ধরনের বিদ্রূপ সুস্পষ্ট। বলা হয়েছে, 'তাদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত করো।' এখানে 'হেদায়াত' শব্দটা এমন স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে হেদায়াতের চেয়ে বিপথগামিতাই ভালো। যারা পৃথিবীতে সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি, তাদের জন্যে এটা সঠিক জবাব। পৃথিবীতে তারা যখন সরল সঠিক পথ 'সিরাতুল মুসতাকীমে' চালিত হয়নি, তখন আজ তাদের জাহান্নামের পথের দিকে চালিত হওয়াই ভালো।

পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তাদের জাহান্নামের পথে চালিত করা হবে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে,

'কি হলো তোমাদের, তোমরা পরস্পরকে এখন সাহায্য করো না কেন?'

অর্থাৎ তোমরা আজ এখানে সবাই সমবেত। তোমাদের প্রত্যেকের একজন সাহায্যকারী প্রয়োজন। আজ তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেসব দেব দেবী রয়েছে, যাদের তোমরা পূজা করতে। স্বভাবতই এ প্রশ্নের জবাব থাকবে না তাদের কাছে। থাকবে না তাদের মুখে কোনো কথা। তাই মহান আল্লাহ নিজেই মন্তব্য করছেন।

'বরঞ্চ তারা আজ আত্মসমর্পিত।'

এরপর পুনরায় বিবরণ দেয়া হচ্ছে তাদের পরস্পরের বিতর্ক ও ঝগড়ার।

'তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসবে। বলবে, তোমরা তো ডান দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে।' অর্থাৎ তোমরা আমাদের ডান দিক থেকে কুপ্ররোচণা দিয়ে যেতে। গোপন শলাপরামর্শের বেলায় সাধারণত এ রকমই হয়ে থাকে। বলা হচ্ছে, তোমরা যেহেতু আমাদের কুপ্ররোচণা দিতে। কাজেই আমাদের আজকের সমস্ত দুর্দশার জন্যে তোমরাই দায়ী। অভিযুক্তরা তৎক্ষণাত নিজেদের দোষ প্রক্ষালন করার জন্যে পাল্টা দোষারোপ করবে।

'তারা বলবে, বরং তোমরাই ঈমান আননি।'

অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনার পর আমাদের কুপ্ররোচণা তোমাদের বিপথগামী করতে পারে না।

‘তোমাদের ওপর আমাদের কোনো আধিপত্য ছিলো না।’

অর্থাৎ ‘তোমাদের অনিচ্ছা সত্তেও বল প্রয়োগে আমাদের পছন্দনীয় বিষয় মেনে নিতে আমরা তোমাদের বাধ্য করিনি।’

‘বরং তোমরাই বিপথগামী জাতি ছিলে।’

অর্থাৎ তোমরাই সীমা অতিক্রমকারী ছিলে।

আমাদের ওপর আমাদের প্রভুর কথা খেটে গেছে। আমরা স্বাদ গ্রহণ করবো।’

অর্থাৎ আমরা ও তোমরা আযাবের যোগ্য হয়ে গেছি। তাই আমাদের আযাবের স্বাদ গ্রহণ অনিবার্য। তোমরা আমাদের সাথে সাথে পদস্খলিত হয়েছে, এটাই তোমাদের বিপথগামী হবার কারণ। আমরা তোমাদের আমাদের অনুসারী হবার জন্যে কিছুই করছি না; বরং তোমরাই আমাদের কুপথের অনুসারী হয়েছো।

‘তাই আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছি। কেননা আমরা নিজেরাও ছিলাম বিপথগামী।’

এখানে আরো একটা মন্তব্য করা হয়েছে, যেন জনসমক্ষে একটা ফয়সালা ঘোষণা করা হয়েছে। এতে এ ফয়সালার কারণও বলা হয়েছে। দুনিয়াতে তারা যা যা করেছে তাও প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণেই শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

‘তারা সেদিন আযাবে শরীক থাকবে।’ (আয়াত ৩৩-৩৬)

এরপর এই মন্তব্যকে পূর্ণতা দেয়া হয়েছে এই ধিকৃত কথার বক্তাদের নিন্দা ও সমালোচনার মাধ্যমে। ‘বরঞ্চ তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন এবং রসূলদের সমর্থন করেছেন ....।’ (আয়াত ৩৭-৪০)

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এইসব খাঁটি বান্দাদের উল্লেখ করার পর আখেরাতে তারা কেমন পুরস্কৃত হবে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।’

‘তাদের জন্যে রয়েছে সুবিদিত জীবিকা, ফলমূল এবং তারা হবে পরম সম্মানিত।’ (আয়াত ৪১-৪৯)

এখানে তাদের অতিরিক্ত নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যা নেয়ামতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। এ নেয়ামত হৃদয় মন ও অনুভূতি– সব কিছুকেই পরিতৃপ্ত করবে।

প্রথমত তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা। এতে তাদের উচ্চতর সম্মানে ভূষিত হবার ইংগিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত তারা উচ্চতর জগতে সম্মানিত হবে। এ সম্মানের কোনো শেষ নেই। তাদের জন্যে থাকবে ফলমূল এবং তারা মুখোমুখি খাটের ওপর বসে থাকবে। তাদের সেবা করা হবে। ফলে তারা বিন্দুমাত্র কষ্ট পাবে না।

‘তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবের পরিপূর্ণ পানপাত্র। শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। তাতে শিরপীড়ার উপাদানও থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।’

শরাবের এর চেয়ে সুন্দর গুণাবলী আর হতে পারে না। এ সব গুণাবলীর কারণে শরাবের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করা যাবে এবং তা সমস্ত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে। তাই কোনো মাতলামির কারণে মাথা ঘুরবে না এবং এর স্বাদেও কখনো পরিবর্তন আসবে না। ‘আর তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না প্রশস্ত চক্ষু বিশিষ্ট রমণীরা।’ অর্থাৎ এমন জীবন্ত হুররা, যারা সতী ও লাজুক হওয়ার কারণে তাদের প্রিয়জন ব্যতীত আর কারো দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। অথচ

তারা বড় বড় চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী রমণী। তারা সব ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের হবে, যেমন কতিপয় আচ্ছাদিত ডিম, কেউ তা দেখেও না, স্পর্শও করে না।

এরপর পুনরায় এই সব খাঁটি বান্দার চিত্রায়িত বিবরণ দেয়া হচ্ছে। তাদের সব রকমের আয়েশ আরামের উপকরণ সরবরাহ করার পর তারা পরস্পরে যেমন প্রথম সাক্ষাতে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেয়, তার পরিবর্তে তারা প্রশান্ত পরিবেশে অতীতের কথা মনে করবে এবং সংগীদের কাছে তার কিছু কিছু বর্ণনা করবে।

'তাদের একজন বলবে, আমার একজন সংগী ছিলো।' (আয়াত ৫১-৫৩)

তার সেই সংগী আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করতো, হাড়গোড় মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার মানুষ কি বেঁচে ওঠবে এবং তার বিচারও হবে?

এই কাহিনী বেহেশতের সংগীদের কাছে বলতে বলতে হঠাৎ তার মনে হবে, তার সেই সাথীকে একটু খুঁজে দেখা যাক আজ তার কী পরিণতি হবে। সে স্বভাবতই জানবে যে, সে জাহান্নামবাসী হয়েছে। তখন সে তাকে দেখবে এবং সংগীদেরও দেখবার জন্য ডাকবে।

'সে বলবে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ। সে দেখবে, তাকে জাহান্নামের মাঝখানে।'

তৎক্ষণাত সে জাহান্নামের মাঝখানে থাকা তার পুরনো সাথীকে বলবে, ওহে অমুক, তুমি তো তোমার কুপ্ররোচণা দ্বারা আমাকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছিলে। আল্লাহ তায়ালা যদি আমার ওপর অনুগ্রহ না করতেন এবং তোমার কথামত চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন, তাহলে আমিও তোমার মতো গোল্লায় যেতাম।

'সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি আমাকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছিলে। আমার প্রভুর অনুগ্রহ না হলে আমিও পৌঁছে যেতাম।' অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্তেও বধ্যভূমিতে নেয়া হয়, এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

তার সাথীকে জাহান্নামে দেখে তার ভেতরে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সেই অগাধ নেয়ামতের কথা স্মরণ হবে, যা সে ও অন্যান্য খাঁটি বান্দারা পেয়েছে। তাই এর পর্যালোচনা করা ও এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা জরুরী মনে করে সে বলবে–

'আমরা কি তখন আর মরবো না?' (আয়াত ৫৮, ৫৯ ও ৬০)

এখানে এমন একটা মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে, যা অন্তরে চেতনার সঞ্চার করে এবং এরূপ প্রতিদান লাভের জন্যে কাজ করার প্রেরণা যোগায়।

'এ ধরনের জিনিসের জন্যই সকল কর্ম সম্পাদনকারীর কাজ করা উচিত।' অর্থাৎ এ ধরনের নেয়ামত লাভের জন্যে, যা কখনো হাতছাড়া হয় না, ফুরিয়ে যায় না, মৃত্যু যার অবসান ঘটায় না এবং কোনো আযাবের আশংকা যাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না। এর জন্যে সকলের কাজ করা উচিত। এ ছাড়া আর যেসব জিনিসের পেছনে মানুষ পৃথিবীর জীবন ও সময় ব্যয় করে, তা এই চিরস্থায়িত্বের বিচারে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ, সন্তোষজনক ও চিরস্থায়ী নেয়ামতের মধ্যে এবং অপর পক্ষের জন্যে নির্ধারিত পরিণতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই শেষোক্ত পক্ষের পরিণামের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'এটা কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম গাছ? ওটা আমি যালেমদের শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রেখেছি।' (আয়াত ৬২-৬৮)

এই চিরস্থায়ী নেয়ামত ভালো ও মর্যাদাপূর্ণ, না যাক্কুম গাছ।

যাক্কুম গাছ কি রকম?

'এটা এমন গাছ, যা উৎপন্ন হয় দোযখের তলদেশে, এর আকৃতি যেন শয়তানের মাথার মতো।' শয়তানের মাথা কি রকম তা কেউ জানে না। তবে এই উপমা নিসন্দেহে আতংক সৃষ্টি করে। এর কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। আর এটা যাদের খেতে হবে ও পেট ভরে খেতে হবে, তাদের কী অবস্থা হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

এই গাছ আল্লাহ তায়ালা যালেমদের শাস্তির জন্যে তৈরী করেছেন। এর নাম যখন কাফেররা শুনেছিলো, তখন উপহাস করে বলেছিলো, দোযখের ভেতর কিভাবে গাছ জন্মাবে এবং তা পুড়ে ভস্ম হবে না? আবু জাহল বললো, হে কোরায়শের জনমন্ডলী, তোমরা জানো, মোহাম্মদ যে যাক্কুমের গাছের ভয় দেখায় তা কী? তারা বললো, না। সে বললো, 'ইয়াসরেবের মাখনের সাথে খেতে হয় এমন এক মজাদার খাবার। আল্লাহর কসম, আমি সুযোগ পেলে তৃপ্তি সহকারে যাক্কুম খেয়ে নেবো' কিন্তু এই যাক্কুমের গাছ তাদের পরিচিত সেই খাবার নয়। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

'তারা ওটা খাবে এবং পেট ভরে খাবে।'

বস্তুত শয়তানের মাথার মতো এই ফল তাদের গলায় কাঁটার মতো বিঁধবে, তাদের পেট জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। অথচ এটা জাহান্নামের ভেতরে জন্মে এবং পোড়ে না। কেননা ওটা জাহান্নামেরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এটা খাওয়ার পর ঠান্ডা পানীয়ের প্রবল চাহিদা হবে যাতে এর জ্বালা নিবারণ হয়, কিন্তু এরপর গরম ও দূষিত পানিই তাদের পান করতে হবে।

'তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে পুঁজ মিশ্রিত ফুটন্ত পানি।'

এই নাশতা খাওয়ার পর তারা জাহান্নামে রক্ষিত খাবার টেবিলে ভুরি ভোজনের জন্যে ছুটে যাবে। উহ্, সে কি জঘন্য খাবার এবং কি জঘন্য আপ্যায়ন।

'অতপর তারা জাহান্নামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।' এখানেই শেষ হচ্ছে জাহান্নামের এই নযীরবিহীন দৃশ্যের বর্ণনা। আর এখানেই শেষ সূরার প্রথম অংশ বা অধ্যায়। এ যেন বাস্তব দৃশ্যেরই একটা অংশ।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ

৬৯. নিসন্দেহে তারা তাদের মাতাপিতাকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছে, ৭০. তারপরেও (নির্বিচারে) তারা তাদের (গোমরাহ পিতা মাতাদের) পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। ৭১. তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো, ৭২. তাদের মধ্যেও আমি সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছিলাম। ৭৩. অতএব (হে নবী,) তুমি একবার (চেয়ে) দেখো, যাদের (এভাবে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে, ৭৪. অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা (তারা আযাব থেকে একান্ত নিরাপদ)।

রুকু ৩

৭৫. (এক সময়) নূহও (সাহায্য চেয়ে) আমাকে ডেকেছিলো, (তার জন্যে) কতো উত্তম সাড়াদানকারী (ছিলাম) আমি, ৭৬. তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি, ৭৭. তারই বংশধরদের আমি (দুনিয়ার বুকে) অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি, ৭৮. অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার (উত্তম) স্মরণ অব্যাহত রেখেছি, ৭৯. সৃষ্টিকুলের মাঝে নূহের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। ৮০. অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি। ৮১. নিসন্দেহে সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম। ৮২. অতপর (তার জাতির) অবশিষ্ট (কাফের) সকলকে আমি (বন্যার পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি। ৮৩. নূহের (পথ অনুসারী) দলের মাঝে ইবরাহীমও ছিলো একজন। ৮৪. যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাযির হয়েছিলো। ৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলো (হায়)! তোমরা (সবাই এসব) কিসের পূজা করছো? ৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া

تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾

فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ

أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

فَأَقْبَلُوْٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ

وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِى الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا

بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا

মাবুদদেরই (পেতে) চাও? ৮৭. (বলো,) এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? ৮৮. অতপর সে একবার (সত্যের সন্ধানে) তারকারাজির দিকে তাকালো, ৮৯. অতপর বললো, সত্যিই আমি অসুস্থ। ৯০. (অতপর) লোকেরা (তার থেকে নিরাশ হয়ে) সবাই চলে গেলো। ৯১. পরে সে (চুপি চুপি) তাদের দেবতাদের (মন্দিরের) কাছে গেলো এবং (দেবতাদের প্রতি তামাশাচ্ছলে) বললো, কি ব্যাপার (এতো প্রসাদ এখানে পড়ে আছে), তোমরা খাচ্ছো না যে! ৯২. এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি কথাও বলো না? ৯৩. অতপর সে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানলো। ৯৪. (লোকেরা যখন এটা শুনলো) তখন তারা দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো। ৯৫. (তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে) সে বললো, তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো, যাদের তোমরা নিজেরাই (পাথর) খোদাই করে নির্মাণ করো, ৯৬. অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করেছেন) তোমরা যা কিছু (মাবুদ) বানাও তাদেরও। ৯৭. (এ কথা শুনে) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, তার জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করো (এবং তাতে আগুন জ্বালাও), অতপর (সে) জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো। ৯৮. তারা (এর মাধ্যমে আসলে) তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাদের (চক্রান্ত ব্যর্থ ও) হীন করে দিলাম। ৯৯. এবার সে বললো, আমি এবার আমার মালিকের (রাস্তার) দিকে বেরিয়ে পড়লাম, (আমি বিশ্বাস করি) অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। ১০০. (অতপর সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করলো,) হে আমার মালিক, আমাকে তুমি একজন নেক সন্তান দান করো।১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ১০২. সে যখন তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মতো (বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলো, তখন সে (ছেলেকে) বললো, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি

تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۰۲﴾ فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلۡجَبِیۡنِ ﴿۱۰۳﴾ وَ نَادَیۡنٰهُ اَنۡ یّٰۤاِبۡرٰهِیۡمُ ﴿۱۰۴﴾ قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡیَا ۚ اِنَّا کَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓـؤُا الۡمُبِیۡنُ ﴿۱۰۶﴾ وَ فَدَیۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَ تَرَکۡنَا عَلَیۡهِ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۱۰۸﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤی اِبۡرٰهِیۡمَ ﴿۱۰۹﴾ کَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۱۱﴾ وَ بَشَّرۡنٰهُ بِاِسۡحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۱۲﴾ وَ بٰرَکۡنَا عَلَیۡهِ وَ عَلٰۤی اِسۡحٰقَ ؕ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِهِمَا مُحۡسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ مُبِیۡنٌ ﴿۱۱۳﴾

(যেন) তোমাকে যবাই করছি, (বলো এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? (স্বপ্নের কথা শুনে) সে বললো, হে আমার (স্নেহপরায়ণ) আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি (অবিলম্বে) তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে (এ সময়েও) ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন। ১০৩. অতপর যখন তারা (পিতাপুত্র) দুজনই (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে (যবাই করার উদ্দেশে) কাত করে শুইয়ে দিলো, ১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম, ১০৫. তুমি (আমার দেখানো) স্বপ্ন সত্য প্রমাণ করেছো, (আমি তোমাদের উভয়কেই মর্যাদাবান করবো, মূলত) আমি এভাবেই সৎকর্মশীল মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি! ১০৬. এটা ছিলো (তাদের উভয়ের জন্যে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র! ১০৭. (এ কারণেই) আমি তার (ছেলের) পরিবর্তে (আমার নিজের পক্ষ থেকে) একটা বড়ো কোরবানী (-র জন্তু সেখানে) দান করলাম। ১০৮. (অনাগত মানুষদের জন্যে এ বিধান চালু রেখে) তার স্মরণ আমি অব্যাহত রেখে দিলাম। ১০৯. শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের ওপর। ১১০. এভাবেই আমি (আমার) নেক বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি! ১১১. অবশ্যই সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের একজন। ১১২. (কিছুদিন পর) আমি তাকে (এ মর্মে) ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দান করলাম যে, সে (হবে) নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন। ১১৩. আমি তার ওপর (ও তার সন্তান) ইসহাকের ওপর আমার (অগণিত) বরকত নাযিল করেছি; তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সৎকর্মশীল মানুষ (যেমন) আছে, (তেমনি) আছে কিছু না-ফরমান, যারা নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী (হয়ে বসে আছে)!

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَٰهُمَا الْكِتَٰبَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَٰهُمَا الصِّرَٰطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْءَاخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَٰلِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْءَاخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

রুকু ৪

১১৪. আমি মূসা ও হারুনের ওপর (অনেক) অনুগ্রহ করেছি, ১১৫. আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড়ো (রকমের এক) সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, ১১৬. আমি (ফেরাউনের মোকাবেলায়) তাদের (প্রভূত) সাহায্য করেছি, ফলে (এক পর্যায়ে) তারা বিজয়ীও হয়েছে, ১১৭. আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ (তাওরাত) দান করেছি, ১১৮. (এর মাধ্যমে) তাদের উভয়কে আমি (দ্বীনের) সহজ পথ বাতলে দিয়েছি, ১১৯. আমি অনাগত মানুষদের মাঝে তাদের উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখেছি, ১২০. সালাম বর্ষিত হোক মূসা ও হারুনের ওপর। ১২১. অবশ্যই আমি নেককার লোকদের এভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি! ১২২. (মূলত) এরা দুজনই ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ১২৩. (আমার বান্দা) ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের একজন; ১২৪. যখন সে তার জাতিকে (ডেকে) বলেছিলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে না? ১২৫. তোমরা কি 'বা'ল' দেবতাকেই ডাকতে থাকবে, (আল্লাহ তায়ালা-) যিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাঁকে (এভাবেই) পরিত্যাগ করবে? ১২৬. আল্লাহ তায়ালা– যিনি তোমাদের মালিক, মালিক তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও। ১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, কাজেই অতপর তাদের অবশ্যই (দন্ড ভোগ করার জন্যে) হাযির করা হবে, ১২৮. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা। ১২৯. আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উত্তম স্মরণ বাকী রেখে দিয়েছি, ১৩০. সালাম বর্ষিত হোক ইলিয়াস (-পন্থী নেক বান্দা)-দের ওপর। ১৩১. (তাদের স্মরণ অব্যাহত রেখে) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি! ১৩২. অবশ্যই সে ছিলো আমার নেক বান্দাদের মধ্যে একজন।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى الْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

১৩৩. নিসন্দেহে লূতও ছিলো রসূলদের একজন; ১৩৪. যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে (একটি পাপী সম্প্রদায়ের ওপর আগত আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি, ১৩৫. একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে, (কেননা) সে ছিলো পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৩৬. অতপর অবশিষ্ট সবাইকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি। ১৩৭. তোমরা তো (ভ্রমণের সময়) তাদের সে (ধ্বংসাবশেষ)-গুলোর ওপর দিয়েই ভোর বেলায় (পথ) অতিক্রম করে থাকো, ১৩৮. (অতিক্রম করো) প্রতি (সন্ধ্যা ও) রাতের বেলায়; তবুও কি তোমরা (এ ঘটনা থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

রুকু ৫

১৩৯. ইউনুসও ছিলো রসূলদের একজন; ১৪০. (এটা সে সময়ের কথা) যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি (মাল)-ভর্তি নৌযানে পৌঁছুলো, ১৪১. (নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায়) আরোহীদের মাঝে এ অলক্ষুণে ব্যক্তি কে, (অতপর) লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হলো এবং (ফলাফল অনুযায়ী) সে (ইউনুসই অলক্ষুণে) অপরাধী সাব্যস্ত হলো, ১৪২. অতপর একটি (বড়ো আকারের) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো, এ অবস্থায় সে (মাছের পেটে বসে) নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। ১৪৩. যদি সে (তখন) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা না করতো, ১৪৪. তাহলে তাকে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতে হতো! ১৪৫. অতপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) একটি গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, (এ সময়) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, ১৪৬. (সেখানে) তার ওপর (ছায়া দান করার জন্যে) আমি একটি (লতাবিশিষ্ট) লাউ গাছ উদগত করলাম, ১৪৭. অতপর তাকে আমি এক লক্ষ লোকের (জনবসতির) কাছে (নবী বানিয়ে) পাঠালাম; বরং এ সংখ্যা (অন্য হিসেবে ছিলো) আরো বেশী, ১৪৮. এরপর তারা (তার ওপর) ঈমান আনলো, ফলে আমিও তাদের একটি (সুনির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম;

তাফসীর

আয়াত ৬৯-১৪৮

আলোচ্য সূরার পূর্বের প্রসংগ ছিলো পরকালীন জীবন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা। এখন আলোচনা করা হচ্ছে কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বিষয়টি। এই আলোচনায় স্থান পাচ্ছে মানবতার ঊষালগ্ন হতে চলে আসা হেদায়াত ও গোমরাহীর দীর্ঘ কাহিনী। যুগে যুগে ও দেশে দেশে যে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। এর প্রমাণ পাই আমরা মক্কার কাফের মোশরেক সম্প্রদায়ের মাঝে। এরা আল্লাহর রসূলকে অস্বীকার করে এবং তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সেই ভ্রষ্ট ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের কাতারেই শামিল হয়েছে। কাজেই এদের পরিণতিও তাই হবে যা তাদের পূর্বসূরীদের হয়েছে। এই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই অতীতের সেই ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোমেনদেরও সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য তাদের সাথে রয়েছে। কারণ তিনি অতীতে কখনও মোমেনদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যাননি।

অতীতের এসব ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আংশিকভাবে নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক মুসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত এবং ইউনুস প্রমুখ নবী-রসূলদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে এবং দীর্ঘ আকারে ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনার ভেতর দিয়ে বিশ্বাস, ত্যাগ ও আনুগত্যের মহিমা ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে ইসলামের সত্যিকার রূপ ও পরিচয়। যার ধারক ও বাহক ছিলেন ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)। তাই এই সূরার প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে এসব ঘটনা। বলা হয়েছে,

'তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছিলো বিপথগামী ....।' (আয়াত ৬৯-৭৪)

অর্থাৎ ওদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার শেকড় গভীরে প্রোথিত। একই সাথে ওরা হচ্ছে অন্ধ অনুসারী, ওরা চিন্তা-ভাবনা করে না, বিচার-বিবেচনা করে না; বরং না দেখে এবং না বুঝেই পূর্বপুরুষদের ভুল পথে ধাবিত হয়। ফলে পূর্বপরুষদের ন্যায় এরাও বিপথগামী। সাবধান সতর্ক করার পরও তারা সেই ভুল পথেরই অনুসরণ করে চলেছে। তাই এদের পরিণতি কি হবে এবং আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের কি পরিণতি হবে সে সম্পর্কে ইংগিতময় ভাষা ব্যবহার করে বলা হচ্ছে, নূহ (আ.)-এর ঘটনার মাধ্যমে কাফেরদের পরিণতি এবং নেক বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও রহমতের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আর নূহ আমাকে ডেকেছিলো, তখন আমি কি চমৎকারভাবে তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম...........। (আয়াত ৭৫-৮২)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আ.) নিজ মালিক ও প্রভুকে ডাকছেন আর প্রভু তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। শুধু সাড়াই দিচ্ছেন না; বরং উত্তমভাবে ও পরিপূর্ণরূপে সাড়া দিচ্ছেন। তাকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে মহা প্রলয়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। মহা প্লাবনের কঠিন আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই সেই মহাপ্লাবন। যার করালগ্রাস থেকে কেবল তারাই রক্ষা পেয়েছে যাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ছিলো, করুণা ছিলো। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.)-এর বংশধরদের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে আবাদ করবেন এবং তার স্মৃতিকে যুগ যুগ ধরে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে টিকিয়ে রাখবেন। তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে শান্তি বর্ষিত হবে। বলা হচ্ছে, 'বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কারও প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন তার আর কি চাওয়ার আছে? কারণ, এর চেয়ে বড়

প্রতিদান আর কিছুই হতে পারে না। এরপর রয়েছে অমর স্মৃতির নিশ্চয়তা। এই প্রতিদান আর এই কৃপা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের বিনিময়। বলা হয়েছে, 'সে ছিলো আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম।' (আয়াত ৮১)

এটাই হচ্ছে মোমেন সম্প্রদায়ের শেষ পরিণতি। অপরদিকে নূহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে যারা কাফের ছিলো অবিশ্বাসী ছিলো, তাদের পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস ও বিনাশ। তাই বলা হয়েছে, 'অতপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।' (আয়াত ৮২)

মানব জাতির ঊষালগ্ন থেকেই আল্লাহর এই শাশ্বত ও চিরন্তন নিয়ম চলে আসছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের পরিণতি ধ্বংস, আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মুক্তি ও কল্যাণ।

এরপর আসছে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা। এই ঘটনা দুটো মূল পর্বে বর্ণিত হচ্ছে। প্রথম পর্বে এসেছে তার দাওয়াত ও তাবলীগের বর্ণনা, প্রতিমা ভাংগার বর্ণনা, তাঁকে হত্যা করার বর্ণনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে রক্ষা ও তার শত্রুদের লাঞ্ছিত অপমানিত করার বর্ণনা। এই বর্ণনা ইতিপূর্বে অন্যান্য সূরাতেও এসেছে, কিন্তু এই ঘটনার দ্বিতীয় পর্বটির বর্ণনা সম্পূর্ণ নতুন। এই বর্ণনা ইতিপূর্বে অন্য কোনো সূরায় আসেনি। পর্বটি হচ্ছে তাঁর স্বপ্ন, সন্তান যবাই করা এবং পরিশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিকল্প কোরবানী সংক্রান্ত। এই পর্বটি বিশদভাবে, অত্যন্ত আবেগময় ভাষা ও মনকে নাড়া দেয়ার মতো বর্ণনা ভংগির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। আনুগত্য, উৎসর্গ, কোরবানী এবং আত্মসমর্পণের এমন দৃষ্টান্ত ও রূপ গোটা মানব ইতিহাসে বিরল।

ঘটনার প্রথম পর্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে আয়াতে বলা হয়েছে, আর নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়েরই একজন ছিলো ইবরাহীম (আ.)।......... (আয়াত ৮৩-৮৭)

পৌত্তলিকদের সাথে হযরত ইবরাহীমের সংঘাত

নূহ (আ.)-এর ঘটনার সূত্র ধরেই ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। কারণ উভয়েরই আদর্শ অভিন্ন, মিশন অভিন্ন এবং পথও অভিন্ন। উভয়ের যুগের মাঝে বিরাট ব্যবধান থাকা সত্তেও ইবরাহীম (আ.)-কে নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়েরই একজন রূপে গণ্য করা হয়েছে। কারণ, দুজনের দুটো পথ একই কেন্দ্র থেকে বের হয়েছে, একই কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে এবং একই লক্ষ্যপানে প্রসারিত হয়েছে।

ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা, আকীদা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং বিবেকের অকৃত্রিমতার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'যখন সে তার পালনকর্তার কাছে সুষ্ঠ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিলো।' (আয়াত ৮৪)

আলোচ্য আয়াতের ভাব ও ভাষায় যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হলো, আল্লাহর প্রতি ইবরাহীম (আ.)-এর অগাধ বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাঁর হৃদয় ছিলো সুস্থ, পবিত্র, আবিলতামুক্ত, পঙ্কিলতামুক্ত এবং সুস্থ। সুস্থতা এমন একটি শব্দ যার আওতায় একাধিক গুণবৈশিষ্ট্য আসতে পারে। এই শব্দ দ্বারা পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, অকপটতা এবং চারিত্রিক নির্মলতা বুঝায়। তা সত্তেও শব্দটি শুনতে সহজ সরল মনে হয় এবং এর দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তা এই সবগুলো বিশেষণ একত্র করেও প্রকাশ পাবে না। এটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অপূর্ব বর্ণনাভংগির একটা নযির।

ইবরাহীম (আ.) যেহেতু সুস্থ ও পবিত্র মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি স্বজাতির ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, নিন্দা করেছেন। যারা সুস্থ বিবেক ও মন-মানসিকতার অধিকারী, যারা সৎ স্বভাবের অধিকারী এবং

সৎচিন্তা ও আচরণের অধিকারী, তারা সেই জাতীয় ভ্রষ্টতার নিন্দা না জানিয়ে পারে না। আর সেই কারণেই ইবরাহীম (আ.) স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেন,

'যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা কিসের উপাসনা করছো? (আয়াত ৮৫-৮৭)

ইবরাহীম (আ.) স্বচক্ষেই দেখেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ হাতে গড়া মূর্তি ও প্রতিমার পূজা করছে। তারপরও তিনি নিন্দার সুরে ও উচ্চকণ্ঠে তাদের জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমরা কিসের উপাসনা করছো?' এই প্রশ্ন তিনি করেছেন তাঁর পাপ পংকিলতামুক্ত সুস্থ বিবেকের তাড়নায়ই। কারণ তারা যেসব জড় পদার্থের উপাসনা করছে তা আদৌ উপাসনার পাত্র নয় এবং তাদেরও উচিত নয় এ সবের উপাসনা করা। মানুষ যখন সত্যের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গায়রুল্লাহর উপাসনা করে, তখন সেটা নিছক অপবাদ ও নিরেট মিথ্যায়ই পর্যবসিত হয়। তাই ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমরা কি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এই মিথ্যা অপবাদের দিকে পা বাড়াচ্ছো? আলোচ্য আয়াতে তাঁর বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

'তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছো? বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?' (আয়াত ৮৬-৮৭)

অর্থাৎ বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি এতোই নিচু? নিজ হাতে গড়া মূর্তির মাঝে তাঁর অস্তিত্ব খুঁজছো? এই প্রশ্নের মাঝে এক ধরনের নিন্দা ও ভর্ৎসনা রয়েছে, যা কেবল পংকিলতামুক্ত ও সুস্থ বিবেকের কারণেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর সেই জাতীয় প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন এমন কিছুর প্রকাশ ঘটে যা অনুভূতি এবং বিবেক বুদ্ধিকে আঘাত করে।

প্রশ্নের উত্তরে ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলেছিলো সে কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই প্রকাশ্য গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ.) মনের মাঝে কি দৃঢ় সংকল্প পোষণ করছিলেন সে প্রসংগ পরবর্তী আয়াতে এসেছে। বলা হয়েছে,

'অতপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করলো এবং বললো, আমি পীড়িত।' .... (আয়াত ৮৮-৯৩)

বর্ণিত আছে, সেদিন ছিলো তাদের উৎসবের দিন। খুব সম্ভবত নওরোজ বা নববর্ষের দিন হবে। এই দিন তারা মূর্তির সামনে ফলের নৈবেদ্য পেশ করে আনন্দ ফুর্তি করার জন্যে উদ্যানে যেতো, নির্জন স্থানে যেতো। আনন্দ ফুর্তি শেষে তারা ফিরে আসতো এবং মূর্তির সামনে রাখা নৈবেদ্য গ্রহণ করতো। ইবরাহীম (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়লেন, তাদের আদর্শিক ও নৈতিক পতন এবং পদস্খলনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন তখন তিনি মনে মনে একটা সংকল্প নিলেন এবং এই উৎসবের দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন। তিনি স্বজাতির বিপথগামিতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রষ্টতার কারণে মানসিকভাবে ভেংগে পড়েছিলেন, দৈহিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই জন্যে যখন তাকে উপাসনালয় ত্যাগ করার কথা বলা হলো, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি অসুস্থ', বাইরে গিয়ে ঘোরাফেরা ও আনন্দ ফুর্তি করার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই। কারণ বাগানে ও উদ্যানে তো কেবল তারাই যায়, যাদের মনে আনন্দ থাকে, ফুর্তি থাকে; যাদের মন চিন্তামুক্ত এবং ভাবনামুক্ত থাকে, কিন্তু ইবরাহীম (আ.)-এর মনে শান্তি ছিলো না, আনন্দ ছিলো না। তাই তিনি যা বলেছেন তা নিজের মানসিক অশান্তি ও দৈহিক ক্লান্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলেছেন যেন

সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো মিথ্যা বক্তব্য ছিলো না; বরং সেই উৎসবের দিনে তাঁর প্রকৃত অবস্থা যা ছিলো তাই তিনি অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন। বিরক্তি বিড়ম্বনাও যে কখনও কখনও অসুস্থতা এবং পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এটা একটা বাস্তব সত্য, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উৎসবের অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়ার জন্যে সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু ব্যতিব্যস্ত ছিলো, তাই ইবরাহীম (আ.)-এর অবস্থা তলিয়ে দেখার মতো সময় তাদের ছিলো না। ফলে তাঁকে ওখানেই ফেলে রেখে তারা চলে যায় এবং নিজেদের আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে, আর এভাবেই তিনি সেই মোক্ষম সুযোগটি পেয়ে যান যার অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন।

তিনি দ্রুত ওদের দেব-দেবীর কাছে চলে যান। সেখানে মজার মজার খাবার আর তরতাজা ফল রাখা ছিলো। তিনি রাগের স্বরে বললেন, 'কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছ না কেন?' স্বভাবতই তিনি সেই মূর্তিগুলোর কাছ থেকে এর কোনো উত্তর পেলেন না। ফলে তিনি আরও রেগে যান এবং তাচ্ছিল্যভরে পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'কি হয়েছে তোমাদের? তোমরা কথা বলছো না কেন?' এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে একটা চিরাচরিত মানসিক অবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই অবস্থার বশবর্তী হয়ে মানুষ এমন সব বস্তুকেও সম্বোধন করে কথা বলে, যেগুলোর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তার জানা থাকে এবং সে ভাল করেই জানে, এসব বস্তুর মাঝে শ্রবণেরও শক্তি নেই এবং বলারও শক্তি নেই। ঠিক এই পর্যায়ের মানসিক অবস্থারই শিকার হয়েছিলেন ইবরাহীম (আ.) যখন তিনি স্বজাতির ভ্রষ্টতার নমুনা স্বচক্ষে দেখতে পান এবং তাদের মনগড়া উপাস্যের মুখোমুখি হন।..... যা হোক, এবারও তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। ফলে তাঁর মনের ভেতর জমে ওঠা ক্রোধ এবার কথায় নয়; বরং কাজে প্রকাশ পেয়ে যায়। অর্থাৎ তিনি

'প্রবল আঘাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

আর এর মাধ্যমেই তিনি মানসিক অসুস্থতা, বিষণ্নতা ও চাপ থেকে নিষ্কৃতি পান।

ঘটনার সমাপ্তি এভাবেই ঘটে। এরপর আসছে নতুন ঘটনা। সম্প্রদায়ের লোকেরা ফিরে এসে তাদের দেব-দেবীর করুণ অবস্থা দেখে শিউরে ওঠে। এরপর তারা কি কি করেছিলো তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই, অন্য সূরায় আছে। সেখানে বলা হয়েছে, তারা অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্যে জিজ্ঞেসাবাদ করে, তদন্ত চালায়। অবশেষে তারা এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের নায়ককে ধরতে সক্ষম হয়। এখানে কেবল ইবরাহীম (আ.)-এর মুখোমুখি হয়ে তারা কি করলো সে কথায়ই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীতসন্ত্রস্ত পদে।' (আয়াত ৯৪)

অর্থাৎ লোকজনের মাঝে খবরটি জানাজানি হয়ে যায় এবং তারা বুঝতে পারে, কাজটি কে করেছে। ফলে তারা দ্রুত তার কাছে ছুটে আসে। বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ জনতা তার চার পাশে ভিড় জমাতে থাকে এবং উচ্চ স্বরে কথা বলতে থাকে। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা; কিন্তু ঈমানের বলে ছিলেন বলীয়ান। সঠিক পথটি তাঁর জানা ছিলো। নিজের উপাস্যের ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো। নিজের আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের রূপরেখা এবং চৌহদ্দি তাঁর জানা ছিলো। এই আকীদা বিশ্বাস তিনি নিজের মাঝে অনুভব করেন, নিজের আশপাশের জগতে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পান। তাই তিনি একা হলেও এই উদভ্রান্ত ও উত্তেজিত বিশাল জনগোষ্ঠীর তুলনায় ছিলেন অধিক শক্তিশালী। কারণ আকীদা বিশ্বাসে ছিলো ওরা ভংগুর, চিন্তা-চেতনায় ছিলো বিশৃংখল। তাই তিনি ওদের আদৌ কোনো পরোয়া করেননি, ওদের সংখ্যাধিক্য, ওদের আস্ফালন এবং উচ্চ কণ্ঠকে আদৌ আমলে আনেননি; বরং অত্যন্ত শান্ত ও সহজ কণ্ঠে ওদেরকে প্রশ্ন করেন–

'তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা করো কেন? অথচ আল্লাহ তোমাদের এবং তোমরা যা নির্মাণ করেছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ৯৫-৯৬)

অর্থাৎ প্রকৃত উপাস্যের গুণ হচ্ছে এই যে, তিনি সৃষ্টি করেন, কারও দ্বারা সৃষ্ট নন, আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন একমাত্র স্রষ্টা, কাজেই কেবল তিনিই হতে পারেন উপাস্য বা মাবুদ।

এই স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত বিষয়টি জানার পরও ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা নিছক অজ্ঞতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করলো না। বাতেলপন্থীরা কি আদৌ কোনদিন সত্যের সহজ সরল আহ্বানে সাড়া দিয়েছে? না, কখনও দেয়নি, আর সে কারণেই ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্যতম অত্যাচারে মেতে ওঠে। তারা নির্দেশ দিলো,

'এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ করো অতপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ করো।' (আয়াত ৯৭)

এটা হচ্ছে লাঠি ও অস্ত্রের ভাষা। এই ভাষায়ই যুগে যুগে অত্যাচারী ও জুলুমবাজরা কথা বলে থাকে। বিশেষ করে যখন তারা যুক্তি তর্কে হেরে যায় এবং সত্যের কঠিন বাক্য যখন তাদের চরম বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়।

তাদের এই বক্তব্যের পরে আর কি কি ঘটেছিলো সে প্রসংগ এখানে বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রসংগ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহাষড়যন্ত্র আঁটতে চাইলো, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম।' (আয়াত ৯৮)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই যদি ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে চান, তাহলে বান্দার ষড়যন্ত্রে কি কাজ হবে? স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালাই যদি তাঁর নেক বান্দাদের রক্ষা করতে চান তাহলে সেসব দূর্বল ও নগণ্য অত্যাচারী, অহংকারী, ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও তাদের উর্ধ্বতন সাংগ-পাংগরা কি করতে পারে?

ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র সন্তান লাভ ও পিতা পুত্রের পরীক্ষা

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার দ্বিতীয় পর্বটি আসছে। পিতার সাথে এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তাঁর যে ঘটনা ঘটেছিলো সে বর্ণনা আপাতত শেষ। তারা তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো, কিন্তু পরিণামে তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করেছেন।

এখন ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনের আর একটা ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে। সে দিকেই ইংগিত করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে বললো, আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।' (আয়াত-৯৯)

তিনি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। এই ত্যাগ স্থানের চেয়ে অধিক মানসিকতার ত্যাগ। তিনি নিজ অতীত জীবনের সকল ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনা ত্যাগ করছেন। নিজের পিতা, সম্প্রদায় পরিবার পরিজন, ঘর-বাড়ি, নিজের জন্মভূমি এবং জন্মভূমির সাথে যা কিছু জড়িত সব কিছুই তিনি ত্যাগ করছেন। লোকজনকে ত্যাগ করছেন এবং নিজের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সব কিছুই ত্যাগ করছেন। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হয়ে তিনি ছুটে চলেছেন নিজ প্রভুর পালনকর্তার পানে। নিজের গোটা অস্তিত্ব তাঁর কাছে সোপর্দ করছেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করছেন যে, প্রভু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, চলার পথে সহায় হবেন এবং সরল সত্য পথে পরিচালিত করবেন।

এটা হচ্ছে এক অবস্থা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক অবস্থায় উত্তরণ, এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে উত্তরণ এবং একাধিক বন্ধন ছিন্ন করে একক বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধকরণ, যেখানে থাকবে না অন্য কারও সম্পর্ক। এটা হচ্ছে চরম নিরপেক্ষতা, একনিষ্ঠতা, আত্মসমর্পণ, প্রশান্তি ও বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ।

যে মুহূর্তে তিনি পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছেন, সে মুহূর্তে তিনি অতীত জীবনের সকল স্মৃতি এবং জন্মভূমির সকল আকর্ষণ ও মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, যে মুহূর্তে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাচ্ছেন যারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলো, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী ও নিসংগ। ফলে যে প্রভুর পানে তিনি যাচ্ছেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই প্রভুর দরবারেই দু'হাত তুলে কাতরস্বরে বলছেন,

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এক সৎ পুত্র দান করো।' (আয়াত ১০০)

মহান করুণাময় আল্লাহ তাঁর এই ত্যাগী ও সৎ বান্দার ফরিয়াদে সাড়া দেন। কারণ সে তাঁর জন্যেই সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এবং তাঁর পানেই ছুটে এসেছে সুস্থ অন্তকরণ নিয়ে। তাই তার ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বলা হয়,

'সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম।' (আয়াত ১০১)

এই সহনশীল পুত্র আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। কারণ পরবর্তীতে তাঁর মাঝেই আমরা এই সহনশীলতা গুণের পরিচয় পাব। এই সুসংবাদ পেয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর মতো একজন নিসংগ নিসন্তান, পরবাসী এবং আত্মীয়স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ কতটুকু আনন্দিত হতে পারে তা আমরা অনুমান করতে পারি। আমরা আরও অনুমান করতে পারি, তিনি এই শিশুকে পেয়ে কতটুকু আনন্দিত হতে পেরেছিলেন যাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সহনশীল বলে আখ্যায়িত করছেন।

এখন আমরা দেখবো, এই অভূতপূর্ব ঘটনার কি প্রভাব পড়েছিলো খোদ ইবরাহীম (আ.)-এর এবং গোটা মানব জাতির জীবনে। এই ঘটনার বিবরণ আমরা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা ওহীর ভাষায় জানতে পারি। বলা হয়েছে, 'অতপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন সে (ইবরাহীম) বললো, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবাই করছি......।' (আয়াত-১০২)

কি অপূর্ব বিশ্বাস! কি অপূর্ব আনুগত্য! কি অপূর্ব আত্মসমর্পণ!

এই বয়োবৃদ্ধ ইবরাহীম, যিনি পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, যিনি নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে এসেছেন, তাকেই এই বৃদ্ধ বয়সে, এই অক্ষমতার মুহূর্তে একটি সন্তান দান করা হলো, কারণ তিনি তা কামনা করেছিলেন। তাকে সন্তান দান করা হলো এবং উত্তম এক সন্তান, যার সম্পর্কে স্বয়ং তার প্রভু সাক্ষ্য দিলেন যে, সে সহনশীল হবে, ধৈর্যশীল হবে। এই পরম কামনার সন্তানটির মাধ্যমে সবেমাত্র তিনি নিজের নিসংগতা দূর করতে পেরেছিলেন এবং তাকে নিয়ে এদিক সেদিক যাওয়া আসা করা আরম্ভ করেছিলেন, আর তখনই তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাকে নিজ হাতে যবাই করছেন। এটা যে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে কোরবানীর জন্যে একটা ইংগিত ছিলো, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাতে কি। তিনি সেই ইংগিত পেয়েই কোনো বিলম্ব করেননি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেননি; বরং তার মাঝে আনুগত্যের অনুভূতিই জাগ্রত হয়েছে। আত্মসমর্পণের মনোভাবই তার মাঝে জন্ম নিয়েছে। হাঁ, সেটা ইংগিতই ছিলো, নিছক একটা

ইংগিত। সেটা কোনো সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ ছিলো না, ছিলো না কোনো প্রত্যক্ষ নির্দেশ। কিন্তু ইংগিতটা তো ছিলো তার প্রভুর পক্ষ থেকেই। এটাই তো যথেষ্ট। তাই সেই ইংগিতেই তিনি সাড়া দিলেন। কোনো অভিযোগ করলেন না, কোনো প্রশ্নও করলেন না যে, কেন একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে যবাই করবেন?

তিনি বিরক্ত হয়ে সেই ইংগিতে সাড়া দিচ্ছেন না, ভয়ে কাতর হয়ে আত্মসমর্পণ করছেন না, অস্থিরতার বশবর্তী হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করছেন না– নিশ্চয়ই তেমন কিছুই নয়; বরং যা করছেন তা স্বেচ্ছায় করছেন, সজ্ঞানে করছেন, সন্তুষ্ট চিত্তে করছেন এবং অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে করছেন। এটা তার বক্তব্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ তিনি একটা গুরুতর বিষয় অত্যন্ত সুস্থিরভাবে এবং এক অদ্ভুত শান্ত মনে নিজের সন্তানের সামনে উপস্থাপন করে বলছেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বলো।'

এ ধরনের কথা কেবল তারাই বলতে পারে, যারা নিজেদের স্নায়ুর ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখে, যারা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও শান্ত থাকে এবং যারা নিজ দায়িত্বের ওপর অটল, অনড় থাকে। এ ধরনের বক্তব্য কেবল একজন মোমেনেরই হতে পারে। কারণ প্রকৃত মোমেন কখনও গুরুতর কোনো কাজের সম্মুখীন হলে বিচলিত হয় না, অস্থির হয়ে পড়ে না এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে না।

সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই নির্দেশটি ছিলো বড়ই কঠিন। কারণ তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্রটিকে কোনো যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবার নির্দেশ দিচ্ছেন না এবং তাকে এমন কোন কাজেও নিযুক্ত করার নির্দেশ দিচ্ছেন না যার কারণে তার জীবন চলে যাবে; বরং কাজটি স্বয়ং তাকেই করতে বলছেন। কি সেই কাজ? নিজ হাতে পুত্রকে যবাই করার কাজ! তা সত্ত্বেও তিনি এই নির্দেশ মেনে নিয়ে নিজের পুত্রের সামনে এভাবেই তুলে ধরছেন এবং তাকে চিন্তা-ভাবনা করে মতামত জানাতে বলছেন।

তিনি অতর্কিতভাবে ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে আপন প্রভুর নির্দেশের বাস্তবায়ন করেই কাজ শেষ করে দিচ্ছেন না; বরং তিনি বিষয়টি তার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন যেন একটা সাধারণ ও জানা-পরিচিত বিষয়। কারণ বিষয়টি তাঁর কাছে সে রকমই মনে হচ্ছিলো। প্রভু নির্দেশ করছেন, কাজেই তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য। তবে বিষয়টি ছেলেকে জানিয়ে নিলে ভালো হয়, যাতে কাজটা স্বেচ্ছায় সমাধা হয়, জোর জবরদস্তি করে না হয়। এর ফলে সেও আনুগত্যের প্রতিদান পাবে, আত্মসমর্পণের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর সন্তানও মনে প্রাণে আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ গ্রহণ করুক, যেমনটি তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং সাথে সাথে সেই মংগল ও কামিয়াবী লাভে সক্ষম হোক যেটাকে তিনি জীবনের চেয়েও অধিক স্থায়ী ও মূল্যবান মনে করেন। ছেলের অবস্থা কি দাঁড়ালো? পিতার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করার জন্যে তার সামনে যখন যবাই করার প্রস্তাব রাখা হলো, তখন তার প্রতিক্রিয়া কি ছিলো? সে তখন ঊর্ধ্বজগতে বিচরণ করছিলো। যেমনটি বিচরণ করছিলো তার পিতা। তাই তার উত্তর ছিলো এ রূপ,

'পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' (আয়াত ১০২)

সে এই ঐশী নির্দেশটি গ্রহণ করতে গিয়ে কেবল আনুগত্য ও আত্মসমর্পণই প্রদর্শন করছে না; বরং সাথে সাথে স্বতস্ফূর্ততা এবং আত্মবিশ্বাসও প্রদর্শন করছে। সে পিতাকে অত্যন্ত আদর ও

মহব্বতের সুরে সম্বোধন করছে। তার কণ্ঠে কোনো জড়তা নেই, তার মাঝে যবাই হয়ে যাওয়ার কোনো ভয়-ভীতি নেই, কোনো অস্থিরতা নেই, অসতর্কতা নেই; বরং সেই মুহূর্তে শিষ্টাচার সৌজন্যবোধও সে হারিয়ে ফেলেনি।

সে পিতাকে সম্বোধন করে বলছে, 'আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেলুন।' এই কথা বলার সময় তার অনুভূতিও তাই ছিলো যা তার পিতার ছিলো। সে বুঝতে পেরেছিলো, স্বপ্নও হচ্ছে এক প্রকার ঐশী ইংগিত, আর এই ঐশী ইংগিত নির্দেশেরই নামান্তর। কাজেই নির্দ্বিধায়, নিসংকোচে ও নিসন্দেহে এই নির্দেশ পালন করতে হবে।

এর পরের আয়াতে আল্লাহর প্রতি ইসমাঈল (আ.)-এর বিনয়, আদব ও শিষ্টাচার প্রকাশ পাচ্ছে, নিজের শক্তি সামর্থ্য ও ধারণ ক্ষমতার সীমারেখার ব্যাপারে তার জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে এবং দুর্বল মুহূর্তে সাহায্য কামনা, কোরবানীর জন্যে শক্তি কামনা এবং আনুগত্যের জন্যে সহায়তা কামনার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ চাহেন তো আমাকে আপনি ধৈর্যশীল পাবেন।'

আল্লাহর নামে কোরবান হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে ইসলাঈল (আ.) বীরত্ব প্রকাশ বা বাহাদুরী প্রকাশের কোন উপায় হিসেবে নেননি। এমন কি কোনো আগপাছ না ভেবে নিজেকে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যেও বিষয়টি গ্রহণ করেননি তিনি; বরং বিষয়টি গ্রহণ করার সময় নিজের ব্যক্তিত্বকে কোনো আমলেই আনেননি, নিজেকে মোটেও বড় করে দেখেননি। এসব কিছুকে তিনি আল্লাহর রহমত ও করুণা হিসেবেই দেখেছেন এবং এর জন্যে তাঁরই সাহায্য কামনা করেছেন, ধৈর্য ধারণের তাওফীক কামনা করেছেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি পরম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের উৎকৃষ্ট নমুনা।

পিতা-পুত্রের মধ্যকার আলাপ ও সংলাপের পর এখন আসছে মূল কাজ বাস্তবায়নের পালা। বলা হচ্ছে,

'যখন পিতা পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম তাকে যবাই করার জন্যে শুইয়ে দিলো।' (আয়াত ১০৩)

পিতা পুত্রের এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে আর একবার সত্যিকার আনুগত্য, ঈমানের মাহাত্ম্য ও পরম সন্তুষ্টি স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তির উর্ধ্বে স্থান পেলো।

নিজের পুত্রকে যবাই করার জন্যে পিতা তাকে উপুড় করে শোয়াচ্ছেন। ছেলেও নিজেকে পিতার হাতে সঁপে দিচ্ছে। কোনো বাধা নেই, কোনো নড়াচড়া নেই। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠবে।

পিতা পুত্র উভয়ই আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেদের সঁপে দিলেন। এটাই হচ্ছে ইসলাম। এই পরম আত্মসমর্পণের নামই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম। এতে থাকবে পরম আস্থা, বিশ্বাস, আনুগত্য, সন্তুষ্টি, আত্মসমর্পণ ও নিশর্ত বাস্তবায়ন। পিতা পুত্রের মাঝে এই অনুভূতিই কাজ করছিলো। কারণ তারা উভয়েই ছিলেন দুর্জয় ঈমানী বলে বলীয়ান।

এটা শৌর্য বীর্যের বিষয় নয় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার বিষয়ও নয়। কোনো যোদ্ধা উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করে কখনও হত্যাও করতে পারে এবং কখনও নিজেও নিহত হতে পারে। কেউ কেউ আবার কমান্ডো আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং ভালোভাবেই জানে যে, সে ওখান থেকে জীবিত ফিরে নাও আসতে পারে, কিন্তু ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) যা করেছেন তা এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রক্তের উন্মত্ততা নেই, উল্লাসের উদ্দামতা নেই এবং ভয় ও

আশংকা মিশ্রিত ব্যাকুলতা নেই। এখানে রয়েছে সুচিন্তিত, স্বতস্ফূর্ত ও সজ্ঞাত আত্মসমর্পণ। এখানে যা কিছু করা হচ্ছে তা জেনে শুনেই করা হচ্ছে, সন্তুষ্ট মনেই করা হচ্ছে, পরিণামের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই করা হচ্ছে। এখানে যা কিছু করা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে আনুগত্যের সুমধুর স্বাদ গ্রহণের বাসনা।

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর পক্ষে যা করার তা তারা করে ফেলেছেন, ঐশী নির্দেশের বাস্তবায়ন তারা ঘটিয়েছেন। এখন কেবল ইসমাঈলকে যবাই করা বাকী আছে, এটা আল্লাহর কাছে আদৌ কোনো ধর্তব্যের বিষয় নয়। কারণ তারা উভয়েই নিজেকে আল্লাহর সামনে সঁপে দিয়েছেন, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

পরীক্ষার পালা শেষ হয়েছে, ফলাফল সামনে এসেছে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন কেবল দৈহিক কষ্টই বাকী আছে, রক্তপাতই বাকী আছে, নিথর দেহই বাকী আছে, কিন্তু আল্লাহর তো এসবের প্রয়োজন নেই। তিনি বান্দাদের বিপদে ফেলে কষ্ট দিতে রাযি নন। তিনি তাদের রক্তও চান না এবং তাদের দেহও চান না। তিনি কেবল দেখতে চান, বান্দা তাঁর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কতটুকু আন্তরিক। যখন বান্দা এই আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে, নির্দেশ পালনে স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে, তখনই ধরে নেয়া হবে সে নির্দেশ পালন করে নিয়েছে এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর মাঝে আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, তারা তাঁর দেয়া নির্দেশ পালন করেছেন, বাস্তবায়িত করেছেন এবং সত্যে পরিণত করেছেন। তাই ইবরাহীম (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে ...।' (আয়াত ১০৪-১০৭)

অর্থাৎ তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছো এবং সত্যে পরিণত করেছো। এতোটুকুই যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার কাছ থেকে নির্ভেজাল ইসলাম, নিশর্ত আত্মসমর্পণ, যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ধন সম্পদের মোহ, জানমালের মায়া, এমন কি নিজের জান এবং নিজের কলিজার টুকরো সন্তানের মায়াও নয়। আর তুমি, হে ইবরাহীম, সেই ঈমান ও আত্মসমর্পণের পরিচয় দিয়েছো, সবকিছুই দান করেছো এবং সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটিও দান করেছো। আর এই দান করেছো স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সন্তুষ্ট চিত্তে এবং সরল বিশ্বাসে, এখন দান করার বাকী আছে কেবল রক্ত ও গোশত, এর পরিবর্তে একটা প্রাণী কোরবানী দেয়া। এই কোরবানী কিন্তু যেমন তেমন রক্ত-মাংসের পরিবর্তে নয়; বরং এমন একটি প্রাণের বিনিময়ে যে প্রাণ আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সেই নির্দেশ পালন করে দেখিয়েছে। তাই এই প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা এক মহান কোরবানীর ব্যবস্থা করেছেন। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে কোরবানী করার জন্যে একটা দুম্বা পাঠিয়েছিলেন, আর সেটাকেই ইবরাহীম (আ.) যবাই করেন।

এরপর ইবরাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলা হলো,

'আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (আয়ায় ১০৫)

অর্থাৎ এ জাতীয় পরীক্ষার জন্যে তাদের নির্বাচিত করার মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি, তাদের মন-মানসিকতাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো স্তরে উন্নীত করার মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো শক্তি ও ধৈর্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং প্রতিদানপ্রাপ্তির যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

মানব সমাজে কোরবানীর বিধান চালু

এভাবেই কোরবানীর ব্যাপারে যবাই করে রক্ত প্রবাহিত করার নিয়ম চালু হয়ে গেলো। ইসমাঈল (আ.)-কে কোরবানী করার জন্যে নিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে দুম্বা কোরবানী হয়ে যাওয়ার এই বিরাট ঘটনার মধ্যে এক চমৎকার উপদেশ রয়েছে, যা ঈমানের বাতিতে আলো সংযোগ করে এবং তার চতুর্দিককে প্রভায় দেদীপ্যমান করে তোলে। এই বিষয়টি আনুগত্যের সৌন্দর্যকে শাণিত করে আল্লাহর সকল ইচ্ছা সর্বান্তকরণে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সারা পৃথিবীর সকল মুসলমান এই পশু কোরবানীর মাধ্যমে পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসৃত কর্মপন্থার মূল্যায়ন করে। তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর ঈমান এবং তাঁর মালিকের প্রতি মহব্বতভরা আনুগত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাঁর মালিকও তাঁকে তার এই চরম ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর ত্যাগ ও নিঃশেষে সবকিছু আল্লাহর জন্যে বিলিয়ে দেয়ার এই দৃষ্টান্ত গোটা মুসলিম বিশ্বের মানুষের ঈমানকে মযবুত বানানোর জন্যে এবং সেই ঈমানকে যে কোনো মূল্য দিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্যে চিরদিনের তরে এক চূড়ান্ত ও চরম উদ্দীপক শিক্ষা হিসাবে বেঁচে থাকবে। ইবরাহীম (আ.)-এর কর্মধারা আরও জানিয়েছে যে, মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সর্বদাই দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা সর্বান্তকরণে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুসরণে কোরবানী করার মাধ্যমে তারা একথারই প্রমাণ দেয় যে, তারাও তাদের মালিকের হুকুম পালন করতে গিয়ে 'কেন করবে' তা জিজ্ঞেস করবে না, আল্লাহর হুকুম এসে গেলে তারা ইতস্তত করবে না, নিজেদের ইচ্ছা বা মর্জির ওপর চলার জন্যে কোনো জিদ করবে না এবং আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করার পর নিজেদের জন্যে বা নিজেদের আত্মীয়স্বজনের স্বার্থের জন্যে কোনো কিছু পৃথক করে রাখার চিন্তা করবে না। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত পালনে যে কোরবানী করা হয়, তা দ্বারা মুসলমানরা এটাও বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্যে কিছু কিছু কষ্টকর বা কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর বান্দাকে কষ্ট দিতে চান না; তিনি চান যে বান্দা রহমানুর রহীম আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তা মাথা পেতে নিক এবং সর্বান্তকরণে আনুগত্য করতে প্রস্তুত হয়ে যাক, আল্লাহর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তারা পালন করুক। তাঁর জন্যে যে কোনো কোরবানী দিতে সাগ্রহে তৈরী হয়ে যাক, তাহলে তিনিও তাদের সেভাবে সম্মানিত করবেন যেভাবে ইবরাহীম (আ.)-কে সম্মানিত করেছিলেন।

'আর আমি মহান আল্লাহ, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত আলোচনার ধারা পরবর্তী জনগণের মধ্যে চালু রেখেছি।'

অর্থাৎ তাঁর ইন্তেকালের পর যুগ যুগ ধরে শুধু নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ আলোচনা চালু রেখেছি এবং অনাদিকাল পর্যন্ত তা চালু রাখব। তিনি তাঁর এক ব্যক্তিসত্তার দ্বারাই সত্যপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী একটি অমর জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এইই হচ্ছে সেই মহাসম্মান যা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত লোকদের তিনি বরাবর দিয়েছেন ও দেবেন। তিনি অসংখ্য নবীর পিতা বা পূর্বপুরুষ এবং আজকের বিশ্ব-মুসলিমের বাপ; অর্থাৎ তিনি ইসলামের আদি রূপ, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও মহব্বতের এক জীবন্ত অবিস্মরণীয় নমুনা, তাঁর ঈমান, তাঁর আনুগত্য আল্লাহর মহব্বতে নিশেষে সবকিছুকে এবং সবাইকে পরিত্যাগ করা– সকল অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, পৃথিবীর সকল জাতি এবং সকল মানুষের জন্যে এক মহাবিস্ময়।

এজন্যে তাঁর পরে যেখানে যতো আল্লাহ-গত প্রাণ মানুষ এসেছে ও আসবে, সবার জন্যে তিনি এক অত্যুজ্বল আদর্শ এবং সবারই তিনি রূহানী পিতা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন শুধু একথার স্বীকৃতিই দেননি, বরং তিনি নিজেই এ কথার ঘোষণা দিতে গিয়ে বলছেন, 'সত্যের পথে টিকে থাকতে গিয়ে তোমরা যথাযথ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করো; তিনি তোমাদের (তাঁর দ্বীনের কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীন ইসলামের ওপর টিকে থাকা ও তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তোমাদের কোনো অসম্ভব সংকটের মধ্যে তিনি ফেলে দেননি। এ দ্বীন (ইসলাম) হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীমের অনুসৃত জীবন ব্যবস্থা ও আকীদা-বিশ্বাসের অবিকল প্রতিচ্ছবি। তিনি তোমাদের নাম ইতিপূর্বেই মুসলিম রেখেছেন এবং এই কেতাবের মধ্যেও তিনি তোমাদের সেই একই নামে ডেকেছেন। (আয়াত ২২-৭৮)

এই মুসলিম উম্মাহ তাঁরই আকীদা বিশ্বাসের ওয়ারিস বা ধারক বাহক। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই মুসলিম জাতির স্বার্থে ইবরাহীম (আ.)-এর মতো ও পথের ওপর ভিত্তি করে সারা পৃথিবীর মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যে তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাদের ওপর এ কাজ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এক বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে এ কর্তব্য স্মরণ করানোর জন্যে মুসলিম জাতির প্রতি তিনি বার বার তাঁর নিবেদিত বান্দা ও রসূল ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা প্রদর্শন করতে গিয়ে বলছেন,

'শান্তি (সালাম) বর্ষিত হোক ইবরাহীমের ওপর।'

অর্থাৎ তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর সালাম বর্ষিত হচ্ছে। ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর সালাম পাঠানোর এ ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর রবের পক্ষ থেকে অমর কেতাব আল কোরআনের মাধ্যমে, এ পাক কালামে তা উল্লেখিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হাঁ, আমি মহান আল্লাহ এমনি করেই এহসানকারী বা সৎ আচরণশীল লোকদের সাহায্য করে থাকি।'

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তাদের বালা-মসিবতের মধ্য দিয়ে প্রতিদান দিয়ে থাকি, কখনও তাদের প্রদত্ত সাহায্যের ওয়াদা পূরণ করার মাধ্যমে পুরস্কার দেই, আবার কখনও জনগণের মধ্যে তাদের চর্চা বৃদ্ধি করি এবং কখনও তাদের শান্তি ও সম্মান দান করার মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

'অবশ্যই ওরা আমার মোমেন বান্দা।'

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই যে স্বীকৃতি– এটাই তো ঈমানের আসল পুরস্কার, আর এটাই হচ্ছে সেই সত্য যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট বালা-মসিবত বা বিরাট বিরাট অগ্নি পরীক্ষা সহজ হয়ে যায়, স্তিমিত হয়ে যায় তার তীব্রতা। এরপর দেখুন কেমন করে তাঁর পরওয়ারদেগার স্বীয় মেহেরবানীর পরশে আর একবার তার করুণার মাধুরী বুলিয়ে দিচ্ছেন এবং কিভাবে তাকে তাঁর অপার নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাচ্ছেন; তাঁর (হতাশাব্যঞ্জক) বার্ধক্যের সময়ে তাঁকে এসহাক নামক আর এক পুত্র সন্তান দান করছেন। তাঁকে এর দ্বারা অভাবনীয় রহমত ও বরকত দান করছেন, এসহাককে তাঁর অফুরন্ত করুণার পরশ দিচ্ছেন এবং তাকে নবুওতরূপী মর্যাদা দিচ্ছেন, তাঁকে নেক লোকদের সর্দার বানিয়ে দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাকে এসহাক নামক এক পুত্র সন্তান দিয়েছি এবং তাকে নেক লোকদের নবী বানিয়ে দিয়েছি এবং তার ও এসহাকের ওপর রহমত বরকত (অভাবনীয় দয়া) নাযেল করেছি।'

কিন্তু পরবর্তীকালে যাদের তাঁর ওয়ারিস বলে অভিহিত করা হয়েছে, তারা কোনো রক্ত ও বংশ পরিচয়ের মাধ্যমে উত্তরাধিকার পায়নি, তারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাঁর প্রদর্শিত বাস্তব জীবনপদ্ধতিরূপেই এ উত্তরাধিকার পেয়েছে। সুতরাং যারা যারা এই জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করেছে তারাও পরম করুণাময় মালিকের করুণার স্পর্শে ধন্য হয়েছে, আর সত্য সমাগত হওয়ার পর যারা যারা সত্যের অনুসরণ করেছে তারাই মোহসেন, আর যারা যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে গেছে তারা অত্যাচারী, তারা যুলুমবাজ। তাদের বংশ পরিচয় বা ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে নিকট বা দূরের সম্পর্ক যাইই থাকুক না কেন, তাতে কোনো ফায়দা হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের উভয়ের (ইবরাহীম ও এসহাকের) বংশের মধ্যে ভালো লোকও ছিলো এবং তারাও ছিলো যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।'

ইবরাহীম (আ.)-এর পরবর্তী নবী রসূলদের ঘটনাবলী

ওপরে যে দুই জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উভয়ের বংশের মধ্যে ছিলেন নবী মূসা ও হারুন।

'আমি মহান আল্লাহ, মেহেরবানী করেছি মূসা ও হারুনের ওপর .... ওরা দুজনই ছিলো আমার মোমেন বান্দা।' (আয়াত ১১৪-১২২)

মূসা ও হারুন (আ.)-এর সময় যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের তৎকালীন সকল মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে পছন্দ করে নবী বানিয়েছেন এবং তাদের প্রতি বিরাট মেহেরবানী দান করেছেন। শুধু কি তাই? তাঁদের প্রতি যেমন প্রভূত এহসান করেছেন, তেমনি এহসান করেছেন তাঁদের জাতির সাথেও। তাঁদের সেসব কঠিন কঠিন দুঃখ থেকে নাজাত দিয়েছেন যার বিবরণ অন্যান্য সূরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাদের ফেরাউন ও তার সর্দারদের সীমাহীন যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন। অবশেষে ফেরাউন ও তার সভাসদদের ওপর তাঁদের বিজয়ী করেছেন। অতপর তাঁদের সুস্পষ্ট কেতাব দান করে এবং সরল সঠিক ও মযবুত পথে পরিচালনা করে সম্মানিত করেছেন। এ হচ্ছে সেই মযবুত পথ যার সন্ধান তিনি মোমেনদের দিয়েছেন এবং তাদের অনাগত ভবিষ্যতে বহুকাল ধরে মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। মহাকালের শেষ অবধি মানুষের মধ্যে তাদের চর্চা টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তারপর মূসা ও হারুনের প্রতি আল্লাহর সালাম বর্ষণের সাথে এ প্রসংগের ইতি টানা হয়েছে। অতপর সূরাটির বিভিন্ন অংশে এহসানকারীদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কত সদ্ব্যবহার করেন এবং তাদের কতভাবে পুরস্কৃত করেন সে বিষয়ে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে; উল্লেখিত হয়েছে তাদের সেই মযবুত ঈমানের কথা যার কারণে মোমেনদের তিনি চিরদিন সম্মানিত করে থাকেন।

এরপর মূসা ও হারুনের ঘটনাবলীর মতোই নবী ইলিয়াস (আ.)-এর আমলে সংঘটিত ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য সাধারণভাবে জানা যায়, প্রাচীন আমলের ইতিহাসে তাঁকে 'ইলিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে পাঠানো হয়েছে সিরিয়ায় একটি জাতির কাছে, যারা 'বা'ল' নামক এক প্রতিমার পূজা করতো, তাদের নগরীর কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও লেবাননের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন পল্লীতে দেখা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের মধ্যে অন্যতম .... অবশ্যই সে আমার অনুগত বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলো।' (আয়াত ১২৩-১৩২)

ইলিয়াস (আ.) ও তাঁর জাতিকে তৌহিদী বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন এবং 'বা'ল' নামক এক পাথর মূর্তির পূজার অসারতা ও কদর্যতা বর্ণনা করে তিনি এ অন্যায় কাজ

পরিত্যাগ করার জন্যে তাদের প্রাণপণ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদের একথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, পূজা অর্চনা বা অন্ধ আনুগত্য করা একমাত্র তাঁর জন্যেই সম্ভব যিনি 'সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী'। মানুষ ইট পাথর বা মাটি দিয়ে যেসব মূর্তি বানায় তাদের ওরা সৃষ্টিকর্তা মনে করে, তাদের সামনে মাথানত করে এবং তাদের খুশী করার চেষ্টা করে, এটা জঘন্য শেরেক। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের চিন্তা করার আহ্বান জানাচ্ছেন যে, সৃষ্টিকারী বলে যাদের তোমরা প্রচার করছো তারা তো এমনই নিকৃষ্ট যে, একটি মাছিও সৃষ্টি তারা করতে পারে না, অথচ তাঁকে পরিত্যাগ করছো যিনি সকল দিক দিয়ে পূর্ণাংগ সৃষ্টিকর্তা। তিনিই তাদের এবং তাদের পূর্ববর্তী সকল বাপ দাদাদের রব, মালিক মনিব, প্রতিপালক ও একচ্ছত্র অধিপতি। একইভাবে ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর পিতা এবং তাঁর জাতির মূর্তিপূজা রূপ জঘন্য আচরণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্যান্য রসূলরাও তাদের মূর্তিপূজারী জাতির অন্ধ বিশ্বাসজনিত পূজা অর্চনাকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিন্তু মহান এই পয়গম্বরকেও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা কসম খেয়ে বলছেন এবং পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে জানাচ্ছেন যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে মিথ্যাচার ও প্রত্যাখ্যানের স্বাদ গ্রহণের জন্যে (কেয়ামতের দিন) একত্রিত করা হবে। এই কঠিন পরিণতি থেকে ওদের মধ্যকার তারাই রেহাই পাবে যারা ঈমান এনেছে এবং একান্তভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর নিরংকুশ নিশর্ত আনুগত্য করেছে।

ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে পুনরায় রসূলদের সকলের সেই মূল দায়িত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যা পালনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্নভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। এহসানকারীদের প্রতিদান সম্পর্কিত বর্ণনা এসেছে এবং ঈমান ও মোমেনের যথাযথ মূল্য জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওপরে বর্ণিত ইলিয়াস (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এখানে আরও একবার পেশ করার পর আমরা আয়াত 'সালামুন আলা ইল ইয়াসীন'-এর ওপর একটু চিন্তা ভাবনা করতে চাই। দেখুন, ইলিয়াস নামটিকে একটু টেনে সুর দিয়ে উচ্চারণ করতে গিয়ে আল কোরআনে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুযায়ী কী চমৎকার একটি ধ্বনি উত্থিত হয়েছে।(১) 'ইল ইয়াসীন' ইল ইয়াসীন।

এরপর নযর পড়ছে লূত (আ.)-এর কেসসার প্রতি, যার বর্ণনা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বার বার এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিসন্দেহে লূতও ছিলো রসূলদের একজন.....রাতের বেলায়, তবুও কি তোমরা (এই বিরাট ঘটনা থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' (আয়াত ১৩৩-১৩৮)

নূহ (আ.) সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তার সাথে উপরোক্ত (লূত [আ.]-এর) ঘটনার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। উক্ত কাহিনী থেকে লূত (আ.) এর পয়গম্বর হওয়া এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গযব থেকে নাজাত লাভ করার কথা জানা যায়, জানা যায় সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও সত্য পথ পরিহারকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধংস হয়ে যাওয়ার সংবাদও। এতে গভীরভাবে সেসব আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে এ প্রসংগের ইতি টানা হয়েছে, যারা সকাল সন্ধ্যা লূত (আ.)-এর ধংসপ্রাপ্ত এলাকার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগে না, তারা সেসব ধ্বংসাবশেষের কাহিনীর কথা খেয়ালও করে না। আফসোস, তারা সেই চরম দুঃখজনক পরিণতির কোনো ভয়ও করে না।

---

(১) দেখুন 'আত্তাসওয়ীরুল ফান্নীউ ফিল কোরআন'।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা

মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আ.)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনার সাথে এ অধ্যায়টি সমাপ্ত হচ্ছে।

'আর ইউনুসও একজন রসূল ছিলো .... অতপর তারা ঈমান আনল, যার কারণে আমি মহান আল্লাহ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের ধনদৌলতসহ বিভিন্ন জীবন সামগ্রী সরবরাহ করতে থাকলাম।'

ইউনুস (আ.)-এর কওম যে ঠিক কোন এলাকায় বসবাস করতো আল কোরআন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানায়নি, তবে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, তাঁরা সাগর উপকূলবর্তী কোনো এক এলাকায় বাস করত। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়ে যে, তাঁর কওমের দুর্ব্যবহারের কারণে তাঁর অন্তরটা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলো, যার কারণে তিনি তাদের আসন্ন আযাবের ভয় দেখালেন এবং ভীষণভাবে রেগে গিয়ে তাদের পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। অতপর তাঁর ক্রোধ তাঁকে সাগর সৈকতের দিকে নিয়ে গেলো, যেখানে গিয়ে তিনি এক সমুদ্রগামী লোক ভর্তি জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজটি যখন গভীর মহাসাগরে উপনীত হলো তখন সমুদ্রবক্ষ প্রচন্ড বায়ু ও উত্তাল তরংগাভিঘাতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এসময় আরোহীরা প্রমাদ গুনল যে, অবশ্যই জাহাজের মধ্যে এমন কোনো অলক্ষুণে ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছে যার কঠিন অপরাধের কারণে তাদের আজকের এই দুর্গতি; তাকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করলেই হয়তো এই জাহাজটি ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে।

অতপর তারা যাত্রীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সেই অপরাধী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হলো এবং অবশেষে তাতে ইউনুস (আ.)-এর নাম ওঠলো। যদিও উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে তিনি ভালো মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন, তা সত্তেও লটারির মাধ্যমে তাঁর নাম বেরোনোতে তারা একে অধিকতর গুরুত্ব দিলো এবং নির্দ্বিধায় তাকে সেই বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে নিক্ষেপ করলো, আর অমনি এক বৃহদাকার মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেললো। তিনি তো 'নিন্দিতই' ছিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতই তিনি নিন্দার পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পরিত্যাগ করে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই তিনি তাঁর জাতিকে ছেড়ে দিয়ে শুধু নিজের জানটা নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। এরপর মাছের পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যখন ত্রুটি ধরা পড়লো তখন তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তাসবীহ জপতে শুরু করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন এবং বুঝলেন যে, অবশ্যই তিনি তাঁর অপরাধের কারণে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি পড়তে শুরু করলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, অবশ্যই আমি যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়েছি।' অতপর মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে পুরোপুরিভাবে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর সেই মাছটি তাকে উগরে দিলো ....এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তিনি তাসবীহ জপতে শুরু না করতেন তাহলে অবশ্যই কেয়ামত পর্যন্ত সেই মাছের পেটের মধ্যেই থেকে যেতেন।'

মাছটি তাকে উগরে দেয়ার পর তিনি যে মুহূর্তে বাইরে এলেন তখন তিনি উলংগ ও অসুস্থ অবস্থায় একটি দ্বীপের কিনারায় উৎক্ষিপ্ত হলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর তার জন্যেই আমি মহান আল্লাহ উৎপন্ন করলাম লতাবিশিষ্ট একটি লাউ গাছ।' 'ইয়াকতীন' বলতে কোনো কোনো সময় পানিকদু বা লাউও বুঝায়। ইউনুস (আ.) যখন দ্বীপের কিনারায় নিক্ষিপ্ত হলেন তখন তাঁকে সেই দ্বীপে উৎপন্ন লাউয়ের বিরাট পাতা ছায়া করে ফেললো

এবং সেই পাতাগুলো তাঁর গায়ে মাছি পড়া থেকে তাঁকে রক্ষা করলো। কথিত আছে, এমন গাছের কাছেও নাকি মাছি ঘেঁষে না। অবশ্য এটা ছিলো সম্পূর্ণ আল্লাহর তদবীর ও মেহেরবানীরই ফল। তারপর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর পরিত্যক্ত জাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি রাগ করে যখন তাদের ছেড়ে চলে এসেছিলেন তখন তারা একথা মনে করে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল ইউনূস (আ.) তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অবশ্যই তাদের সেই আযাব ঘিরে ফেলবে যার ভয় তিনি তাদের দেখিয়েছিলেন। এজন্যে ইউনুস (আ.) বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা অবিলম্বে ঈমান এনে ফেলেছিলো এবং তাওবা এস্তেগফার করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছিলো। কাজেই আল্লাহ তায়ালাও তাদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁর রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে পাওনা শাস্তি থেকে তাদের রেহাই দিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

তারপর তারা ঈমান আনল, যার কারণে আমি মহান আল্লাহ, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের দুনিয়ার সুখ সম্পদ দিয়ে ধন্য করলাম।'

এরা সংখ্যায় লাখখানেক কি তার থেকেও হয়তো কিছু বেশী ছিলো, তারা সবাই ইউনুস (আ.)-এর ফিরে যাওয়ার পর ঈমান এনোছিলো।

উপস্থিত প্রসংগের আলোচনায় ঈমানদারদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো এবং পাশাপাশি, পেছনের অন্যান্য কাহিনী থেকেও বে-ঈমানদের ওপর কি কি শাস্তি নেমে এসেছে তা বুঝা গেলো। সুতরাং মোহাম্মদ (স.)-এর জাতি যখন এ ঘটনাবলী পড়বে তখন তাদের বুঝমতো যে কোনো পথ বেছে নিতে পারবে।

এভাবে সূরা ইউনুসের এ অধ্যায়টিতে বর্ণিত দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক কাহিনীর আলোচনা শেষ হচ্ছে, যার ধারা বর্ণনা নূহ (আ.) এর আমল থেকে চলে আসছে। যাদের বিভিন্ন আদলে সতর্ক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকে ঈমান এনেছে এবং অনেকে ঈমান আনেও নাই। এরশাদ হচ্ছে,

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا

وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ

لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ

الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ اِلَّا مَنْ

هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾ وَّاِنَّا لَنَحْنُ

১৪৯. (হে নবী,) এদের তুমি জিজ্ঞেস করো, তারা কি মনে করে, তোমাদের মালিকের জন্যে রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য রয়েছে (সব) পুত্র সন্তান? ১৫০. আমি কি ফেরেশতাদের মহিলা করেই বানিয়েছিলাম এবং (বানাবার সময়) তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলো? ১৫১. সাবধান, তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে, ১৫২. আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, (আসলে) ওরা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) মিথ্যাবাদী। ১৫৩. আল্লাহ তায়ালা কি (ছেলেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানদের পছন্দ করেছেন? ১৫৪. এ কি (হলো) তোমাদের? কেমন (অর্থহীন) সিদ্ধান্ত করছো তোমরা? ১৫৫. তোমরা কি (কখনোই কোনো) সদুপদেশ গ্রহণ করবে না? ১৫৬. অথবা আছে কি (এর পক্ষে) তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ? ১৫৭. (থাকলে) তোমরা তোমাদের (সে) কেতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ১৫৮. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে; অথচ জ্বিনেরা জানে, অন্য বান্দাদের মতোই তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশের অধীন এবং তাদের মধ্যে যারা বদকার তাদের অবশ্যই (শাস্তির জন্যে) একদিন উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব (বেহুদা) কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র ও মহান, ১৬০. তবে (হ্যাঁ), যারা আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা তারা আলাদা। ১৬১. অতএব (হে কাফেররা), তোমরা এবং তোমরা যাদের গোলামী করো, ১৬২. (সবাই মিলেও) তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) বিভ্রান্ত করতে পারবে না, ১৬৩. তোমরা কেবল তাদেরই গোমরাহ করতে পারবে, যারা জাহান্নামের অধিবাসী। ১৬৪. (ফেরেশতাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তারা বলেছিলো,) আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্ধারিত (পবিত্র) স্থান রয়েছে, ১৬৫. আমরা তো (আল্লাহ তায়ালার সামনে)

الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি, ১৬৬. এবং (সদা সর্বদা) আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করি। ১৬৭. এসব লোকেরাই (কোরআন নাযিলের আগে) বলতো, ১৬৮. পূর্ববর্তী লোকদের কেতাবের মতো যদি আমাদের (কাছেও কোনো) উপদেশ (গ্রন্থ) থাকতো, ১৬৯. তাহলে (তার বদৌলতে) আমরাও আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম। ১৭০. অতপর (যখন তাদের কাছে আল্লাহর কেতাব এলো), তখন তারা তা অস্বীকার করলো, অচিরেই তারা (এ আচরণের পরিণাম) জানতে পারবে। ১৭১. আমার (খাস) বান্দা রসূলদের ব্যাপারে আমার এ কথা সত্য হয়েছে, ১৭২. তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, ১৭৩. এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে। ১৭৪. অতএব (হে নবী), কিছু কালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো, ১৭৫. তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে। ১৭৬. এরা কি (তাহলে) সত্যিই আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? ১৭৭. (এর আগে) যাদের (এভাবে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (গযব নাযিলের সে) সকালটা তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো! ১৭৮. অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো, ১৭৯. তুমি (শুধু) ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও, শীঘ্রই ওরা (সত্য প্রত্যাখ্যানের) পরিণাম (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করবে। ১৮০. পবিত্র তোমার মালিকের মহান সত্তা, তারা (তাঁর সম্পর্কে) যা কিছু (অর্থহীন) কথাবার্তা বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র (অনেক বড়ো, সকল ক্ষমতার একক অধিকারী), ১৮১. (অনাবিল) শান্তি বর্ষিত হোক রসূলদের ওপর, ১৮২. সমস্ত প্রশংসা (নিবেদিত) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

তাফসীর

আয়াত ১৪৯-১৮২

আলোচ্য সূরাটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতগুলোর আলোকে কেমনভাবে অতীতে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে তাদের কথা জানা গেছে। সেসব কাফের মোশরেকদের কঠিন পরিণতির কথাও জানা গেছে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের পূজা অর্চনা বা অন্ধ আনুগত্য করে অথবা তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টির কাউকে শরীক করে। সেসব সত্যবিরোধী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পাকড়াও করার ঘটনা সামনে রেখে এবং সূরাটির প্রথম পাঠের মধ্যে প্রকাশিত সত্যটিকে কেন্দ্র করে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, যেন পাঠকের দৃষ্টি মোশরেকদের সেই ঘৃণ্য কথার দিকে আকৃষ্ট হয় যা তারা ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলতো। তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করতো, যা এ সূরাটির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সকল যামানার কাফের ও মোশরেকরা যে বানোয়াট কথা বলে থাকে সেই মনগড়া মিথ্যা সম্পর্কে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি তাদের সাথে যুক্তিপূর্ণ বিতর্কে লিপ্ত হন, তিনি যেন তাদের সাথে আলোচনা করেন, তাদের সেই চরম মূর্খতাপূর্ণ উক্তি সম্পর্কে যেন চ্যালেঞ্জ করেন যা তারা বলতো। তারা বলতো, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে জ্বিনদের বংশগত কিছু সম্পর্ক আছে। তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর এই শেষ রসূল (স.)-কে পাঠানোর পূর্বে তারা কাতরভাবে আকাংখা প্রকাশ করতো যে, কত ভালো হতো যদি তাদের কাছে কোনো রসূল প্রেরিত হতেন। এতে বুঝা যায়, তারা যে মত ও পথের ওপর ছিলো এবং যে সমাজব্যবস্থা তাদের মধ্যে বিরাজ করছিলো, তাতে তারা মোটেই শান্তি পাচ্ছিলো না। এজন্যে তারা চাইছিলো যে, বিশ্ব পালকের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে কোনো পথপ্রদর্শক এসে তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। সুতরাং ওদের প্রশ্ন করার জন্যে রসূলকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, সেই রসূলই যখন তাদের মাঝে এসে গেলো তখন কেন তাকে তারা অস্বীকার করছে। কেন তাকে মিথ্যাবাদী বানাচ্ছে? আল্লাহ তায়ালা চাইছেন যে রসূলুল্লাহ (স.) তাদের সাথে এভাবে আলোচনা করুক এবং তাদের বিবেককে জাগানোর চেষ্টা করুক। এই রসূল তো তাদের অজানা কোনো লোক নন, জীবনের এমন একটি বড় অংশ তিনি তাদের মধ্যেই কাটিয়েছেন। যার মধ্যে মানুষের সকল ভালোমন্দ স্বভাব ও চেতনার পরীক্ষা হয়ে যায়। তিনি তো সেই আল আমীন যাকে তারা পরোপকারী এবং সকল গুণের অধিকারী বলে জেনেছে ও মেনেছে, কিন্তু পরবর্তীতে তার ওপর নানা প্রকার অপবাদ দিয়ে কোনোটাই তারা প্রমাণ করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা চাইছেন, তিনি তাদের সাথে একথা বলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হোন যে, সেই মহান রেসালাতের বার্তা যখন তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো তখন কোন যুক্তিতে তারা তাঁকে অস্বীকার করছে? এরপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহর ওয়াদা ও নিশ্চয়তা দানের সাথে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে। আরও জানানো হচ্ছে যে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের বিজয়ী করে থাকেন এবং তিনি সেসব দুর্বলতা বা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিরাজমান সেসব ত্রুটি ও কমতি থেকে মুক্ত, যা ওরা তাঁর সম্পর্কে বলাবলি করে থাকে। তাদের খেয়াল করা দরকার যে, সকল কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর যিনি জগতসমূহের মালিক ও প্রতিপালক।

'অতএব তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করো......... তোমাদের দাবীর সপক্ষে দলীলস্বরূপ কোনো গ্রন্থ নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ।' (১৪৯-১৫৭)

কাফেরদের অযৌক্তিক দাবীর অসারতা

মানুষ যে যাইই করুক না কেন, অবশেষে তাদের মিথ্যা ধরা পড়বেই, তাদের যুক্তিহীন কাজের জন্যে কখনও বিবেক তাদের দংশন করে, আর কখনওবা তাদের মিথ্যা আচরণের জন্যে নিজেদের পরিবার ও পরিবেশের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। মক্কা ও তার আশপাশের পৌত্তলিকদের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা কন্যা সন্তানদের ওপর পুত্র সন্তানদের প্রাধান্য দিতো এবং কন্যা সন্তানদের তারা অপয়া দুর্লক্ষুণে ও দুখ কষ্টের কারণ বলে মনে করতো। সাধারণভাবে তারা নারীদের পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদাশীল বলে ভাবত। এর পরও তারা মনে করতো যে, ফেরেশতারা হচ্ছে সবাই নারী এবং তারা আল্লাহর কন্যা।

তাই এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সেই অযৌক্তিক কথার জওয়াব দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, কাল কেয়ামতের দিন ইচ্ছাকৃত এসব মিথ্যা ও বানোয়াট কথার কারণে অবশ্যই তাদের তিনি পাকড়াও করবেন, তাদের এইসব নির্বোধ কাজ ও আচরণের জন্যে পাকড়াও করবেন, তাদের কাছে এইসব যুক্তিবুদ্ধিহীন উক্তি ও পদক্ষেপের জন্যে কৈফিয়ত তলব করবেন, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করতো। যেসব মাপকাঠি দিয়ে তারা জীবনের অনেক কিছুর ভালো মন্দের বিচার করতো, সেইগুলো দিয়েই তিনি তাদেরকে ধরবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করো তাদের কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে .... তোমার রবের জন্যে কি কন্যারাই উপযুক্ত আর তোমাদের জন্যেই রয়েছে সকল পুত্র ধনেরা?' (আহ্ কি চমৎকার তোমাদের পছন্দ জ্ঞান– তাই না?)

একদিকে তোমরা নারীদের কম মর্যাদাবান বলে অভিহিত করছো; আর যাঁকে রব বলে তোমরা জান ও মান বলে দাবী করো– তাঁর জন্যে তোমরা (তোমাদের বিবেচনায়) সেই কম মর্যাদাবান কন্যাদেরকে এবং তোমাদের নিজেদের জন্যে পুত্রদের বরাদ্দ করছো! অর্থাৎ মুখে মুখে রব, প্রতিপালক, মালিক-মনিব-ক্ষমতাবান ইত্যাদি গালভরা মহাসম্মানসূচক বুলি আওড়াও আর তাঁর জন্যে বরাদ্দ করো সেই তুচ্ছ (?) কন্যাদের– যাদের জন্মের খবরে তোমাদের মুখ ঘনান্ধকারে ছেয়ে যায়, সেটাই কি মালিকের জন্যে তোমাদের পছন্দ? এটাই কি তোমাদের সুবিচারের নমুনা? বাহ্, কি চমৎকার তোমাদের বুদ্ধি এবং কি চমৎকার তোমাদের যৌক্তিকতা! আসলে তাদের কোনো কথাই যুক্তির ধোপে টেকে না; সুতরাং জিজ্ঞেস কর তাদের কিভাবে তারা এই মিথ্যা ও রোগগ্রস্ত ধারণা করতে পারে! একইভাবে তাদের এটাও জিজ্ঞেস করো, এসব বেওকুফী তারা কেন করে? কোথায় পেয়েছে তারা ফেরেশতাদের নারী হওয়ার খবর? ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখেছে? না ওরা তাদের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছে?

'আর যখন আমি মহান আল্লাহ (তাদের বিবেচনায়) ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করছিলাম তখন ওরা দেখছিলো নাকি?'

আর দেখুন, আল্লাহর বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা ও মনগড়া কথা তারা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলো সেগুলো আল কোরআনে কিভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'দেখো তাদের মিথ্যা দোষারোপের কথার দিকে, তারা এভাবে বলে, আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী।'

তারা এতোদূর মিথ্যাবাদী যে, যা তারা বলে তা নিজেরাই বিশ্বাস করে না; তা না হলে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে জানা ও মানা সত্ত্বেও তাঁর জন্যে তারা নিজেদের অপ্রিয় জিনিসটি (কন্যা সন্তান) পছন্দ করতে পারে কি? তারা নিজেদের কথায় সত্যবাদী হলে কম মর্যাদাপূর্ণ ও তাদের নিজেদের কাছে অপছন্দীয় সেই কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে তারা পছন্দ করে কেমন করে?

'পুত্রের তুলনায় মেয়েদের (আল্লাহ তায়ালা) পছন্দ করেছেন!'

'কি হলো তোমাদের, কেমন ফয়সালা করছো তোমরা? তোমরা একটুও শিক্ষা গ্রহণ করো কি?'

অর্থাৎ তোমাদের এই আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে কোত্থেকে দলীল বা যুক্তি প্রমাণ হাযির করবে?

'আছে নাকি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ (যার ভিত্তিতে এসব কথা তোমরা বলো?) যদি থেকেই থাকে এমন কোনো প্রমাণ তো নিয়ে এসো না লিখিত সেই যুক্তিপূর্ণ কেতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো!'

দেখুন তাদের আর একটি মিথ্যা ও মুখোরোচক গল্প, পাক-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিনদের মাঝে কোনো বংশীয় সম্পর্কের কল্পনাপ্রসূত কথা,

'ওরা তাঁর ও জ্বিনদের মধ্যে বংশীয় বা ঔরসগত সম্পর্ক নিরূপণ করে, আর জ্বিনরা তো জেনেই নিয়েছে যে, তাদের আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে।'

তারা আর একটি ধারণাও করে যে, (সম্ভবত) ফেরেশতারাই আল্লাহ তায়ালার কন্যা, তাঁর সেই সন্তানদের জ্বিনরা জন্ম দিয়েছে, আর এই জন্যেই সেসব জ্বিনের সাথে তাঁর বংশগত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অথচ জ্বিনরা জানে যে, তারা নিজেরা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মতোই এক বিশেষ সৃষ্টি এবং কেয়ামতের দিন তাদের আল্লাহর হুকুমে তাঁর দরবারে একত্রিত করা হবে। কাজেই দেখা গেলো, কোনো যুক্তিতেই আল্লাহর সাথে কারো বংশীয় বা আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না।

এভাবে এইসব মিথ্যা ও মনগড়া কাহিনী থেকে আল্লাহ তায়ালা যে সম্পূর্ণ পবিত্র তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

মহান আল্লাহ, 'মহা পবিত্র তিনি সেইসব জিনিস থেকে যা ওরা তাঁর ওপর আরোপ করছে।'

তবে মনে রাখতে হবে যে, সকল জ্বিন এক প্রকার নয়, তাদের মধ্যে অনেক মোমেন জ্বিনও আছে; তাদের কেয়ামতের সেই কঠিন আযাবে নিপতিত জ্বিনদের থেকে দূরে রাখা হবে এবং যাদের জোর করে সেই কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তবে, বাদ দেয়া হবে তাদের যারা আল্লাহর মোখলেস বান্দা।'

অতপর মোশরেক ও তাদের কাল্পনিক মাবুদদের সম্বোধন করা হচ্ছে এবং তাদের বাজে ও সত্য বিরোধী আকীদাসমূহের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এভাবে ব্যাখ্যায় বুঝা যাচ্ছে যে, ফেরেশতাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মোশরেকদের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব (হে কাফেররা), তোমরা .... আমরা তার পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা করি।' (আয়াত ১৬১-১৬৬)

ফেরেশতাদের সেইসব মিথ্যা গল্পের ব্যাপারে খবর নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জন্যে এমন স্থান নির্ধারিত রয়েছে যার বাইরে তারা যেতেই পারে না। কেননা তারা তো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত তাঁরই বান্দা। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থেকে তাদের প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আনুগত্যভরা হৃদয় নিয়ে তারা সবাই আল্লাহর সামনে অবনমিত হয় এবং এজন্যে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে তারা আল্লাহর কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সদা- সর্বদা তাঁর গুণগান গায় এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমা ও স্থানে অবস্থান

করে। যেখান থেকে (ইচ্ছা করলেও) তারা বেরোতে পারে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজ ক্ষমতায় অনন্য।

এরপর মোশরেকদের সম্পর্কে কথা আসছে, যারা মুক্ত মনে ও নির্দ্বিধায় এসব খোশগল্প রচনা করে; অতপর তাদের বিভিন্ন বিষয়ক চুক্তি এবং বহু মানুষের সাথে করা ওয়াদা সম্পর্কিত কথা পেশ করা হচ্ছে। এসব মোশরেকের সেসব আক্ষেপপূর্ণ কথা তুলে ধরা হচ্ছে। যা তারা আহলে কেতাবদের হিংসা করতে গিয়ে বলতো। তারা বলতো, তাদের কাছে যদি অনুরূপ কোনো আসমানী কেতাবের মাধ্যমে আগত মূল্যবান উপদেশমালা থাকতো, থাকতো যদি প্রাচীনকালে আগত মহামানব ইবরাহীম অথবা তাঁর পরবর্তীতে আসা অন্য কোনো মহামানবের উপদেশবাণী, তাহলে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা খাঁটি ঈমানদার এবং ভালো মানুষ হয়ে যেতো এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পছন্দ করতেন, মর্যাদাবান বানাতেন। তাই ওদের কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা অবশ্যই বলতো, যদি আমাদের কাছে থাকতো পূর্ববর্তী জনগণের কাছে আসা কোনো আসমানী কেতাব বা কোনো উপদেশবাণী, তাহলে আমরা তাঁর খাঁটি ও খাস বান্দায় পরিণত হয়ে যেতাম।'

অবশেষে যখন তাদের কাছে সেই উপদেশমালা এসে গেলো, যা এর আগে আসা অন্য সকল কেতাব ও উপদেশবাণী থেকে শ্রেয়, তখন তারা অপছন্দ করলো এবং সে আসমানী বার্তা প্রত্যাখ্যান করলো। এরশাদ হয়েছে,

'তারা সে বার্তা অস্বীকার করলো, ফলে শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।'

শীঘ্রই তারা জানতে পারবে কথাটির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন এক ধমকের ইংগিত নিহিত রয়েছে। রয়েছে তাদের অস্বীকৃতির উপযোগী শাস্তির সংকেত। কারণ এ হেদায়াত বাণী ছিলো তাদেরই কাম্য এবং কাংখিত বার্তা। তারা ওয়াদা করেছিলো, আসমানী কেতাব এলে তার ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের এ কামনা পূরণ করলেন তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। আর সেই তিরস্কারের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রসূলদের সাথেও সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্যে ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে, অবশ্যই ওদের সমর্থন দেয়া হবে, ওদের সাহায্য করা হবে এবং নিশ্চয়ই আমার সেনাদল বিজয়ী হবে, অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করা হবে এবং আল্লাহর কথাকে সত্যে পরিণত করা হবে। কারণ অন্তরের অনেক গভীরে আকীদা বিশ্বাসের শেকড় প্রোথিত হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন প্রকার বাধা বিপত্তি সত্তেও ঈমানের ভিত্তি মযবুতভাবে সংস্থাপিত হয়েছে। প্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যের বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, নবীকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছে, সত্যের অনুসারীদের মারধর করেছে এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। আল্লাহর রসূলদের নেতৃত্বে ইসলামী ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মোশরেক ও কাফেরদের সকল আকীদা বিশ্বাস সেই সকল রসূলদের প্রভাবাধীন বিস্তীর্ণ এলাকাসহ আরও বহু এলাকা থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দূরীভূত হয়েছে এবং তাদের রাজ্যে একমাত্র সেইসব আকীদা চালু হয়েছে যা নিয়ে রসূলরা দুনিয়ায় এসেছেন। তাদের প্রচারিত আকীদা মানুষের অন্তর ও তাদের বুদ্ধিকে পরিচালনা করেছে এবং তাদের ধারণা ও তাদের চেতনা বদলে দিয়েছে। এরপর দুনিয়ার যত বিভ্রান্তি এসে থাক না কেন এবং যতো মত ও পথই চালাবার চেষ্টা চলে থাক না কেন, অবশেষে আল্লাহর বিশাল এ

সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা চালু হয়ে গেছে এবং রসূলরা তাদের কাছে আনীত আল্লাহর দেয়া আকীদাগুলোকে পর্যুদস্ত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সকল চিন্তাধারা ও সকল দর্শন পরাজয় বরণ করেছে, এমনকি সেই এলাকাতেও সেইসব দার্শনিক চিন্তা পরাভূত হয়েছে যেখানে তার উৎপত্তি হয়েছিলো এবং রসূলদের আনীত মতাদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিরদিনের জন্যে আল্লাহর ওয়াদা বহাল রয়েছে যে, রসূলদের (এবং তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের প্রতিনিধিগণকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দান করা হবে এবং তাঁর বাহিনীই অবশেষে বিজয়ী হবে।

এই হচ্ছে সাধারণভাবে সত্যের প্রকৃতি এবং তা পরিষ্কারভাবে সর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র পরিদৃশ্যমান রয়েছে এবং আল্লাহর দিকে আহবানের জন্যে উচ্চারিত সকল দাওয়াতের মধ্যে এই কথাটাই তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দাওয়াতদানকারী মোমেনদের বিশেষভাবে আল্লাহর সেনাদল বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, অবশ্যই এই সেনাদলকে বিজয়ী করা হবে, যেখানে যেখানে তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে বা তাদের কাজ করার পথে জটিলতা আসবে যেখানে অবশ্যই তারা গায়বী মদদ লাভ করবে। তাদের জীবন বিপন্ন করার জন্যে বা তাদের কাজ ব্যাহত করার জন্যে যত প্রকার জটিলতাই সৃষ্টি করা হোক এবং যত আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরকই ব্যবহার করা হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য মোমেনদের জন্যে অবধারিত। মিথ্যা প্রচার এবং মনগড়া কথা, সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও একমাত্র শত্রুতার উদ্দেশ্যেই যে বিরোধিতা করা হয়-এসবের ফল এক এক সময় এক এক রকমের হয়ে থাকে; কিন্তু অবশেষে রসূলদের প্রতি আল্লাহর দেয়া ওয়াদাই সত্যে পরিণত হয়। অবশ্য একথা সত্য, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর সেনাদলকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়, তখন সারা দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়েও তাদের পর্যুদস্ত করতে চাইলে তারা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্যের ওয়াদা হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে অন্যতম। গ্রহ উপগ্রহ ও তারকারাজির সুসংগঠিত আবর্তনের মধ্যে তাঁর এ নিয়ম চালু রয়েছে, রাত্রি দিনের আনাগোনার মধ্যেও এটা আছে। এই নিয়মের অধীনেই বৃষ্টির পানি বর্ষিত হয়ে মৃত যমীন থেকে জীবনের উৎপত্তি হচ্ছে, সবাই ও সবার জীবন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপির কাছে দায়বদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সবাইকেই তাঁর মুখাপেক্ষী থাকতে হয়, যখন যার জন্যে ইচ্ছা তিনি তাঁর এ অমোঘ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, কিন্তু ভবিষ্যত কি হবে না হবে এবং মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের পরিণতি কি হবে তা বাহ্যিক কিছু লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও মানুষ অনেকাংশে অনুমান করতে পারে অবশ্য এটা সত্য যে, এ সব লক্ষণ কোনোকালেই পরিবর্তন হয় না বা এসব লক্ষণের বিপরীত কোনো দিন কিছু হয়েছে বলে দেখা যায়নি। এসব লক্ষণ মানুষের অজান্তেই বাস্তবায়িত হতে থাকে, যা না হলেও সরাসরি মানুষ অধিকাংশ সময়ে অবচেতন মনে অনুভব করে। কারণ মানুষ চায়, বিজয় আকারে আল্লাহর ফয়সালা ও সরাসরি সাহায্য তাৎক্ষণিক আসুক; কিন্তু তাদের ইচ্ছা ও চাহিদা মতোই আল্লাহর সাহায্য আসবে এমন নয়। তাঁর সাহায্যদানের বিশেষ এক পদ্ধতি রয়েছে যা নতুন কোনো এক নিয়মে তারা অনুভব করবে, তবে নির্দিষ্ট এক সময় পার হওয়ার পরই তা বাস্তবায়িত হবে।

মোমেনদের সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেনাবাহিনী এবং তাঁর রসূলদের অনুসারীদের প্রতি নানা প্রকার সাহায্যের যে ওয়াদা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট নিয়মে তিনি দান করে থাকেন; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা

দিতে চান অন্য আর এক প্রকার সাহায্য, যা হবে আরও বেশী ভালো, আরও টেকসই। অতএব, আল্লাহ তায়ালা যা চান তাইই হবে। তাতে যদি তাঁর সেনাবাহিনীকে আরও বেশীদিন কষ্ট পেতে হয় অথবা আরও বেশীদিন সহ্য করতে হয় বা পেছনের তুলনায় যদি আরও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় অথবা অনুমানের চাইতে আরও বেশী অপেক্ষা করতে হয়- তাহলে তাই হবে। বদর যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানরা তো চেয়েছিলো যে কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলাটি তাদের হস্তগত হোক; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন তুচ্ছ ও সামান্য লাভজনক সেই কাফেলা তাদের হস্তগত না হোক; বরং তাদের মোকাবেলা হোক কোরায়শদের বিশাল বাহিনীর সাথে এবং তারা যুদ্ধ করুক দুর্ধর্ষ এক সেনাদলের সাথে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন ইসলাম ও মুসলমানের আরও বড় কল্যাণ হোক; এজন্যে আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর রসূল তাঁর সেনাদল এবং তাঁর দাওয়াতের বিজয় আসতে বিলম্ব হয়েছিলো।

এটাও হয়েছে যে, কোনো কোনো যুদ্ধে আল্লাহর সৈন্য পরাজিত হয়েছে এবং আজও কখনও কখনও তাদের ওপর মসিবত আসে- আসে তাদের ওপর নানা পরীক্ষা। কারণ এইসব বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরও বড় বড় সমর ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চান, আর এজন্যে তিনি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশ ও তাদের ধারণ ক্ষমতাকে এতোদূর প্রস্তুত করতে চান যেন সেই কঠিন সময়ে আরও ব্যাপকভাবে তারা আল্লাহর সাহায্য কাজে লাগাতে পারে, আরও দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর সাহায্য পেতে পারে এবং এ সাহায্যের প্রভাব আরও গভীরভাবে ও দীর্ঘতর সময় পর্যন্ত তাদের উৎসাহিত করতে পারে।

অতীতের ইতিহাস সামনে রাখলে উপরোক্ত কথাটির যথার্থতা মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে এবং দেখতে পাবে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর নিয়ম প্রমাণিত হয়েছে, যার ব্যতিক্রম কোনো দিন হয়নি এবং আল্লাহর এ ওয়াদার বাস্তবতা একক বা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা কোনো আকস্মিক ঘটনা বলে মানুষ কখনও বুঝেনি। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই (আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ জানাচ্ছি যে,) আমার সাহায্য দেয়ার ওয়াদা আমার প্রেরিত বান্দাদের ওপর সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্যই ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আমার বাহিনী (অবশেষে) অবশ্যই বিজয়ী হবে।'

এ চূড়ান্ত ওয়াদার ঘোষণা দেয়ার সময় এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি সেই অন্যায়কারী কাফের মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদের জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর ওয়াদা ও চূড়ান্ত কথা যথার্থভাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তাদের ছেড়ে দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাইছেন যে, মহানবী (স.) তাদের কঠিন ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ তাদের ওপর শাস্তি যে নেমে আসবেই, এটাও আল্লাহর ওয়াদা। এ ওয়াদা যখন বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের কি করুণ পরিণতি হবে তা নিজ চোখে দেখার জন্যে আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানুহু তাঁর নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব (হে নবী), কিছুকালের ....যাও, শীঘ্রই ওরা (তাদের এই নির্মম সত্য প্রত্যাখ্যানের) পরিণাম (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করবে।' (আয়াত ১৭৪-১৭৯)

অর্থাৎ, হে রসূল, ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাদের সংগে ছিন্ন কর সমস্ত সম্পর্ক এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার মেলামেশা করো না; ছেড়ে দাও তাদের সেই দিনের জন্যে যখন তাদের তুমি আযাবের মধ্যে আহাজারি করা অবস্থায় দেখতে পাবে এবং দেখবে তাদের ও তোমার

সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দেয়া ওয়াদা কেমন করে পূর্ণ হচ্ছে। আজকের এই সুখের দিনে সেই অকৃতজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা আমার অমোঘ আযাবের ব্যাপারে কত ব্যস্ততাই না দেখাচ্ছে। আফসোস, যখন তাদের ওপর সেই আযাব এসেই পড়বে, তখন তাদের কি অবস্থা যে হবে তা এখন কিছুতেই কল্পনা করা যায় না; সেই জাতির এলাকায় তখন আযাব এসে যাবে তখন তারা নিজেদের নিন্দিত, বিপর্যস্ত ও আত্ম-গ্লানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় দেখতে পাবে, কষ্টের চোটে হাত-পা ছুঁড়তে থাকবে, কিন্তু সেই আযাব থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই তারা খুঁজে পাবে না। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সতর্ক করার জন্যে বহু সতর্ককারী পর্যায়ক্রমে তাদের কাছে এসেছে।

তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ বার বার এসেছে। এ ভয়ানক নির্দেশের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড এক ধমক। বলা হচ্ছে,

'ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' একইভাবে ইংগিত দেয়া হচ্ছে এক অতি কঠিন অবস্থার দিকে যা শীঘ্রই আসবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি দেখো, অতপর শীঘ্রই ওরাও দেখবে।' কিন্তু কি দেখবে সে কথাটি অস্পষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, যার কারণে এতো সাংঘাতিক পরিণতির ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

সূরাটি সমাপ্ত করতে গিয়ে যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহর পবিত্র হওয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে, তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা জানানো হচ্ছে, আরও জানানো হচ্ছে যে, সকল রসূলদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অজস্র সালাম। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, যিনি গোটা বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক, যাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর কেউ নেই। এরশাদ হচ্ছে, 'সকল মান মর্যাদার অধিকারী তোমার রব, তিনি পবিত্র সেই সকল দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা থেকে যা তাঁর সম্পর্কে ওরা বলে থাকে। সকল রসূলদের প্রতি সালাম এবং যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতিত্ব আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের মালিক-মনিব ও প্রতিপালক।'

এটাই হচ্ছে আলোচিত সূরার মধ্যে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনার উপযুক্ত পরিসমাপ্তি, আর যা কিছু সূরাটির মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে সেসব কিছুর মূল জিনিসই হচ্ছে তার শেষের এই কথাগুলো।

সূরা ছোয়াদ

আয়াত ৮৮ রুকু ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢ كَمْ
اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣ وَعَجِبُوْٓا اَنْ
جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ
امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا
فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ
بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ج بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. সোয়াদ, উপদেশভরা (এ) কোরআনের শপথ (তুমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার একজন রসূল); ২. কিন্তু কাফেররা (এ ব্যাপারে) ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামিতে (ডুবে) আছে। ৩. এদের আগে আমি কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (আযাব আসার পর) তারা (সাহায্যের জন্যে) আর্তনাদ করেছে, কিন্তু সে সময় তাদের পালানোর কোনো উপায় ছিলো না। ৪. এরা এ কথার ওপর আশ্চর্যবোধ করেছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী (নবী) এলো, (নবীকে দেখে) কাফেররা বললো, এ হচ্ছে একজন যাদুকর, মিথ্যাবাদী, ৫. সে কি অনেক মাবুদকে একজন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। ৬. তাদের সর্দাররা এই বলে (মজলিস) থেকে সরে পড়লো, যাও, তোমরা তোমাদের দেবতাদের (এবাদাতের) ওপরই ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই এর (দাওয়াতের) মধ্যে কোনো অভিসন্ধি (লুকানো) রয়েছে। ৭. আমরা তো এসব কথা আগের বিধান (খৃস্টবাদ)-এর মধ্যে শুনিওনি, (আসলে) এ একটি মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, ৮. আমাদের মধ্যে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি, যার ওপর উপদেশসমূহ নাযিল হলো; (মূলত) ওরা তো আমার (নাযিল করা) উপদেশ (এ কোরআন)-এর ব্যাপারেই সন্দিহান, (আসলে) তারা (তখনও) আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদনই করেনি;

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝٩ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١٠ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ
مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو
الْأَوْتَادِ ۝١٢ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْأَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝١٣ إِن
كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا
لَهَا مِن فَوَاقٍ ۝١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦

৯. (হে নবী,) তাদের কাছে কি তোমার মালিকের অনুগ্রহের ভান্ডার পড়ে আছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতা, ১০. আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর (ওপর) আছে কি তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব? থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণের ব্যবস্থা করুক। ১১. অন্য বহু বাহিনীর মতো এ বাহিনীও পরাজিত হবে। ১২. এদের পূর্বেও রসূলদের (এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছিলো– নূহ, আদ ও কীলক বিশিষ্ট ফেরাউনের জাতি, ১৩. সামূদ, লূত সম্প্রদায় এবং বনের অধিবাসীরাও; (তারা তাদের স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বড়ো বড়ো) দল তো ছিলো সেগুলোই। ১৪. ওদের প্রত্যেকেই রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, ফলে আমার (আযাবের) ফয়সালা (ওদের ওপর) প্রযোজ্য হয়ে গেলো।

রুকু ২

১৫. এরা অপেক্ষা করছে এক মহা গর্জনের, (আর) তখন কারো কিন্তু কোনো অবকাশ থাকবে না। ১৬. এ (নির্বোধ) লোকেরা বলে, হে আমাদের মালিক, হিসাব কেতাবের দিনের আগেই আমাদের পাওনা তুমি মিটিয়ে দাও!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটা মক্কী। মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত যেসব বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে, এ সূরায়ও প্রধানত সেগুলোই আলোচিত হয়েছে। যেমন, তাওহীদ, মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে প্রেরিত ওহী এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ। এই তিনটি বিষয় সূরার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বক্তব্যের ওপরে যে ১৬টা আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, এগুলো নিয়েই সূরার প্রথম অধ্যায়। মক্কার নেতৃস্থানীয় মোশরেকদের যখন রসূল (স.) আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয় বলে তাদেরকে জানাতেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রসূলরূপে মনোনীত করার কথা অবহিত করতেন, তখন তারা যে বিস্ময় প্রকাশ করতো, সেটাই এ আয়াতগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়। বলা হয়েছে, 'তারা এতে অবাক হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে

তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। আর কাফেররা বলেছে যে, এ ব্যক্তি তো মিথ্যাবাদী যাদুকর। সে কি এতোগুলো মাবুদকে এক মাবুদ বানিয়ে দিলো? এতো একটা চরম বিস্ময়কর ব্যাপার।' (আয়াত ৪-৮)

অনুরূপভাবে তারা এ দাওয়াত অস্বীকার করলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে বলে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, সেই হুমকির প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন (আয়াত-১৬ বলা হয়েছে) 'তারা বললো! হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রাপ্য অংক হিসাবের দিনের আগেই দিয়ে দাও।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহী নাযিল করার জন্যে তাদের ভেতর থেকেই একজনকে বিশেষত আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ (স.)-কে মনোনীত করতে পারেন এটা তাদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিলো। কেননা ইতিপূর্বে তিনি সমাজের কোনো পর্যায়ে কোনো নেতৃত্ব দেননি। এ জন্যে সূরার শুরুতে তাদের এই বিস্ময় প্রকাশের ওপর এবং তাদের 'আমাদের সবার মধ্য থেকে শুধু ওর ওপরই স্মরণিকা নাযিল হলো নাকি?' এই উক্তির ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন; 'তোমার পরম দাতা, মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সমস্ত রহমতের ভান্ডার কি ওদের কাছে? অথবা আকাশ, পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রাজত্ব কি ওদের? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওরা রশি ঝুলিয়ে আকাশে ওঠে যাক।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়াবশত যখন তাঁর কোন মনোনীত ব্যক্তিকে কিছু দিতে চান তখন তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে না। আকাশ পৃথিবীর রাজত্বে ও সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনো মানুষেরই কোনো হাত নেই। তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও জীবিকার যতোটুকু যাকে দিতে চান দেন, তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য মনে করেন তাকে মনোনীত করেন এবং বিনা হিসাবে, বিনা বাধায় ও বিনা শর্তে তাকে রকমারি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। এই প্রসংগে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে কি বিপুল অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, নবুওত ও রাজত্ব দান করেছেন, পাহাড় ও পাখিদের তার হুকুমের অনুগত করে দিয়েছেন, জ্বিন ও বাতাসকে তার তাবেদার বানিয়েছেন, এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, দ্রব্যসামগ্রী ও পৃথিবীর অগাধ ধন সম্পদ তো ছিলোই।

এসব সত্ত্বেও তারা উভয়ে নিছক মানুষ। মানুষ হিসাবে তারা স্বভাবসুলভ দুর্বলতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নন। কেবল আল্লাহর মেহেরবানী ও পৃষ্ঠপোষকতা তাদের দুর্বলতা অক্ষমতা দূর করে দেয়, তাদের তওবা ও আনুগত্য গ্রহণ করে এবং তাদের আল্লাহর পথে বহাল রাখে।

এই কাহিনী দুটোর সাথে সাথে রসূল (স.)-কে কাফেরদের পক্ষ থেকে আগত অত্যাচার ও নিপীড়নে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উপদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করার। হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনীতে এই শিক্ষাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ওরা যা কিছু বলে তাতে ধৈর্য ধারণ করো এবং আমার বান্দা শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ করো। সে খুবই অনুগত।'

অনুরূপভাবে হযরত আইয়ুবের কাহিনীতেও আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের কিভাবে কঠিন বিপদ ও রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। হযরত আইয়ুবের ধৈর্য অতি উচ্চাংগের ধৈর্যের নমুনা। এ কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, ধৈর্যের ফলে হযরত আইয়ুব শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পান, আল্লাহর রহমত লাভ করেন এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় স্নেহময় হাতের পরশ দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করেন। এ কাহিনী বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর মক্কায় অবস্থানকালে আপতিত নির্যাতনের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, এই

পরীক্ষার পেছনে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত রয়েছে এবং আল্লাহর ভান্ডার থেকে সেই রহমত যখন তিনি ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণে বিতরণ করেন।

ভূমিকার পরে এই কাহিনীগুলো সূরার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে। সূরার দ্বিতীয় অধ্যায় এগুলোরই সমষ্টি।

অনুরূপভাবে সূরাটায় কাফেরদের পক্ষ থেকে আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে। 'তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আযাবের প্রাপ্য অংশ বিচারের দিনের আগেই দিয়ে দাও।' এর জবাবে কাহিনীগুলোর পর কেয়ামতের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্যে আল্লাহভীরু সৎলোকদের জন্যে যে নেয়ামত সঞ্চিত এবং কাফেরদের জন্যে যে জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই দুই দলের আখেরাতের অবস্থানে কত পার্থক্য, তাও এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে যারা ক্ষমতাশালী ও অহংকারী ছিলো, আখেরাতে তারা নিজেদের পরিণামও দেখবে, আর সেসব দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের দেখবে, যাদের সাথে তারা দুনিয়ায় ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাস করতো। তারা কোনো মান্যগণ্য প্রভাবশালী লোক না হয়েও আল্লাহর কৃপা করুণা লাভ করতে পারবে, এটা ছিলো তাদের কল্পনারও অতীত। সেখানে মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে থাকবে পরম শান্তিময় নিবাস। (আয়াত ৫০, ৫১, ও ৫২)

আর আল্লাহদ্রোহীদের জন্যে থাকবে জঘন্যতম আশ্রয়স্থল। (আয়াত ৫৫, ৫৬ ও ৫৭) তারা জাহান্নামে পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে, ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকবে এবং মোমেনদের সাথে কিভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তা স্মরণ করবে। 'তারা বলবে ব্যাপার কি, যে লোকগুলোকে আমরা দুষ্কৃতকারী বলে গণ্য করতাম, এখানে তাদের দেখি না কেন?' (আয়াত ৬২, ৬৩ ও ৬৪)

বস্তুত তাদেরকে তারা জাহান্নামে কোথাও খুঁজে পাবে না। তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা জান্নাতে অবস্থান করছে। এভাবেই তাদের তাড়াতাড়ি আযাব নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে।

আখেরাতের এ দৃশ্যটা নিয়ে সূরার তৃতীয় অধ্যায় গঠিত হয়েছে।

এরপর চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, রসূল (স.)-এর ওপর ওহী নাযেল হওয়ার বিষয়টা কাফেররা অস্বীকার করতো। এ অধ্যায়ে তার জবাব দিতে গিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে উর্ধ্বজগতে ঘটনাটা ঘটেছিলো, সেখানে তো রসূল (স.) উপস্থিত ছিলেন না। স্বয়ং আদম (আ.) ব্যতীত আর কোনো মানুষই তা দেখেনি এবং সেখানে উপস্থিত থাকেনি। তাহলে মোহাম্মদ (স.) সে ঘটনা কিভাবে জানলেন? একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ওহীর মাধ্যমে এটা জানিয়েছেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইবলীস হযরত আদমকে দেয়া অগ্রাধিকার মেনে নেয়নি বলেই মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়েছে। মক্কার কোরায়শরাও ঠিক তেমনিভাবে তাদের আর সবাইকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ (স.)-কে ওহী নাযেলের জন্যে মনোনীত করায় তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের এ ভূমিকা ও আচরণ অভিশপ্ত বিতাড়িত ইবলীসের ভূমিকা এবং আচরণের সাথে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রাখে।

এই চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এর শেষ বক্তব্যে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের জানিয়ে দেন যে, তিনি যে দাওয়াত দেন তাতে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই, এ জন্যে তিনি পারিশ্রমিক চান না এবং এ দাওয়াত কতো গুরুত্বপূর্ণ তা তারা অচিরেই জানতে পারবে। (আয়াত ৮৬, ৮৭ ও ৮৮)

সূরার আলোচ্য বিষয়গুলো এই চারটি অধ্যায়ে এভাবে আলোচিত হয়েছে। এর ভেতর দিয়ে এক পর্যায়ে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে যারা রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং রসূল ও মোমেনদের ওপর নিজেদের বড়াই জাহির করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১১, ১২, ১৩ ও ১৪)

আল্লাহর রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরাজয় ও ধ্বংসের বিবরণ সম্বলিত মানবেতিহাসের এই মর্মান্তিক ও দৃষ্টান্তমূলক অধ্যায়টাকে মানুষের চিত্তপটে আরো একবার তুলে ধরা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদের কিভাবে সম্মানিত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং সাহায্য ও করুণায় ভূষিত করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন হযরত দাউদ, সোলায়মান ও আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনীতে।

উক্ত উভয় প্রকারের পরিণতি এই ইহকালীন জগতেই ঘটেছে। এরপর মানুষকে দেখানো হয়েছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামত পরবর্তী বেহেশতের নেয়ামত, সম্পদ, সন্তোষ এবং ভালো ও মন্দ কর্মফল। আখেরাতের অবিনশ্বর জগতের উক্ত কর্মফল হলো তা থেকে ভিন্ন ধরনের।

সর্বশেষ অধ্যায়টাতে মানব জাতির প্রথম প্রজন্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মানব জাতি তার প্রথম শত্রুর পক্ষ থেকে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এ কাহিনীতে। এই শত্রু চিরদিন তাকে পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃতভাবে বিপথগামী করে থাকে, অথচ মানুষ সব কিছু জেনেও তার সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

কেসসা কাহিনীর এক পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে নিহিত এক মহাসত্যের প্রতি মানব জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই মহাসত্যটাই নবী রসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে এক মহাসত্য বদ্ধমূল করতে চান। সে সত্যটা এই যে, আমি আকাশ ও পৃথিবী নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এ ধরনের মনোযোগ আকর্ষণী বক্তব্যের বহু দৃষ্টান্ত কোরআনে রয়েছে। কোরআনের মক্কায় নাযেল হওয়া অংশে বর্ণিত মৌলিক আকীদাগত বিষয়ের মধ্যে এটা একটা বহুল আলোচিত বিষয়।

এবার আসুন, আমরা বিস্তারিত তাফসীরে মনোনিবেশ করি।

তাফসীর

আয়াত ১-১৬

'সোয়াদ, উপদেশে পরিপূর্ণ কোরআনের শপথ।' (আয়াত ১, ২ ও ৩)

মহান আল্লাহ এখানে এই সোয়াদ অক্ষর এবং উপদেশে পরিপূর্ণ কোরআন উভয়েরই কসম খেয়েছেন। এ অক্ষরটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি এটাকে মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত একটা ধ্বনি হিসাবে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আরবী বর্ণমালার একটা বর্ণ হিসাবেও সৃষ্টি করেছেন, যা দিয়ে কোরআন রচিত হয়েছে। এ বর্ণমালা মানুষের ক্ষমতার আওতাধীন। অথচ কোরআন মানুষের ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। কেননা কোরআন আল্লাহর রচিত। কোরআন মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এমন এক নিপুণ শিল্প, যার সমকক্ষ কোনো কিছু তৈরী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তা সে কোরআনেই হোক বা কোরআনের বাইরেই হোক। আর এই সোয়াদ ধ্বনিটা কণ্ঠনালী থেকে উচ্চারিত হওয়া স্বয়ং কণ্ঠনালী ও উক্ত ধ্বনির স্রষ্টা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং কুদরতের বলেই সম্ভব হচ্ছে। মানুষ এ ধরনের কণ্ঠনালী সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, যার ভেতর দিয়ে এই ধ্বনিগুলো বের হয়। দেহ ও মনের সমন্বয়ে মানুষের যে সত্ত্বা গঠিত, তা তার সবচেয়ে কাছের

জিনিস। এই সত্ত্বার ভেতরে যেসব খুঁটিনাটি জিনিস রয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে সে দেখতে পাবে যে, তার প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসেও বহু অলৌকিক উপাদান রয়েছে। এগুলো যদি মানুষ বুঝতো, তা হলে আল্লাহর মনোনীত একজন মানুষের কাছে তাঁর কাছ থেকে ওহী আসাতে সে এতোটা হতবুদ্ধি হয়ে যেতনা। প্রত্যেকটা মানুষের দেহে ও মনে এতো সব অসংখ্য অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকা যতখানি বিস্ময়োদ্দীপক, ওহীর আগমন তার চেয়ে বেশী বিস্ময়োদ্দীপক নয়।

আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম আয়াতে বলেন,

'সোয়াদ, এবং উপদেশপূর্ণ কোরআনের কসম,

কোরআন যুগপৎ উপদেশ ও আইন গ্রন্থ

এ কথা সত্য যে, কোরআনে শুধু উপদেশই থাকে না, থাকে অন্যান্য জিনিসও, যেমন আইন ও বিধান, কেসসা কাহিনী, আর সুসভ্য জীবন যাপনের উপকরণ ও পদ্ধতি সমূহ। তবে আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশটাই সর্বাগ্রে আবশ্যক এবং এগুলোই সর্বপ্রথম। এগুলোই কোরআনের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য। সত্য বলতে কি, আইন বিধান এবং কেসসা কাহিনীও আসলে এই উপদেশমালারই অংশ। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটাই আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর দিকে মন ঝুঁকিয়ে দেয়। 'যিয্ যেকর' শব্দটার অর্থ যেমন 'উপদেশপূর্ণ' হতে পারে, তেমনি এর অর্থ আলোচনায় পরিপূর্ণ অথবা 'প্রখ্যাত' হতে পারে। বস্তুত এটাই কোরআনের আসল গুণ বৈশিষ্ট্য,

'বরং কাফেররা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত।'

বক্তব্যের ভেতরে এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় যেন এখানে প্রথম আলোচ্য বিষয়টায় ছেদ পড়েছে। অর্থাৎ সোয়াদ ও কোরআনের নামে শপথ করেই ক্ষান্ত থাকা হচ্ছে। অথচ শপথের বিষয়টা শেষ হলো না বলে মনে হচ্ছে। কেননা কেবল শপথের উল্লেখ করা হয়েছে, শপথ করে যে কথাটা বলা হবে তা এখনো বলা হয়নি। এর অব্যবহিত পরেই মোশরেকদের এবং তাদের অহংকার ও বিরোধিতার বিষয়টি এসে গেছে, কিন্তু প্রথম আলোচিত বিষয়ে এই ছেদ পড়াটা আসলে বাহ্যিক। এ দ্বারা পরবর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ানোই উদ্দেশ্য। সোয়াদ ও উপদেশপূর্ণ কোরআনের কসম খাওয়া থেকেই বুঝা যায়, পরবর্তীতে যা বলা হচ্ছে তা এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে ব্যাপারে আল্লাহর কসম খাওয়াও বেমানান নয়। এরপর মোশরেকদের অহংকার ও কোরআনের বিরোধিতার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত 'বরং' কথাটার আগে এবং পরে যা বলা হয়েছে, দুটোই আসলে একই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বাচনভংগিতে এই মোড় পরিবর্তনটা অত্যন্ত তীব্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে দিল যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেন, আর কোরআন থেকে মোশরেকদের অহংকারভরে মুখ ফেরানো ও তার বিরোধিতাকে যে গুরুত্ব দেন, এই উভয় গুরুত্বের পার্থক্য কতখানি। মোশরেকদের অহংকার এবং বিরোধিতাও একটা গুরুতর ব্যাপার বই কি!

এরপর এই অহংকার ও বিরোধিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরই মতো অহংকারী, বিরোধিতাকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী অতীতের মোশরেকদের ধ্বংসের কাহিনী তুলে ধরেছেন। তাদের ধ্বংসের করুণ দৃশ্য তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, আযাব এসে যাওয়ার পর তারা অনেক আর্তনাদ করেছে। অহংকার ও বিরোধিতা পরিত্যাগ করে নতিস্বীকার করেছে, কাকুতি মিনতি করে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছে, কিন্তু তাতে কোনোই কাজ হয়নি। কারণ এ সবের জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় ছিলো তা এতোক্ষণে পার হয়ে গেছে।

'আমি তাদের আগের কত জাতিকে ধ্বংস করেছি। তখন তারা আর্তনাদ করেছে, কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ ছিলো না। (আয়াত ৩)

হয়তো বা মক্কার এই মোশরেকরাও তাদের বর্তমান আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়ার পর অহংকার ও বিরোধিতা থেকে ফিরে আসবে। সেসব অতীত জাতিগুলোর মতোই আর্তনাদ করবে, করুণা ভিক্ষা করবে, কিন্তু একইভাবে তা বৃথা যাবে। অথচ এখনও তাদের হাতে অবকাশ রয়েছে। নিষ্কৃতির সকল সযোগ ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এবং আর্তনাদ ও কাকুতি মিনতির আগে এখনো সময় রয়েছে। এরপর আর কোনো সাহায্য ও মুক্তির সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহর রসূলকে যাদুকর আখ্যা দেয়ার ঘটনা

মোশরেকদের অহংকার ও বিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার আগে অতীতের করুণ ইতিহাসের এক ঝলক দেখিয়ে তাদের বিবেককে কষাঘাত করা হচ্ছে। এরপর তাদের অহংকার ও বিরোধিতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে,

তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী তাদের কাছে আসায় তারা বিস্মিত হয়েছে এবং কাফেররা বলেছে, এতো একজন মিথ্যাবাদী যাদুকর। (আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৮)

যে কথার মধ্য দিয়ে তাদের অহংকার ফুটে ওঠেছে তা হলো, 'আমাদের মধ্য থেকে কেবল তার ওপরই উপদেশ নাযেল হয়ে গেলো?' আর যে কথার মধ্য দিয়ে বিরোধিতা ফুটে ওঠেছে তা হলো, সমস্ত দেব-দেবীকে সে মাত্র একজন দেবতায় পরিণত করে ফেললো?' 'আমরা সর্বশেষ ধর্মে এমন কথা শুনিনি'........ 'এতো মিথ্যাবাদী যাদুকর।' 'সবই বানোয়াট কথা, আল্লাহর রসূল মানুষের মধ্য থেকে হওয়ায় বিস্ময়বোধ করাটা অনেক পুরনো ব্যাপার। বহুবার এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সকল জাতিই এ কথা বলতো এবং এই কারণ দেখিয়ে নিজেদের ঈমান আনার অক্ষমতা প্রকাশ করতো আদিকাল থেকেই। এতদসত্ত্বেও আবহমানকাল ধরে মানুষই নবী রসূল হয়ে এসেছে, আর এতদসত্ত্বেও মানুষ বার বার এই আপত্তিই তুলতে থেকেছে।

'তারা অবাক হয়ে গেছে এজন্যে যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছে।'

অথচ যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে সবচেয়ে সংগত ব্যাপার এটাই যে, মানুষের মধ্য থেকেই মানুষের পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী আসা উচিত। মানুষই বুঝতে পারে মানুষ কিভাবে চিন্তা করে, কী তার অনুভূতি, তার অন্তরে কি চিন্তাভাবনার উদয় হয়। তাদের দেহমনে কি টানাপড়েন চলে, তারা কি কি ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করে। কিসের কিসের দিকে ঝোঁক আকর্ষণ বোধ করে, কি কি চেষ্টা সাধনা তারা করতে সক্ষম কিংবা অক্ষম, কি কি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় তারা এবং কি কি উপকরণ তাদের ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

যে মানুষ অন্য মানুষের সাথেই বসবাস করে, তার জীবন সেই মানুষদের জন্যে অনুকরণীয় হতে পারে। কেননা তারা মনে করে যে, সে তাদেরই একজন। সে যা করতে পারে তা আমরা কেন করতে পারবো না? সে তো আমাদেরই মতো, সে যে মতবাদ নিজে পালন করছে এবং অন্যদের তার দিকে দাওয়াত দিচ্ছে, তা সব মানুষেরই পালনযোগ্য। কেননা একজন মানুষ তাদের সামনেই তা পালন করছে। সে মানুষটা তাদেরই বংশধর। তাদের ভাষাতেই সে কথা বলে এবং তাদের ভাষা, আদত অভ্যাস, রীতিপ্রথা এবং জীবনের খুঁটিনাটি সব তথ্যই তার জানা। এ জন্যে তার সাথে তাদের কি খুব বেশী প্রভেদ নেই। জাতীয়তার দিক দিয়েও নয়, ভাষার দিক দিয়েও নয় এবং জীবনের স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়েও নয়।

কিন্তু যে জিনিসটা হওয়া সবচেয়ে বেশী দরকারী ও সবচেয়ে বেশী সংগত, সেই জিনিসটা নিয়েই কাফেররা চিরকাল বিস্ময় প্রকাশ করেছে, অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। কেননা মানুষের মধ্য থেকে রসূল নিযুক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা তারা বুঝতো না। রেসালাতকে আল্লাহর দিকে বাস্তব পথ প্রদর্শনের উপায় হিসাবে না দেখে তারা একটা কাল্পনিক, রহস্যময়, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য জিনিস হিসাবে বিবেচনা করতো। রেসালাতকে তারা এমন একটা উড়ন্ত ও বায়বীয় জিনিস মনে করতো, যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, আলোতে দেখা যায় না, সুস্পষ্টভাবে চেনা এবং বুঝাও যায় না, পার্থিব জীবনে যার অস্তিত্ব নেই। তারা একে একটা রূপকথার কল্পকাহিনী হিসাবেই বিবেচনা করতো, যা তাদের পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়া কল্পকাহিনীগুলোর মতো।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রেসালাতকে বিশেষত সর্বশেষ রসূলের রেসালাতকে মানব জাতির জন্যে বাস্তব, স্বাভাবিক, পূত পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উচ্চমানের জীবন পথ হিসেবে মনোনীত করলেন। তিনি এটাকে একটা বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করেন। কাল্পনিক, অস্পষ্ট স্বপ্নিল ও রহস্যময় কোনো ব্যবস্থা হিসাবে নয়। এমন কোনো ব্যবস্থা হিসাবে নয় যাকে বাস্তব রূপ দান করা কঠিন এবং যা কল্পনার কুয়াশায় হারিয়ে যায়।

'কাফেররা বললো, এতো মিথ্যাবাদী এক যাদুকর।'

তাদের একথা বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যকার একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠাতে পারেন তা তাদের কল্পনা বহির্ভূত। তাছাড়া জনগণকে মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা এবং তাঁর সুপরিচিত সত্যবাদিতা সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করাই এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে যে সত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত তা হলো, কোরায়শ নেতারা মোহাম্মদ (স.)-কে সঠিকভাবেই চিনতো এবং মুখে তাঁকে মিথ্যাবাদী এবং যাদুকর বললেও আদতে এ কথায় তারা এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করতো না। তাদের এ উক্তি ছিলো নিছক জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও ধোঁকা দেয়ার অস্ত্র বিশেষ। এই ধোঁকাবাজিতে সেই নেতারা ছিলো খুবই দক্ষ। তাদের এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিলো কেবল মোহাম্মদ (স.)-এর দেয়া সত্যের দাওয়াতের কবল থেকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করা। কেননা তারা জানতো যে, এই দাওয়াত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের বাতিল সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ আদৌ টিকবে না।

মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর আনীত সত্য দ্বীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কিভাবে অপপ্রচার চালালে কোরায়শ নেতারা নিজেদের এবং মক্কার জনগণের মনে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভাবমূর্তি রক্ষা করতে পারবে, আর হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আগত প্রতিনিধি দলগুলোকে মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে, সে সম্পর্কে তারা এক পর্যায়ে একটা ঐকমত্যে পৌছেছিলো। সেই ঘটনাটা ইতিপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে হচ্ছে।

ইবনে এসহাকের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটা নিম্নরূপ–

প্রবীণ কোরায়শ নেতা ওলীদ ইবনে মুগীরার কাছে একদিন কোরায়শ বংশের কিছু লোক জমায়েত হলো। হজ্জের মৌসুম সমাগতপ্রায়। ওলীদ তাদের সম্বোধন করে বললো, 'হে কোরায়শ জনতা, শোন, হজ্জের মৌসুম ঘনিয়ে এসেছে। এ সময় আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা আসবে। তোমাদের এই সাথী [অর্থাৎ মোহাম্মদ (স.)] সম্পর্কে তারা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই

কিছু না কিছু শুনেছে। এখন তোমরা তার সম্পর্কে কোনো একটা বক্তব্যে একমত হও। হরেক জনে হরেক রকম বক্তব্য দিয়ো না এবং একজন আরেক জনের বিপরীত কথা বলো না। উপস্থিত জনতা বললো, তাহলে এ ব্যাপারে কি বলতে হবে তা আপনিই বলে দিন।, আপনিই একটা মত ঠিক করে দিন। আমরা সেই মতই প্রচার করবো। ওলীদ বললো; বরং তোমরা বলো। আমি শুনি। জনতার একাংশ বললো, আমরা ওকে জ্যোতিষী বলবো। ওলীদ বললো, না, আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। আমরা বহু জ্যোতিষী দেখেছি, কিন্তু জ্যোতিষীরা যে রকম রহস্যময়, ধাঁধালো ও ছন্দ-পয়ারযুক্ত কথা বলে, মোহাম্মদ (স.) সে রকম বলে না। লোকেরা বললো, ঠিক আছে, আমরা ওকে পাগল বলবো, ওলীদ বললো, না, না, সে তো পাগল নয়। পাগলামি আমরা দেখেছি এবং চিনিও। পাগল যে রকম আবোল তাবোল বলে, কথা বলতে বলতে শ্বাসরুদ্ধ ও জিহবা আড়ষ্ট হয়ে আসে এবং কু-প্ররোচণা দেয়ার ভংগিতে কথা বলে, সেসব লক্ষণ ওর ভেতরে নেই। জনতা বললো, তাহলে কবি বললে কেমন হয়? ওলীদ বললো, না, ও তো কবি নয়। আমরা সব রকমের কবিতা চিনি। যুদ্ধের কবিতা চিনি, নিন্দাসূচক কবিতা চিনি, প্রশংসার কবিতা চিনি, ছোট কবিতা চিনি, বড় কবিতা চিনি, কিন্তু কোন মাপকাঠিতেই মোহাম্মদ (স.)-এর কথাবার্তা কবিতার আওতায় পড়ে না। জনতা বললো, তাহলে যাদুকর বলি? ওলীদ বললো না, ওতো যাদুকরও নয়। আমরা বহু যাদুকর এবং তাদের যাদু দেখেছি, কিন্তু তাদের ফুঁক দেয়া ও গেরো দেয়ার লক্ষণটা ওর ভেতরে নেই। তারা বললো, তাহলে এখন আপনিই বলে দিন আমরা কি বলবো। ওলীদ বললো, আসলে ওর কথাবার্তা এতো মিষ্টি, এতো ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তার সম্পর্কে তোমাদের এসব বক্তব্যের কোনোটাই ধোপে টিকবে না। সবই মিথ্যা বলে গণ্য হবে। তার সম্পর্কে তোমাদের একথাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে যে, 'সে একজন যাদুকর। সে এমন কথা নিয়ে এসেছে, যা ছেলে ও বাবার মধ্যে, ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং ব্যক্তি ও তার গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। কাজেই একে যাদু বলাই সমীচীন।' লোকেরা এই বক্তব্য নিয়েই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে লোকজনের চলাচলের পথের পাশে বসে পড়লো। হজ্জের মৌসুমে লোকজন আসতে আরম্ভ করলে তারা যাকেই আসতে দেখলো, তাকেই মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সাবধান করতে লাগলো এবং তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে লাগলো।

কোরায়শ নেতাদের মোহাম্মদ (স.)-কে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলার এই ছিলো পটভূমি। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাও জানতো যে, তাদের এ কথা নির্জলা মিথ্যা। তারা ভালো করেই জানতো, রসূল (স.) মিথ্যাবাদী নন, যাদুকরও নন।

তাওহীদ তত্ত্বের সাথে কৌশলে শেরেকের সংমিশ্রণ

তারা রসূল (স.) কর্তৃক তাদের এক আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান জানানোতেও অবাক হতো। অথচ এটাই ছিলো সবচেয়ে সত্য কথা এবং সবচেয়ে শ্রবণযোগ্য বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সংক্রান্ত কথা উদ্ধৃত করেছেন। (আয়াত ৫, ৬, ৭ ও ৮)

'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে মাত্র একজন উপাস্য স্থির করে নিলো? এতো একটা নিদারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই বলে চলে যায় যে, তোমরা যা করছো, তা করে যেতে থাকো এবং তোমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে দৃঢ় থাকো। নিশ্চয় এ বক্তব্য কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা সর্বশেষ আগত ধর্মে এ কথা শুনিনি। এটা নিশ্চয়ই মনগড়া ব্যাপার।'

কোরআনের বর্ণনা থেকে তাদের বিস্ময়ের চরমতম মাত্রার ছবি ফুটে ওঠছে। অথচ এটা আসলে একটা স্বাভাবিক ও সহজ বাস্তবতা। 'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে মাত্র একজন উপাস্য স্থির করে দিয়েছে?' ভাবখানা এই যে, এটা যেন অকল্পনীয় ব্যাপার! 'এটা তো একটা নিদারুণ

বিস্ময়ের ব্যাপার।' এখানে 'উজাব' শব্দটার ব্যবহার বিস্ময়ের আতিশয্য ও চরম মাত্রা বুঝাচ্ছে।

অনুরূপভাবে জনগণের মন থেকে এই দাওয়াতের প্রভাব মুছে ফেলার জন্যে তারা কিরূপ পন্থা অবলম্বন করেছে, তা চিত্রিত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। তাদের পুরুষানুক্রমিক আকীদা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এরূপ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, রসূল (স.) যে দাওয়াত দিচ্ছেন তা বাহ্যত যেরূপ দেখা যায়, আসলে তা নয়। আসলে এই দাওয়াতের পেছনে এমন কোনো গোপন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র তাদের মতো প্রবীণ নেতারাই বুঝতে পারে।

'তাদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই বলে চলে যায় যে, ...' অর্থাৎ কিনা, ওটা কোনো ধর্মও নয়, কোনো আকীদা-বিশ্বাসও নয়, বরঞ্চ এই দাওয়াতের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, যার প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে না। এ সম্পর্কে বুঝা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার সেই নেতাদের হাতেই অর্পণ করা উচিত যারা খুব সূক্ষ্মজ্ঞানী ও গুপ্ত তত্ত্ব বিশারদ। তারপর জনগণের নিজ নিজ কাজে যথারীতি নিয়োজিত থাকা উচিত। নিজেদের এ নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। নেতারাই এর প্রতিরোধের জন্যে যথেষ্ট। তারাই জনগণের স্বার্থ, আকীদা বিশ্বাস ও দেবদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে দিবারাত্র নিয়োজিত। জনগণের এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

একনায়ক শাসকরা চিরদিনই এরূপ করতে অভ্যস্ত। তারা জনগণকে তাদের স্বার্থ নিয়ে ভাবতে দেয় না। প্রকৃত সত্য কি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেয় না। তাদের প্রকৃত হুমকি কোন দিক থেকে আসতে পারে তা তাদের চিন্তা করতে দেয় না। কেননা নিজেদের বিষয় নিয়ে জনগণ যদি নিজেরাই চিন্তা ভাবনা করে, তাহলে সেটা একনায়কদের জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে। তারা যে বাতিলের মধ্যে, অন্যায় অসত্যের মধ্যে নিমজ্জিত আছে, সেটা তারা বুঝে ফেলতে পারে। অথচ জনগণকে ভুল ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখেই তারা আয়েশী ও স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে পারে। তারা সজাগ সচেতন হলে তা পারে না।

তারপর তারা অন্য যে কৌশলটা অবলম্বন করে জনগণকে ধোঁকা দেয়, তাহলো তাদের আকীদা বিশ্বাসের প্রায় কাছাকাছি আহলে কেতাবের আকীদা বিশ্বাসের বরাত দেয়া। অথচ ইতিমধ্যেই ওগুলোতে নানা কথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ওগুলোকে প্রকৃত তাওহীদ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ও বিকৃত করেছে। তারা বলে, 'সর্বশেষ ধর্মে আমরা এমন কথা শুনিনি। এটা নিশ্চয়ই মনগড়া।'

এ সময় খৃষ্টধর্মে 'ত্রিত্ববাদ' ও ইহুদী ধর্মে 'ওযায়র' তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। এই ভেজাল মিশ্রিত খৃষ্টধর্ম ও ইহুদী ধর্মের দিকে ইংগিত করেই কোরায়শ নেতারা বলতো, 'সর্বশেষ ধর্মে আমরা এমন কথা শুনিনি।' অর্থাৎ এমন এক আল্লাহর এবাদাতের কথা শুনিনি যা মোহাম্মদ (স.) নিয়ে এসেছে। সুতরাং মোহাম্মদ (স.) যা বলে, ওটাই মনগড়া!

এ কথা সুবিদিত যে, তাওহীদ বিশ্বাসকে নির্ভেজাল করা ও তার সাথে মিশ্রিত নানা রকমের মনগড়া ধ্যান ধারণা, রূপকথা ও উপকথা থেকে তাকে মুক্ত করার প্রতি ইসলাম প্রবল আগ্রহ পোষণ করে। ইসলামের পূর্বে যেসব ধর্ম এসেছিলো, তাতে প্রথমে নির্ভেজাল তাওহীদই ছিলো। পরবর্তীকালে তাতে এসব মানব রচিত ধ্যান ধারণার মিশ্রণ ঘটে। ইসলামের এই আগ্রহের কারণ এই যে, তাওহীদই হচ্ছে সেই আদি ও আসল মহাসত্য, যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গোটা সৃষ্টিজগত দ্ব্যর্থহীনভাবে ও অকাট্যভাবে এই মহাসত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তা ছাড়া এই তাওহীদই হচ্ছে সেই স্তম্ভ, যার ওপর মানব জীবন প্রতিষ্ঠিত না হলে তা তার মূল ও শাখা-প্রশাখা সমেত অশুদ্ধ, বিকৃত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বহু উপাস্যের পরিবর্তে একমাত্র উপাস্যের ঘোষণায় কোরায়শ যেমন হতভম্ব হয়ে যায় এবং এর প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ায়, তেমনি কোরায়শের আগেও বহু জাতি এ ঘোষণা ও এ আকীদার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অপরদিকে প্রত্যেক রসূল (স.) এ আকীদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাদের রেসালাতের ভিত্তিই ছিলো এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুগ যুগ কাল ধরে রসূলরা এ আকীদা মানব জাতির মন-মগযে বদ্ধমূল করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে একটু বিস্তারিতভাবে এই তত্ত্বটার মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

আমি বলেছি যে, তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ বা 'একক উপাস্য তত্ত্ব' হচ্ছে সেই আদি ও আসল মহাসত্য, যার ওপর এই গোটা সৃষ্টিজগত দাঁড়িয়ে আছে ও টিকে আছে। আমি একথাও বলেছি যে, এই সৃষ্টিজগতের যেখানে যা কিছু আছে সবই এই মহাসত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সংগতভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, এই সত্যের পক্ষে সৃষ্টিজগত কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে? এর জবাবে বলছি,

দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বকে পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যে একই প্রকৃতির, একই ধরনের এবং একই উৎস থেকে উদ্ভূত তা একেবারেই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। আর প্রাকৃতিক নিয়মের এই প্রকৃতিগত ও গুণগত ঐক্য অকাট্যভাবেই প্রমাণ করে যে, যে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলো তৈরী করেছে, সেই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তও অবশ্যই এক ও অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য। বিশ্বজগতের যেদিকেই তাকাই, এই সত্যটাই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সবই গুণগত, প্রকৃতিগত, চরিত্রগত ও জাতগতভাবে এক অভিন্ন। এই ঐক্য থেকে পরিস্ফুট হয় যে, এগুলোর পেছনে বিরাজমান ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তও এক অভিন্ন।

মহাবিশ্বের যেখানে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটা জিনিসই নিরন্তর চলমান, নিয়মানুগ ও সুশৃংখলভাবে গতিশীল ও আবর্তনশীল। সৃষ্টিজগতের প্রাণী কিংবা অপ্রাণী প্রত্যেক বস্তুর প্রথম একক হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র অণু। এই অণু সদা চলমান ও গতিশীল। কেননা এই অণু সেসব ইলেকট্রোন দ্বারা গঠিত, যা বহু সংখ্যক প্রোটোন দ্বারা গঠিত পরমাণুর চারপাশে আবর্তনশীল। ঠিক যেমন সৌরজগতে সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঘূর্ণায়মান এবং অগণিত সৌরজগতের সমষ্টি ছায়াপথ যেমন নিজের চারপাশে কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে থাকে, আর গ্রহগুলোর ভেতরে, সূর্যের ভেতরে এবং ছায়াপথের ভেতরে যে আবর্তন প্রক্রিয়া চলে, তার সবটার একই গতিপথ– পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, যা ঘড়ির গতিপথের ঠিক বিপরীত!

আর যে সমস্ত উপাদান দিয়ে পৃথিবী ও অন্যান্য চলমান গ্রহগুলো গঠিত, সেগুলো সব একই উপাদান। নক্ষত্রগুলোর উপাদানও তদ্রূপ। আর উপাদানগুলো সব অণু দ্বারা গঠিত, আর অণুগুলো ইলেকট্রোন, প্রোটোন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত, সব কিছুই এই তিনটে মৌলিক জিনিস দিয়ে তৈরী।

আবার বস্তু যেমন তিনটি মৌলিক উপাদানের সমষ্টি, তেমনি বিজ্ঞানীরা শক্তিগুলোর মূল নির্ধারণ করেছেন একটামাত্র, আলো ও তাপ, আর পৃথিবীতে যতো রশ্মি আছে, সবই একটা মাত্র শক্তির বিভিন্ন রূপ, সেই শক্তিটা হলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক শক্তি, এসব শক্তিই চলাচল করে একই গতিতে, এদের গতিতে যেটুকু পার্থক্য তা শুধু তরংগের পার্থক্য।

বস্তুর উপাদান তিনটে আর শক্তির উপাদান হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন তরংগ।

আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বস্তু ও শক্তির সমীকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বস্তু ও শক্তি সমান। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়, সর্বশেষ পরীক্ষা তার দাবীকে এতো উচ্চকণ্ঠে সত্যায়ন করে যে, সারা দুনিয়াই তা যেন শুনতে পায়। তা হলো, আয়োডিন বোমায় অণুর চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া তত্ত্ব। সুতরাং এদিক থেকে বস্তু ও শক্তি সমমানের জিনিস।

এই হলো বিশ্বজগতের সৃষ্টির একত্ব, যেমনটি মানুষ সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জেনেছে।

'নিরবিচ্ছিন্ন গতি তত্ত্বে' যেমন আমি বলেছি, প্রাকৃতিক জগতে যে ঐক্য রয়েছে, তা চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়। বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর প্রাকৃতিক জগতে সুসমন্বিত সুশৃংখল গতিবিধিও বিদ্যমান। বিশ্বজগতের কোনো জিনিসই এই গতিবিধির আওতা বহির্ভূত নয়। কোনো জিনিসই এখানে বিশৃংখল নয়। সমুদয় সৃষ্টিতে এই গতি এমন ভারসাম্যপূর্ণ যে, এর একটা অপরটাকে অচল বা নিষ্ক্রিয় করে দেয় না, সংঘাত-সংঘর্ষও বাধায় না। এই সংঘাত সংঘর্ষহীন সুচারু ও সশৃংখল গতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলো সৌরজগত, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্র ও বড় বড় ছায়াপথ মহাশূন্যে চলাচল করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সকলেই আকাশে সাঁতার কাটছে।' এসব গ্রহ-নক্ষত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে সত্ত্বা তাদের এই মহাশূন্যে পরিচালিত করছে এবং তাদের গতি, দূরত্ব ও অবস্থান সুশৃংখল রাখছে, সে সত্ত্বা এক– একাধিক নয়। সে সত্ত্বা তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও গতিবিধি জানে এবং এই বিস্ময়কর মহাবিশ্বের পরিকল্পনা করার সময় সব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা যে ঐক্য এবং একত্বের সাক্ষ্য দেয়, সে সম্পর্কে আপাতত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকছি।

বস্তুত একত্ব বা তাওহীদ এমন এক বাস্তব সত্য, যা মেনে না নিলে মানব জাতির জীবন সুস্থ ও সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। চারপাশের প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে, প্রাকৃতিক জগতে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে এবং জগতের প্রতিটা বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কে মানুষের সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে এই তাওহীদ তত্ত্ব সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অত্যন্ত জরুরী। আর এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ এবং তাঁর সাথে যথোচিত সম্পর্ক বজায় রাখা আর তিনি ছাড়া আর যতো প্রাণী বা বস্তু এ বিশ্ব চরাচরে রয়েছে, তাদের সাথেও যথোচিত সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে এই তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা অপরিহার্য। আর মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সাথে সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে এ সব কিছুই অত্যন্ত জরুরী।

যে ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং এই একত্বের মর্ম অনুধাবন করে, সে এই ঈমান ও অনুধাবনের ভিত্তিতেই তার প্রতিপালকের সাথে তার সম্পর্ক সংগতিশীল ও সুসমন্বিত করে। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সব কিছু ও অন্য সকলের সাথে তার সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি পর্যায়েই রাখে। তার শক্তি ও আবেগ অনুভূতি নানারকমের স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী বিভিন্ন উপাস্যের মধ্যে কিংবা তার ওপর আধিপত্যশীল বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালাই এই ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টিজগতের উৎস, সে গোটা সৃষ্টিজগত ও তার মধ্যকার যাবতীয় বস্তু এবং প্রাণীর সাথে পরিচিতি, সহযোগিতা, সখ্যতা ও প্রীতির ভিত্তিতে আচরণ করে। সে জীবনকে এমন একটা স্বাদ ও আকৃতি দান করে, যা এই ঐক্যে বিশ্বাস করে না এমন ব্যক্তির পক্ষে দান করা সম্ভব নয়। এমনকি সে নিজের ও নিজের আশপাশের অন্যান্য বস্তু এবং প্রাণীর মাঝে এই প্রীতি, সখ্য ও সহযোগিতা অনুভবও করে না।

আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, প্রকৃতির জগতে কার্যকর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সর্বত্র একই ধরনের, সে আল্লাহর আইন ও বিধানকে এমনভাবে গ্রহণ করে, যে আইন বিধান দিয়ে মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং যে প্রাকৃতিক বিধান দ্বারা গোটা বিশ্ব পরিচালিত হয়, উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মানব রচিত আইনের ওপর আল্লাহর আইনকে

অগ্রাধিকার দেয়। কেননা আল্লাহর আইনই মানুষের আচরণ ও সমগ্র সৃষ্টির গতিবিধির সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম।

মোটকথা, তাওহীদ তত্ত্ব বুঝা মানব জাতির বিবেকের সুস্থতা, বিশুদ্ধতা ও চারপাশের সৃষ্টিজগতের সাথে তার সুসম্পর্ক বহাল রাখার জন্যে, তার তৎপরতাকে গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সমন্বিত করার জন্যে অপরিহার্য। তার ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক, তার ও তার চারপাশের সৃষ্টির সম্পর্ক, তার ও তার চারপাশের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণীর সাথে সম্পর্কের সঠিক ধরন নির্ণয়ের জন্যে অপরিহার্য। আর এই সম্পর্ক থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে যে সার্বিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক রীতিনীতির উৎপত্তি ঘটে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও তাওহীদ তত্ত্ব বুঝা অপরিহার্য।

এ কারণেই ইসলাম তাওহীদী আকীদা বিশ্বাসকে স্বচ্ছ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এতো উদগ্রীব। প্রত্যেক রসূলের আগমনেই এই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রসূলরা তাওহীদের কালেমার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো উদাসীনতা ও নমনীয়তা দেখাননি।

অহংকারই আল্লাহর একাত্মবাদ অস্বীকারের কারণ

পবিত্র কোরআনে এই উদগ্রীবতা মক্কী সূরাগুলোতে বিশেষভাবে বার বার তাওহীদ তত্ত্বের সোচ্চার প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মাদানী সূরাগুলোতেও আলোচ্য বিষয়ের প্রাসংগিকতা অনুপাতে তাওহীদের আলোচনা দেখা যায়। আর এ কারণেই মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-এর এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতো। সেই সাথে জনগণকেও তাওহীদের প্রচার থেকে যে কোনো উপায়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। এরপর তারা মোহাম্মদ (স.)-এর রসূল হিসাবে নির্বাচিত হওয়াতেও বিস্ময় প্রকাশ করতো। তারা বলতো—

'আমাদের এতো লোকের মধ্য থেকে কেবল তার ওপরই আল্লাহর ওহী নাযিল হলো?'

এটা নতুন কোনো ব্যাপার ছিলো না। তারা জানতো যে, আবহমানকাল ধরে এ রকমই হয়ে এসেছে। এটা ছিলো শুধু ঈর্ষাপ্রসূত ব্যাপার। ঈর্ষা থেকেই শত্রুতা ও অহংকারের জন্ম হয়ে থাকে।

ইবনে এসহাক বলেন, একদিন রাতে আবু সুফিয়ান, আবু জাহল ও আখনাস বিন শোরায়ক রসূল (স.)-এর কোরআন পড়া শুনতে বেরিয়ে পড়লো। তিনি তখন নিজ বাড়ীতে নামাযে কোরআন পড়ছিলেন। তারা তিন জনে তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় বসে পড়লো। এদের একজন আরেকজনের কথা জানতো না কে কোথায় বসেছে। শুনতে শুনতে তারা সারা রাত কাটিয়ে দিলো। অবশেষে যখন ভোর হলো, সবাই যার যার পথে প্রস্থান করলো। পথে গিয়ে তারা একত্রিত হলো। তারা পরস্পরকে তিরস্কার করলো এবং একজন আর একজনকে বললো, খবরদার, এখানে আর এসো না। নচেত বেকুফ লোকদের কেউ দেখতে পেলে তোমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। সবাই চলে গেলো। পরের দিন আবার তারা ফিরে এলো সেই একই জায়গায়। আবারো তারা সারা রাত জেগে কোরআন শুনলো। অতপর পুনরায় পথে একত্রিত হলো। এবারো তারা আগের দিনের মতো পরস্পরকে সতর্ক করলো এবং স্থান ত্যাগ করলো। তৃতীয় দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। ফেরার পথে তারা বললো, এখানে আমরা আর ফিরে আসবো না এই মর্মে অংগীকার না করে এখান থেকে নড়বো না। অতপর তারা অংগীকার করে স্ব স্ব বাড়ী অভিমুখে ফিরে গেলো। সকালে আখনাস ইবনে শোরায়ক নিজের লাঠি নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে গেলো। সে আবু সুফিয়ানকে বললো, আচ্ছা, বলতো দেখি,

মোহাম্মদের কাছে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? আবু সুফিয়ান বললো, আমি যা যা শুনলাম, তার কতক জিনিস আমি জানি এবং তার অর্থও বুঝি। আবার কতক জিনিস আমি জানি না এবং তার অর্থও বুঝি না। আখনাস বললো, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। অতপর আখনাস আবু জাহলের বাড়ীতে গিয়ে তার সাথে দেখা করলো। সে বললো, ওহে আবুল হাকাম, তুমি মোহাম্মদ (স.)-এর কাছ থেকে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? আবু জাহল বললো, কী আর শুনেছি? আমরা এবং বনু আবদ মানাফ আভিজাত্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। তারা লোকজনকে খাওয়াতো, আমরাও খাওয়াতাম। তারা অনেক আর্তের দায়িত্ব বহন করতো, আমরাও করতাম। তারা দান করতো, আমরাও করতাম। শেষ পর্যন্ত যখন ভারবাহী পশুর ব্যাপারেও আমরা সমান সমান হয়ে দুই প্রতিযোগিতার ঘোড়ার মতো হয়ে গেলাম, তখন তারা বললো, আমাদের ভেতরে একজন নবী আছে, যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। এ ব্যাপারে আমরা তাদের সমকক্ষ কোনোকালেও হতে পারবো না। তাই আল্লাহর কসম, আমরা তার ওপর কখনো ঈমান আনবো না এবং কখনো তার দাবী মানবো না। এরপর আখনাস তার কাছ থেকে বিদায় নিলো।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এর পেছনে রয়েছে হিংসুটে স্বভাব। এটাই আবু জাহলকে সত্যের স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত রাখছে। অথচ এই সত্য তার ওপর তিন দিনব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো। তাদের হিংসার কারণ ছিলো এই যে, মোহাম্মদ (স.) এমন এক সাফল্য অর্জন করে ফেলেছেন, যা কেউ চেয়েও পায় না। যারা বলতো, 'আমাদের এতো লোকের মধ্য থেকে কেবল তার ওপরই ওহী নাযিল হলো নাকি?' তাদের কথার মূল রহস্য এটাই।

এসব লোকই বলতো, 'এই কোরআন দুই শহরের কোন গণ্যমান্য লোকের ওপর অবতীর্ণ হলো না কেন?' 'দুই শহর' দ্বারা তারা মক্কা ও তায়েফকে বুঝাতো। কেননা এই দুই শহরেই মোশরেকদের বড় বড় নেতা, সরদার ও শাসক থাকতো। এসব নেতা যখন শুনেছে যে, নতুন একজন নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তারা ধর্মের পথ ধরে নেতৃত্ব লাভের অভিলাষ পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে নবী হিসেবে নিয়োগ করলেন, তাঁর প্রতি নিহের করুণা ও অনুগ্রহের ভান্ডার খুলে দিলেন এবং পৃথিবীতে এই মর্যাদালাভে একমাত্র তিনিই যোগ্য বলে প্রমাণিত হলেন, তখন একাধারে হিংসা ও আভিজাত্যবোধের অনুভূতি তাদের বেসামাল করে তুললো।

তাদের উপরোক্ত প্রশ্নের এমন জবাব দেয়া হচ্ছে, যার ভেতরে হুমকি, হুশিয়ারী ও বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে,

'আসলে তারা আমার ওহীর ব্যাপারেই সংশয়ে রয়েছে, তারা এখনো আমার শাস্তির স্বাদ ভোগ করেনি।'

তারা প্রশ্ন তুলেছে যে, 'আমাদের সবার ভেতর থেকে একমাত্র তার ওপরই ওহী নাযিল হলো নাকি?' অথচ স্বয়ং ওহী সম্পর্কেই তাদের সন্দেহ রয়েছে। যে ওহী নিয়ে তাদের মনে এখনো বিশ্বাস জন্মেনি যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কিনা, যে ওহীর প্রকৃতি নিয়ে এখনো তাদের ঝগড়া থামেনি এবং যে ওহী তাদের চেনাজানা মানবীয় কথাবার্তা থেকে অনেক উর্ধ্বে, তা নিয়ে তাদের এ প্রশ্ন তোলা একেবারেই বেমানান।

এরপর ওহী সম্পর্কে তাদের কথাবার্তা ও সন্দেহ সংশয় সম্পর্কে কথা বন্ধ করে আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে, 'আসলে এখনো তারা আমার আযাবের স্বাদ পায়নি।' অর্থাৎ তারা এখনো আমার আযাব থেকে নিরাপদে আছে বলেই এসব কথা বলার সাহস পাচ্ছে এবং ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

যখন আযাবের মজা টের পাবে তখন আর এসব কথা বলবে না। কেননা তখন তারা বুঝবে আসল ঘটনা কি।

এরপর তাদের মধ্য থেকে আর সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল মোহাম্মদ (স.)-কে নবী নিযুক্ত করার ব্যাপারে তাদের বিস্ময় ও আপত্তি খন্ডন করার জন্যে তাদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কাকে তা দেয়া হবে আর কাকে দেয়া হবে না, তা নিয়ে মতামত দেয়ার তারা কে? এ ব্যাপারে এমন কি অধিকার তাদের রয়েছে?

'তাদের কাছে কি তোমার পরম দাতা ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুর অনুগ্রহের ভান্ডার রয়েছে?'

রসূলদের সাথে বেয়াদবী ও তার পরিণতি

এখানে মহান আল্লাহর সাথে তাদের বে-আদবীর নিন্দা করা হয়েছে। যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বান্দার পক্ষে একেবারেই অশোভন, তাতে হস্তক্ষেপ করার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাকে যা খুশী দেবেন অথবা দেবেন না, সেটা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও পরাক্রমশালী। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি এমন দাতা ও দয়ালু যে, তাঁর বদান্যতার কোন শেষ নেই। অথচ তারা আল্লাহর মোহাম্মদ (স.)-কে নবী হিসেবে মনোনীত করা নিয়ে আপত্তি তুলছে। কোন অধিকারে ও কোন মর্যাদার বলে তারা আল্লাহর দান বিতরণ করার ক্ষমতা পেয়েছে? অথচ তারা তো আল্লাহর ভান্ডারের মালিক নয়! আয়াতে বলা হয়েছে,

'নাকি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর ওপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে?' (আয়াত ১০)

অবশ্য সে জাতীয় দাবী করার মতো সাহস কারও নেই। যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি উভয়ের মধ্যকার সকল কিছুর স্রষ্টা কেবল তিনিই দান করেন, তিনিই বারণ করেন এবং যাকে চান তাকে নবুওতের জন্যে পছন্দ করেন, নির্বাচিত করেন, আসমান ও যমীন বা এর মধ্যকার কোনো কিছুর ওপর যাদের কর্তৃত্ব নেই, ক্ষমতা নেই, তারা কি করে এবং কোন সাহসে সেই একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কতৃত্বের অধিকারী মহান সত্ত্বার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যায়?

এই প্রশ্নের পর ওদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে চ্যালেঞ্জের সুরে বলা হচ্ছে,

'থাকলে রশি ঝুলিয়ে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত।'

যাতে করে সেখান থেকে আসমান ও যমীনের দেখা শুনা করা তাদের জন্যে সম্ভব হয়, আল্লাহর ভান্ডারগুলোর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় এবং সেখান থেকে যাকে ইচ্ছা দান করা বা না করা সম্ভব হয়। যারা সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা এবং পছন্দের ব্যাপারে আপত্তি করার সাহস দেখায় তাদের পারলে তেমনটিই করা উচিত।

এই চ্যালেঞ্জ রাখার পর ওদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি ইংগিত করে বলা হচ্ছে,

'এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে।' (আয়াত ১১)

অর্থাৎ ওদের অস্তিত্ব একটা পরাজিত বাহিনীর চেয়ে বেশী কিছু নয়, যারা সুদূর কোনো প্রান্তে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনা বা এসকল ভান্ডার নিয়ন্ত্রণের ধারে কাছেও ওরা নেই। আল্লাহর সাম্রাজ্যে কি ঘটছে সে ব্যাপারে ওদের কোনোই দখল নেই, আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতাও ওদের নেই এবং নেই আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করার শক্তি। তাই ওদের আখ্যায়িত করা হয়েছে অজ্ঞাত, অখ্যাত এক পরাজিত বাহিনী হিসেবে, যার অস্তিত্বের সাথেই লেগে আছে পরাজয়ের গ্লানি। সে অস্তিত্বও আবার এককভাবে নয়; বরং একাধিক ও বহুমূখী অস্তিত্বের মাঝে একটি অস্তিত্ব মাত্র।

কোরআনের ভাষায় আল্লাহ ও রসূলের শত্রুদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার চেয়ে ভালো অবস্থায় ওরা কোনো দিনই ছিলো না। কোরআনের ভাষায় ওরা দুর্বল, অক্ষম এবং বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বহু যোজন দূরে। ওরা যতোই ক্ষমতার বাহাদুরী করুক, যতই দাপট প্রদর্শন করুক এবং পৃথিবীর বুকে কিছু দিনের জন্যে যতই স্বৈর শাসন কায়েম করে রাখুক, তারপরও ওরা দূর্বল অক্ষম।

যুগে যুগে এ জাতীয় স্বৈরাচারীদের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু ওদের আল্লাহ তায়ালা পরাজিত বাহিনীদের অন্যতম বাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এদের প্রসংগ উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

'তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিলো নূহের সম্প্রদায়, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন ....।' (আয়াত ১২-১৪)

কোরায়শ সম্প্রদায়ের পূর্বে ইতিহাসের পাতায় যেসব জাতি ও সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তারা হচ্ছে নূহ, আদ এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়– যাদের কীলক বিশিষ্ট বলা হয়েছে। কারণ ফেরাউনদের গড়া পিরামিড দেখতে কীলক বা খুঁটির মতোই মনে হয়। আরও রয়েছে সামূদ, লূত ও শোয়ায়ব সম্প্রদায়। এরা হচ্ছে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী, যারা অতীতে নবী-রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের অস্বীকার করেছে। এসব দল ও গোষ্ঠী নিশ্চয়ই ক্ষমতাধর ছিলো, প্রতাপশালী ছিলো এবং স্বৈরাচারী ও যুলুমবাজ ছিলো, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আল্লাহর আযাব থেকে তারা রক্ষা পায়নি। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা ওদের পরাজয় ও পতনেরই সাক্ষ্য বহন করে।

এই ছিলো অতীতের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া জাতিগুলোর অবস্থা, আর এদের অবস্থা কি হবে? এদের আপাতত ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তবে শেষ বিচারের পূর্বক্ষণে এক বিকট চিৎকারের শিকার হয়ে এরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বলা হয়েছে,

'এরা কেবল এক বিকট চিৎকারের অপেক্ষায় আছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না।' (আয়াত ১৫)

এই বিকট চিৎকার যখন দেয়া হবে তখন নির্ধারিত মূহূর্তেই দেয়া হবে। এক মুহূর্তও এদিক সেদিক হবে না। সেই নির্ধারিত মুহূর্ত পর্যন্ত এই সর্বশেষ উম্মতকে সুযোগ দেয়া হবে। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ন্যায় এদের ধ্বংস করা হবে না, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে না। এটা নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের প্রতি বিরাট রহমত ও দয়া, কিন্তু এরা এই রহমতের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারেনি, এই দয়া ও করুণার জন্যে এরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনি; বরং প্রতিদানের জন্যে এরা নিজেরাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং নির্ধারিত দিনের আগেই তাদের ভাগ্যে যা রাখা হয়েছে তা চুকিয়ে দেয়ার জন্যে দাবী করছে। ওরা বলছে, 'হে আমাদের মালিক! আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিনের আগেই দিয়ে দাও।' (আয়াত-১৬)

এ পর্যন্ত এসেই ওদের প্রসঙ্গের ইতি টানা হয়েছে। এর পর রসূলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। তিনি যেন স্বজাতির নির্বোধ ও অসৌজন্যমূলক আচরণে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি অস্বীকার করার কারণে এবং আল্লাহর রহমত ও দয়া প্রতি অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রদর্শনের কারণে মনোক্ষুণ্ন না হন। সাথে সাথে তাকে অন্যান্য নবী-রসূলদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিপদাপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং জানিয়ে দিচ্ছেন যে, বিপদাপদের পরই আসে আল্লাহর রহমত ও দয়া। এ প্রসংগে বলা হয়েছে,

'তারা যা বলে তাতে তুমি সবর করো এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করো ......।' (আয়াত ১৭-৪৮)

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ هٰذَاۤ اَخِيْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا

১৭. (হে নবী,) এরা যেসব কথাবার্তা বলে, তুমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ জন্যে) আমার শক্তিমান বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, সে ছিলো আমার প্রতি নিবিষ্ট। ১৮. আমি পর্বতমালাকে তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, (তাই) এগুলোও সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে (সাথে) আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো, ১৯. (অনুরূপ) পাখীকুলকেও (তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম), তারা (তার পাশে) জড়ো হতো, (এদের) সকলেই (যেকেরে) তার অনুসারী ছিলো। ২০. আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং (সে সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে) তাকে প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম বাগ্মিতার শক্তি দান করেছিলাম। ২১. (হে নবী,) তোমার কাছে কি (সে) বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌঁছেছে? যখন ওরা (উভয়ই) প্রাচীর টপকে (তার) এবাদাতখানায় প্রবেশ করলো, ২২. যখন তারা দাউদের সামনে হাযির হলো তখন সে এদের কারণে (একটু) ভীত হয়ে পড়লো, ওরা বললো (হে আল্লাহর নবী), আপনি ভীত হবেন না, আমরা হচ্ছি বিবদমান দুটো দল, আমাদের একজন আরেকজনের ওপর যুলুম করেছে, অতএব আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দিন, (কোনো রকম) নাইনসাফী করবেন না, আমাদের সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিন। ২৩. (আসলে) এ হচ্ছে আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার কাছে আছে (মাত্র) একটি। (এ সত্ত্বেও) সে বলে, আমাকে তোমার এ (দুম্বা)-টিও দিয়ে দাও, সে কথায় কথায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে। ২৪. (বিবাদের বিবরণ শুনে) সে বললো, এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার ওপর যুলুম করেছে; (আসলে) যৌথ (বিষয় আশয়ের) অংশীদাররা অনেকেই একে অন্যের ওপর (এভাবে) যুলুম করে, (যুলুম) করে না কেবল সে সকল লোকেরা, যারা (আল্লাহ তায়ালার

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿۲۴﴾ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, (যদিও) এদের সংখ্যা নিতান্ত কম; দাউদ বুঝতে পারলো, (তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে এ কাহিনী দ্বারা এতোক্ষণ ধরে) আমি তাকে পরীক্ষা করছিলাম, (মূল ঘটনা বুঝতে পেরে) অতপর সে তার মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং (সে) পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং সে (আমার দিকে) ফিরে এলো। ২৫. অতপর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, অবশ্যই আমার কাছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দরতম আবাসস্থল রয়েছে। ২৬. (আমি দাউদকে বললাম,) হে দাউদ, আমি তোমাকে (এই) যমীনে (আমার) খলিফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তেমনটি করলে এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে; (আর) যারাই আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে (গোমরাহ হয়ে) যায়, তাদের জন্যে অবশ্যই (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা মহাবিচারের (এ) দিনটি ভুলে গেছে।

রুকু ৩

২৭. আমি আসমান যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এটা তো সেসব (মূর্খ) লোকদের ধারণা, যারা সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে, আর যারা (এভাবে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে; ২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদের সেসব লোকের মতো করে দেবো যারা যমীনে বিপর্যয়কারী (সেজে বসে আছে), অথবা আমি কি পরহেযগার লোকদের গুনাহগারদের মতো (একই দলভুক্ত) করবো?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ

بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ

ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًاۢ

بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا

ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ

بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً

حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي

২৯. আমি এ মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে এবং জ্ঞানবান লোকেরা (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; ৩০. আমি দাউদকে (ছেলে হিসেবে) সোলায়মান দান করেছি; সে ছিলো (আমার) উত্তম একজন বান্দা; সে অবশ্যই ছিলো (তার মালিকের প্রতি) নিষ্ঠাবান; ৩১. এক অপরাহ্নে যখন তার সামনে (দ্রুতগামী ও) উৎকৃষ্ট (কয়েকটি) ঘোড়া পেশ করা হলো, ৩২. (তখন) সে বললো, আমি তো আমার মালিকের স্মরণ ভুলে (এদের) প্রীতিতে মজে গিয়েছিলাম, (এদিকে) দেখতে দেখতে সূর্যও প্রায় ডুবে গেছে। ৩৩. (নামাযের কথা চিন্তা না করে সে বললো, কোথায় সে ঘোড়া,) সেগুলো আমার সামনে নিয়ে এসো; (এগুলো আনা হলে) সেগুলোর পা ও গলদেশসমূহে (স্নেহের) হাত বুলিয়ে দিলো (এবং এদের ভালোবাসায় নামায ভুলে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো)। ৩৪. আমি (নানাভাবেই) সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছি, (একবার) তার সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহও আমি রেখে দিয়েছিলাম (যাতে করে সে আমার ক্ষমতা বুঝতে পারে), অতপর সে (আরো বেশী) আমার দিকে ফিরে এলো। ৩৫. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, (যদি আমি কোনো ভুল করি) তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কেউ কোনোদিন পাবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা। ৩৬. (সে অনুযায়ী) তখন আমি বাতাসকেও তার অধীন করে দিলাম, তা তার ইচ্ছানুযায়ী (অবাধে তাকে নিয়ে) সেখানেই নিয়ে যেতো যেখানেই সে যেতে চাইতো, ৩৭. জ্বিনদেরও (তার অনুগত বানিয়ে দিলাম), যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও (সমুদ্রের) ডুবুরী, ৩৮. শৃংখলিত অন্যান্য (আরো) অনেককেও (আমি তার অধীন করে

الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

দিয়েছিলাম)। ৩৯. (আমি বললাম,) এ সবই হচ্ছে আমার দান, এ থেকে তুমি (অন্যদের) কিছু দাও কিংবা নিজের কাছে রাখো–(এর জন্যে তোমাকে) কোনো হিসাব দিতে হবে না। ৪০. অবশ্যই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উঁচু মর্যাদা ও সুন্দর নিবাস।

রুকু ৪

৪১. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে; ৪২. আমি বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো (যমীনে আঘাত করার পর যখন পানির একটি কূপ বেরিয়ে এলো, তখন আমি আইয়ুবকে বললাম), এ হচ্ছে (তোমার) পরিষ্কার করা ও পান করার (উপযোগী) পানি। ৪৩. আমি তার সাথে তার পরিবার পরিজন ও তাদের সাথে একই পরিমাণ অনুগ্রহ দান করলাম, এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত–এর নিদর্শন ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে উপদেশ। ৪৪. আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে (তোমার স্ত্রীর শরীরে মৃদু) আঘাত করো, তুমি কখনো শপথ ভংগ করো না; নিসন্দেহে আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিলো সে; সে ছিলো আমার প্রতি নিবেদিত! ৪৫. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, ওরা (সবাই) ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। ৪৬. আমি একটি বিশেষ ব্যাপার– (এই) পরকাল দিবসের স্মরণ 'গুণের' কারণে তাদের (নেতৃত্বের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম, ৪৭. অবশ্যই এরা সবাই ছিলো আমার কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত,

তাফসীর

আয়াত ১৭-৪৮

আম্বিয়ায়ে কেরামের এসব ঘটনাবলী রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনাস্বরূপ শুনানো হচ্ছে যাতে তিনি স্বজাতির বিরোধিতা, অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের কারণে মনোক্ষুণ্ন এবং অধৈর্য না হয়ে পড়েন।

একই সাথে এসব ঘটনার মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহর রহমত ও মদদ কি ছিলো এবং তাদের কি ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা এসেছে কোরায়শ বংশের লোকদের আপত্তি ও বিস্ময়ের জবাবে। ওরা নবুওত ও রেসালাতের জন্যে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর মনোনয়নের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো। ওদের এসব ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-ই কেবল নবী নন, তাঁর পূর্বেও নবী রসূলদের আগমন ঘটেছে। তাঁদের নবুওত ও রেসালাতের পাশাপাশি ক্ষমতা ও আধিপত্যও দান করা হয়েছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। শুধু তাই নয়, বরং তাদের মাঝে এমন নবীও ছিলেন যার সাথে সুর মিলিয়ে পাহাড়-পর্বত ও পশু-পক্ষী আল্লাহর তসবীহ পাঠ করত। তাঁদের মাঝে এমন নবীও ছিলেন, বায়ু এবং জ্বিন-শয়তানকে যার অধীনস্থ ও করায়ত্ত করে দেয়া হয়েছিলো। যেমন দাউদ ও সোলায়মান (আ.)। তাহলে মোহাম্মদের মতো একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কোরায়শ বংশ হতে শেষ যামানার নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

এসব ঘটনার মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তা হলো, নবী রসূলদের প্রতি আল্লাহর সদা সজাগ দৃষ্টি এবং তাদের প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক সাবধানবাণী ও নির্দেশাবলী। কারণ, তাঁরাও মানুষ ছিলেন, যেমন মোহাম্মদ (স.)ও একজন মানুষ। ফলে তাঁদের মাঝেও মানবিক দুর্বলতা থাকাটা বিচিত্র নয়, কিন্তু তাঁদের প্রতি যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, তাই সেই দুর্বলতা প্রকাশের সুযোগ তিনি দেননি; বরং তাদের সব সময়ই সতর্ক করে দিয়েছেন, তাঁদের ত্রুটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছেন, তাঁদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে এবং সম্মান বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্যে তাদের পরীক্ষা করেছেন। এসব বিষয় জানার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মনে শান্তি আসবে এবং তিনি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর দিকনির্দেশনা, সহায়তা ও রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হবেন।

আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা যা বলে তাতে তুমি সবর করো এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করো..................।' (আয়াত ১৭-২০)

ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশের মাধ্যমে নবী রসূলদের জীবনে যেসব বিপদাপদ ঘটে থাকে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কারণ, তাঁদের সকলকেই এই বিপদ-সংকুল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, প্রত্যেককেই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। প্রত্যেককেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সকলেই ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, এই ধৈর্যই হচ্ছে তাঁদের সম্বল, তাঁদের স্বভাব। নবী-রসূলদের মর্যাদা অনুসারে তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই ছিলো নানা পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। এমন কি তাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তগুলোও ছিলো এক ধরনের পরীক্ষা। ফলে দুঃখ কষ্ট ও অভাব অনটনের মুহূর্তে যেমন ধৈর্যের পরিচয় দিতে হতো, তেমনিভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হতো সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তেও। কারণ, এই উভয় অবস্থাই হচ্ছে পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার জন্যে ধৈর্য সহ্যের প্রয়োজন আছে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবী রসূলদের ঘটনাবহুল জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, ধৈর্যই ছিলো তাদের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান এবং বিপদাপদ ও পরীক্ষা ছিলো সেই জীবনের নিত্যসহচর।

নবী রসূলদের প্রতি আল্লাহর দান

নবী রসূলদের এই মনোনীত জীবন যেন গোটা মানবতার সামনে ধৈর্য ও পরীক্ষার খোলা পৃষ্ঠা, যেখানে লিপিবদ্ধ করা আছে, দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতন উৎপীড়ন সহ্য করে মানবাত্মা কিভাবে বিজয়ী হয়, কিভাবে পৃথিবীর মায়া ও আকর্ষণের উর্ধ্বে উঠতে পারে, কিভাবে লোভ লালসা ও কাম ক্রোধ হতে মুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহর রাহে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কিভাবে পরীক্ষায় উত্তির্ণ হয়ে সব কিছুর উর্ধ্বে একমাত্র তাকেই স্থান দেয়। পরিশেষে এ তাদের জীবনের এই খোলা পৃষ্ঠা মানবতাকে লক্ষ্য করে বলে, এই হচ্ছে পথ, সে পথই হচ্ছে উর্ধ্বজগতের পথ, সে পথই হচ্ছে আল্লাহকে পাওয়ার পথ। বলা হয়েছে,

'ওরা যা বলে তার ওপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো।'

হ্যাঁ, ওরা অনেক কিছুই বলেছে। ওরা নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, যাদুকর বলেছে, এক মাবুদের এবাদাত করার কথা বলাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, উপহাস করেছে। কোরায়শ বংশের মধ্য থেকে একমাত্র তার ওপরই কেন ওহী নাযিল করা হলো, সে জন্যে ওরা আপত্তি করেছে। এসব কিছুর ওপর ধৈর্য ধারণের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁকে এ সকল কাফের মোশরেকদের পরিবর্তে পবিত্র আত্মার অধিকারী নবী-রসূলদের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে বলছেন। কারণ, নবী-রসূলদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিলো, বংশের সম্পর্ক ছিলো এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। আর সে কারণেই রসূলুল্লাহ (স.) তাদের ভাই বলে উল্লেখ করতেন।

আলোচ্য আয়াতে দাউদ (আ.)-এর কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে এবং তাঁকে শক্তিশালী বান্দা ও 'প্রত্যাবর্তনশীল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর আগে নূহ, আদ, ফেরাউন, সামূদ ও 'আইকার' লোকদের সহ বিভিন্ন শক্তিধর ও প্রতাপশালী সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। এদের শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটত তাদের স্বেচ্ছাচারিতা, অহমিকা এবং আল্লাহদ্রোহিতার মাধ্যমে। অপরদিকে দাউদ (আ.)ও শক্তিধর ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহমুখী। তাই তিনি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েও ছিলেন আল্লাহর অনুগত, এবাদাতগোযার ও যাকের বান্দা।

ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় দাউদ (আ.)-এর ঘটনায় আমরা দেখেছি, তিনি তালুতের বাহিনীতে ছিলেন। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নবীর কাছে একজন শাসক প্রেরণের জন্যে অনুরোধ জানালে তিনি তালূতকে শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেন। তখন তিনি জালুত ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধের ময়দানে দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেন। তখন তিনি ছিলেন অল্প বয়সের একজন তরুণ। এর ফলে তাঁর জন্যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায় এবং পরবর্তীতে তিনিই তালূতের স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু তা সত্তেও তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা, একজন এবাদতগোযার বান্দা, একজন যাকের বান্দা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী একজন বান্দা।

নবুওত ও রাষ্ট্রক্ষমতার পাশাপাশি আল্লাহ দাউদ (আ.)-কে ধ্যানমগ্ন অন্তর ও সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। ফলে তিনি যখন ধ্যানে মগ্ন এবং তেলাওয়াতে মশগুল হতেন তখন তাঁর অস্তিত্ব এই গোটা প্রকৃতির অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে যেতো। পাহাড় পর্বত ও পশু পক্ষীর অস্তিত্বের

সাথে তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়ে একক সত্ত্বা হিসেবে স্রষ্টার গুণগান ও আরোধনায় মত্ত হয়ে যেতো। তখন দেখা যেতো, পাহাড় পর্বত ও তাঁর কন্ঠের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে তসবীহ পাঠ করছে আর পশু পক্ষীও তার সুরে সুর মিলিয়ে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের গুণগান গাচ্ছে। বলা হয়েছে,

'আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করতো; আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিলো তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।' (আয়াত ১৮-১৯)

এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রাণহীন পাহাড় পর্বত দাউদ (আ.) এর সাথে কন্ঠ মিলিয়ে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করছে; পশু পক্ষী তাঁর সুমধুর কন্ঠের আকর্ষণে তাঁর সামনে ভিড় করছে এবং তারাও তাঁর সাথে সুর করে আল্লাহর গুণগান গাইছে, এটা মানুষের কাছে একটা অভাবনীয় বিষয়। কারণ, বাস্তবে তারা এমনটি ঘটতে দেখে না। তাছাড়া তারা মানুষ, প্রাণী ও জড় পদার্থের মধ্যে বিরাট তফাতও দেখতে পায়। এমতাবস্থায় মানুষের সাথে পশু পাখী বা পাহাড় পর্বত কন্ঠ মিলিয়ে কিভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে পারে সেটা তাদের বোধগম্য নয়।

কিন্তু এখানে অসম্ভবেরও কিছু নেই এবং অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, গোটা সৃষ্টিজগত হচ্ছে একটা একক সত্ত্বা। বিভিন্ন জাতি প্রজাতি, আকৃতি প্রকৃতির আড়ালে গোটা সৃষ্টিজগত আসলে একটি মাত্রই সত্ত্বা। আর এই গোটা সত্ত্বার সম্পর্ক হচ্ছে একক স্রষ্টার সাথে। তাই মানুষের সম্পর্ক যখন স্রষ্টার সাথে গভীর হয়, দৃঢ় হয় এবং খাঁটি হয় তখন সকল ব্যবধান ঘুচে যায়, সকল আড়াল মুছে যায় এবং একক সত্ত্বায় আবির্ভূত হয়। ফলে দৃশ্যমান জগতে জাতি, প্রজাতি, আকৃতি প্রকৃতির যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তার বিলুপ্তি ঘটে এবং সবাই তখন একাকার হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দা দাউদ (আ.)-কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। পাহাড় পর্বত তাঁর করায়ত্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে সকাল বিকাল সেগুলো তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করত। পশু-পাখীকেও তাঁর করায়ত্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে সেগুলো তাঁর সামনে জড়ো হয়ে সুর করে আল্লাহর গুণগান গাইত। এগুলো ছিলো একান্তই আল্লাহর দান। নবুওত, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এসব অসাধারণ গুণাবলীও দান করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে,

'আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।' (আয়াত ২০)

অর্থাৎ তাঁর সাম্রাজ্য দৃঢ় ছিলো, শক্তিশালী ছিলো। তিনি প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে সেই সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বাগ্মী ও দৃঢ় মতামতের অধিকারী। সাথে সাথে তিনি ছিলেন অপূর্ব জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং দুর্দান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। তৎকালীন সময়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলো না।

এতো সব সত্ত্বেও দাউদ (আ.) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহর দৃষ্টি তাঁর ওপর সদা নিবদ্ধ ছিলো। তাঁর প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ এই পর্যবেক্ষণের আওতায় ছিলো যেন তিনি সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারেন, ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পান। তাঁর দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করার জন্যে আল্লাহর হাতও ছিলো সক্রিয়। বলা হয়েছে,

'তোমার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদাতখানায় প্রবেশ করেছিলো?.... (আয়াত ২১-২৪)

দাউদ (আ.)-এর পরীক্ষা

এই পরীক্ষামূলক ঘটনার বিবরণ হলো এই যে, দাউদ (আ.) যিনি একাধারে নবীও ছিলেন এবং শাসকও ছিলেন–তাঁর সময়ের কিছু অংশ সাম্রাজ্য পরিচালনা ও প্রজাদের বিচার-আচারে ব্যয় করতেন– আর কিছু অংশ ব্যয় করতেন এবাদত বন্দেগী, যেকের আযকার, তেলাওয়াত এবং আল্লাহর ধ্যানে। সে কাজগুলো তিনি নির্জনে এবাদাতখানায় করতেন। তিনি যখন থেকে এবাদাতখানায় প্রবেশ করতেন তখন বের হয়ে না আসা পর্যন্ত সেখানে কেউ প্রবেশ করত না।

একদিন তিনি দু'জন লোককে প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদাতখানায় প্রবেশ করতে দেখে অবাক হলেন এবং কিছুটা ভীতও হলেন। কারণ, তাঁর কোনো অনুসারীর পক্ষে এমনটি করা সম্ভব ছিলো না। যাহোক, লোক দুটো তাঁকে আশ্বস্ত করে বললো,

'ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না।'

এরপর এদের এক পক্ষ বললো, 'সে আমার ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক, আর আমি হলাম একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে এটিও আমাকে দিয়ে দাও, সে কথাবার্তায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।' (আয়াত ২৩)

এই পক্ষের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ। এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোনো অবকাশ নেই। অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়। তাই দাউদ (আ.) অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনেই এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই এ ব্যাপারে তাঁর রায় ঘোষণা দিয়ে বললেন,

'সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা কম।' (আয়াত ২৪)

মনে হয় তিনি যখন এই রায় ঘোষণা করছিলেন তখন লোক দুটো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। আসলে তারা ছিলো ফেরেশতা। মানুষের আকৃতি ধারণ করে দাউদ (আ.)-কে পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর কাছে এসেছিলো। কারণ, আল্লাহ তায়ালা দাউদ (আ.)-কে নবুওতের পাশাপাশি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বও দান করেছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্যেই ওই দুজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠনো হয়েছিলো। তারা অত্যন্ত উত্তেজনাকর একটি বিষয় নিয়ে দুই বিবদমান পক্ষ সেজে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো এবং কেবল এক পক্ষই তার বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলো। বাদী উত্তেজিত হলেও বিচারকের কখনও উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়, ত্বড়িৎ রায় ঘোষণা করাও উচিত নয়। একজন ন্যায়বিচারক কখনও কেবল এক পক্ষের বক্তব্য শুনেই রায় ঘোষণা করে না; বরং বিপক্ষকেও তার বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করার সুযোগ দেয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য সামনে আসার পর অনেক সময় মামলার মোড় ঘুরে যায় এবং প্রমাণিত হয়, একতরফা বক্তব্য বিভ্রান্তিকর অথবা মিথ্যা ছিলো, অথবা অসম্পূর্ণ ছিলো।

এই পর্যায়ে এসে দাউদ (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোক দুটো তাঁকে পরীক্ষা করে গেলো। আর তখনই তাঁর মাঝে নবীসুলভ স্বভাব প্রকৃতি জেগে ওঠে। তিনি আল্লাহর দরবারে

ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। দয়াময় আল্লাহও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। বলা হচ্ছে,

'আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার রয়েছে উচ্চমর্যাদা ও সুন্দর আবাসস্থল।' (আয়াত ২৫)

পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা দ্বারা দাউদ (আ.)-এর পরীক্ষার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় এবং সাথে সাথে সেই কথাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তার সেসব বান্দাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেন তাদের কাছ থেকে তিনি কি ধরনের আচরণ কামনা করেন। বলা হচ্ছে,

'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।' (আয়াত ২৬)

অর্থাৎ যাদের পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধির দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের উচিত ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষকে শাসন করা, তাদের বিচার আচার করা এবং এসব ক্ষেত্রে খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করা। একজন নবীর ক্ষেত্রে খেয়াল খুশীর অনুসরণ বলতে যা বুঝায় তা হলো, প্রকৃত অবস্থা না জেনে, আগপাছ না ভেবে এবং নিশ্চিত না হয়ে, আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছু করা। আর সেই জাতীয় খেয়াল-খুশীর অনুসরণের কারণে পরিণামে মানুষ আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই এই বিপথগামিতার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে মতে যারাই আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভুলে যাবেন এবং পরকালে তারা কঠিন শাস্তির শিকার হবে।

কিন্তু দাউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি ছিলো। সে কারণেই তিনি তাঁকে প্রথম দফায়ই হুশিয়ার করে দেন, প্রথম পদক্ষেপেই তাঁকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং এর চরম পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। অথচ তিনি বিপথগামিতার পথে পা বাড়াননি, আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যা তিনি বিশেষ বান্দাদের বেলায় করে থাকেন। এ সকল বান্দারা মানব হয়েও চলার পথে তাঁদের পা খুব কমই ফস্কায়। তাই তাদের এই বিচ্যুতি আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন, তাদের রক্ষা করেন, পথনির্দেশ করেন, ক্ষমা প্রার্থনার তাওফীক দান করেন, তাদের ক্ষমা করে দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের প্রতি বিশেষ দয়া ও রহমত করেন।

পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব এবং মানব সমাজে শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কিত সঠিক নীতি বর্ণনার মুহূর্তে এবং দাউদ (আ.)-এর প্রসংগের ইতি টানার পূর্বেই এই সত্য নীতির মূল ভিত্তির প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে। এই সেই ভিত্তি যার ওপর আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যকার সকল বস্তু নির্ভর করে আছে। গোটা সৃষ্টিজগতের গভীরে এই ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে। সেই ভিত্তি পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব থেকেও ব্যাপক এবং মানব সমাজে শাসনকার্য পরিচালনার চেয়েও ব্যাপক। সেই ভিত্তি এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় এবং এই জাগতিক জীবনের পরিধির তুলনায় অনেক প্রশস্ত। কারণ তা ইহজগতকে অতিক্রম করে পরকালীন জগত পর্যন্ত প্রসারী। এই মূল ভিত্তি থেকেই সর্বশেষে রেসালাত উদ্ভূত এবং এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই মহান ও সর্বব্যাপী সত্যের ভিত্তি কি, তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, অর্থাৎ জাহান্নাম। (আয়াত ২৭-২৯)

অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এই উভয়ের মধ্যকার কোনো বস্তুই না হকভাবে পয়দা করা হয়নি এবং এগুলো না-হক বা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং এ সবের সৃষ্টিও সত্য এবং এসবের ভিত্তিও সত্য। আর এই মহাসত্য হতেই উদ্ভূত হয়েছে অন্যান্য সকল সত্য। যেমন খেলাফতের সত্যতা, শাসনকার্যের সত্যতা এবং মানবীয় অনুভূতি ও কর্মের মূল্যায়নের সত্যতা। কাজেই যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল তারা কখনও পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ন্যায় হতে পারে না। তেমনিভাবে সৎ ও আল্লাহভীরু লোকেরা কখনও অসৎ আল্লাহদ্রোহী লোকদের সমপর্যায়ের হতে পারে না। আর এই সত্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে এসেছে, তা অনুধাবন করার মতো শক্তি কোনো কাফেরের নেই। কারণ, তাদের স্বভাব প্রকৃতি এই সৃষ্টিজগতের মধ্যকার মূল সত্যটির সাথে সম্পৃক্ত নয়। সেই কারণেই তারা নিজেদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে, কিন্তু এই ভুল ধারণার জন্যে তাদের জাহান্নামে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

যে প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, তারই আওতায় মানব জাতির জন্যে জীবন বিধান হিসেবে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন। আর তিনি যে ঐশী গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন তা হচ্ছে সেই মহাসত্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ, যার ওপর সে প্রাকৃতিক বিধান টিকে আছে। অপরদিকে খেলাফত, শাসন ও বিচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কাছে আল্লাহ তায়ালা যে ন্যায়নীতি দাবী করেন তা সে সামষ্টিক মহাসত্যেরই একটি অংগ। বলাবাহুল্য, এই সামষ্টিক মহাসত্যের অংগগুলো সব সুসংঘবদ্ধ ও সুসংহত না হলে মানব জীবনের কোনো কিছুই সঠিক ধারায় প্রবাহিত হতে পারে না। আর সে কারণেই বলতে পারি, আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুতি, খেলাফতের সত্য নীতি হতে বিচ্যুতি এবং শাসন ও বিচারকার্যের ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুতি হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক বিধান হতে বিচ্যুতিরই নামান্তর, যার ওপর ভিত্তি করে আসমান ও যমীন টিকে আছে। এই হিসেবে দেখতে গেলে বিষয়টি অমংগলেরও কারণ। তাই যারাই এই বিশাল জাগতিক শক্তিগুলোর সাথে টক্কর দিতে যাবে পরিণতিতে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যারা অত্যাচারী, যারা স্বৈরাচারী এবং যারা আল্লাহর নীতি থেকে বিচ্যুত, বিচ্যুত প্রাকৃতিক বিধান থেকে, বিচ্যুত সৃষ্টিজগতের স্বভাব প্রকৃতি থেকে তারা কখনও নিজেদের স্বল্প ও নগণ্য শক্তি নিয়ে সে সর্বনাশী ও সর্বগ্রাসী শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারে না এবং টিকে থাকতে পারে না বিশ্ব জগতের সেই বিশাল নিষ্পেষক চাকার সম্মুখে। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে হবে।

সেই মহাসত্যের প্রকৃতি উৎঘাটন করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসা বক্তব্যের পর এখন মূল ঘটনার দিকে যাওয়া হচ্ছে। এখানে দাউদ (আ.) এবং তাঁর পুত্র সোলায়মান (আ.) এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান, করুণা ও দয়া কি ছিলো, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সাথে সাথে সোলায়মান (আ.)-কে কি কি ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছেন ও কৃতার্থ করেছেন, সে বিষয়েও বলা হচ্ছে। যেমন,

'আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল।' (আয়াত ৩০-৪০)

সোলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষা

আলোচ্য আয়াতগুলোতে দুটো ইঙ্গিতময় শব্দের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। একটি হলো 'উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি' আর অপরটি হলো, 'নিথর দেহ'। এই শব্দ দুটোর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে যা

বলা হয়েছে তাতে আমার মন আশস্ত হতে পারছে না। কারণ সে ব্যাখ্যাগুলো হয়ত অনেকটা ভ্রান্ত ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর অথবা দলীল প্রমাণহীন মনগড়া বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণেই উক্ত শব্দ দুটোর আড়ালে কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করে কিছু বলতে পারছি না। তাছাড়া এমন কোনো বিশুদ্ধ হাদীসও আমার সামনে নেই যার ওপর নির্ভর করে আমি সে দুটো শব্দের ব্যাখ্যায় ও বর্ণানায় নিরত হব। অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদীস রসূলুল্লাহ (স.)-এর বরাত দিয়ে বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি নিসন্দেহে বিশুদ্ধ, কিন্তু আলোচ্য ঘটনা দুটোর কোনটির সাথে এর সম্পর্ক সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। হাদীসটির বক্তব্য এরূপ, 'সোলায়মান বলল, আমি আজ রাতে সত্তর জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হব যাদের প্রত্যেকের গর্ভে বীর সন্তান জন্ম লাভ করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। সে 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। সে তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলো, কিন্তু একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভধারণ করেনি, আর সেও একজন অর্ধাংগ সন্তান প্রসব করল। আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি সে ইনশাআল্লাহ বলতো, তাহলে (আর ঔরসে) বীর সন্তান জন্ম লাভ করত যারা সকলেই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করত।' হতে পারে এটাই সেই পরীক্ষা যার কথা আয়াতে বলা হয়েছে। অথবা 'নিথর দেহ' বলতে এই অর্ধাঙ্গ শিশুটিকেই বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। যা কিছু বলা হলো তা নিছক অনুমান।

আর ঘোড়ার কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সোলায়মান (আ.) বিকেল বেলায় তাঁর সুসজ্জিত ঘোড়াগুলো পরিদর্শন করছিলেন। এর ফলে তাঁর আছরের নামায কাযা হয়ে যায়। তাই তিনি সেগুলোকে পুনরায় তাঁর সামনে আনতে বললেন। তাঁর সামনে সেগুলো আনা হলো। তখন তিনি সেগুলোর গলা ও পা কেটে দিলেন। অর্থাৎ যবাই করে দিলেন। কারণ এগুলোর কারণেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি ঘোড়াগুলোর গলায় ও পায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দেন। কারণ, এগুলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত হয়। এই উভয় বর্ণনার কোনো একটিরই দলীল প্রমাণ নেই। কাজেই এ সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা কঠিন ব্যাপার।

সেই কারণেই কোরআনে বর্ণিত ঘটনা দুটোর ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। এখানে আমরা বড়জোর এতোটুকু বলতে পারি যে, অন্যান্য নবী রসূলদের আল্লাহ তায়ালা যেভাবে পরীক্ষা করেছেন ঠিক সেভাবেই সোলায়মান (আ.)-কেও ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করে পরীক্ষা করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ক্রটি বিচ্যুতি হতে দূরে রাখা। অপর দিকে সোলায়মান (আ.)ও নিজ প্রভুর প্রতি আত্মনিবেশ করেছেন, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বড় আশা নিয়ে ফরিয়াদ জানান,

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে মাফ করো এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করো যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।' (আয়াত ৩৫)

সোলায়মান (আ.)-এর এই আবেদনের সবচেয়ে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তিনি এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি কামনা করেননি; বরং তিনি এর মাধ্যমে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ কামনা করেছেন যার বহিপ্রকাশ ঘটবে মোজেযা আকারে। তিনি এর মাধ্যমে বিশেষ এক ধরনের শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করেছেন। যার ভাগীদার পরবর্তী যুগের অন্য কোনো শাসক হবে না

এবং যার অস্তিত্ব হবে অদ্বিতীয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে তাঁর কাংখিত শাসন ক্ষমতারও অতিরিক্ত দান করেছেন, যার কোনো নযির নেই। বলা হয়েছে,

'তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো যেখানে সে পৌছাতে চাইতো।' (আয়াত ৩৬-৩৭)

বাতাস আল্লাহর হুকুমেই চলে। তাই তিনি যদি এটাকে তাঁর বিশেষ কোনো বান্দার অনুগত করে দেন তাহলে সেটাও আল্লাহর হুকুমেরই বাস্তবায়ন বলে গণ্য হবে। এ কারণে বলা যাবে না যে, বাতাসের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা খর্ব হয়েছে; বরং বলা হবে, আল্লাহর সেই বিশেষ বান্দার নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশেরই বহিপ্রকাশ ঘটেছে। এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। এর দৃষ্টান্তও কোরআন শরীফে রয়েছে। যেমন সূরা আহযাবের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'মোনাফেকরা' যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে উত্তেজিত করবো। অতপর এই শহরে তোমার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে।' এর অর্থ কি? এর অর্থ এই নয় কি, মোনাফেকগোষ্ঠী তাদের অপকর্ম বন্ধ না করলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে রসূলকে উত্তেজিত করবেন, ফলে তিনি তাদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করবেন। এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটছে। তাই বলতে পারি, প্রকৃত ইচ্ছা ও নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তার বাস্তবায়ন ঘটছে রসূলের কর্মের মাধ্যমে। ঠিক এই পর্যায়েই পড়ে সোলায়মান (আ.)-এর বিষয়টিও। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশেই বাতাসকে সোলায়মান (আ.)-এর অনুগত করা হয়েছে। ফলে তিনি এটাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছারই বহিপ্রকাশ ঘটতো।

ঠিক এইকভাবে আল্লাহ তায়ালা শয়তানদেরও সোলায়মান (আ.)-এর অনুগত করেছিলেন। ফলে তারা তাঁর নির্দেশে দালান কোঠা নির্মাণ করত এবং সমুদ্রে ডুব দিত। এদের কেউ অপরাধ করলে বা নির্দেশ অমান্য করলে তাদের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। তিনি তাদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন অথবা বেড়ি পরিয়ে রাখতেন।

এরপর সোলায়মান (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয় যে, তোমাকে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ধন-সম্পদ আকারে যা কিছু দান করা হয়েছে সে ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। যাকে যা ইচ্ছা দান করতে পারো, অথবা যার কাছ থেকে যতোটুকু ইচ্ছা আটকে রাখতে পারো। বলা হয়েছে,

'এগুলো আমার অনুগ্রহ। অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও এর কোনো হিসেব দিতে হবে না।' (আয়াত ৩৯)

এটা হচ্ছে সোলায়মান (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অতিরিক্ত দয়া ও দান। এর ওপরও অতিরিক্ত দান হিসেবে ইহকালে রয়েছে বিশেষ মর্যাদা আর পরকালে রয়েছে উত্তম পরিণতি। বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।' (আয়াত ৪০)

এই হচ্ছে সোলায়মান (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর শুভদৃষ্টি, সন্তুষ্টি এবং অশেষ অনুগ্রহ ও সম্মানের নমুনা।

আইউব (আ.)-এর ত্যাগ ও ধৈর্য

প্রসংগক্রমে পুনরায় মোমেনদের বিপদাপদে ধৈর্য সহ্য এবং এর পুরস্কারের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা। বলা হয়েছে,

'স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললো, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। (আয়াত ৪১-৪৪)

আইয়ুব (আ.)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষা ও ধৈর্যের ঘটনা প্রসিদ্ধ। ধৈর্য সহ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইহুদীদের বর্ণনা করা এমন সব কেসসা কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় যা, মূল ঘটনাকেই আড়াল করে রেখেছে। কোরআনের বক্তব্য অনুসারে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় সেটুকুই হচ্ছে সত্য বিবরণ। এতে বলা হয়েছে, আইয়ুব (আ.) ছিলেন একজন সৎ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিভিন্ন বিপদাপদে ফেলে পরীক্ষা করেছেন। তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। মনে হয়, তাঁর ধন সম্পদ, পরিবার পরিজন ও সুস্থতা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো, কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায়ই নিজ মালিক ও প্রভুর সাথে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন, তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখেছেন এবং ভাগ্যে যা লেখা ছিলো তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

এই চরম বিপদের মুহূর্তেও যারা তাঁকে ত্যাগ করে যাননি যাদের অন্যতম ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী। তাদের মনে শয়তান বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা যদি আইয়ুব (আ.)-কে ভালোই বাসতেন তাহলে তাঁকে এ ধরনের বিপদে ফেলতেন না। এ সব কথা তারা আইয়ুব (আ.)-এর সামনেই বলাবলি করতো। এগুলো তাঁর জন্যে ছিলো সে রোগ বালাইয়ের চেয়েও অধিক পীড়াদায়ক। একদিন তাঁর সহধর্মিনী সে জাতীয় কথা তাঁর সামনে বলাতে তিনি শপথ করে বললেন, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলে তাকে এতো বার (কেউ কেউ একশ বারের কথা উল্লেখ করেছেন) প্রহার করবেন। এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেন এবং ফরিয়াদ জানিয়ে বলেন যে, শয়তান তাঁর আপনজনদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করেন। কারণ, তিনি তাঁর মাঝে সততা, ধৈর্য ও শয়তানের প্রতি তাঁর ঘৃণার পরিচয় পেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে আরোগ্য দান করেন এবং বিপদ দূর করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জমির ওপর পা দিয়ে আঘাত করতে বলেন। তিনি পা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে শীতল পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি সেই পানি পান করেন এবং তা দিয়ে গোসল করেন। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠেন। সে প্রসংগে বলা হয়েছে,

'তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। ঝর্ণা নির্গত হলো গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে।' (আয়াত ৪২)

এর পরে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ....।' (আয়াত ৪৩)

কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুত্রদের জীবিত করেন এবং তাদের ন্যায় আরও সন্তান দান করেন। তবে আল্লাহ তায়ালা আইয়ুব (আ.)-এর মৃত সন্তানদের জীবিত করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোরআনে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তাই জীবিত করার অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি যখন সুস্থ হয়ে ওঠলেন তখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া ছেলে সন্তানদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এ সকল সন্তান তাঁর কাছে নিখোঁজ বা মৃত হিসেবেই গণ্য ছিলো। যা হোক, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও সন্তান দান করেন। আর এটা ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া ও দান। এ থেকে বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের অনেক কিছুই রয়েছে।

মোট কথা, এসব ঘটনার মাধ্যমে যে বিষয়টি এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হলো, বিপদাপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে, তকদীরের ফয়সালায় যারা রাযি খুশী থাকে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে দয়া অনুগ্রহ করেন।

তবে স্ত্রীকে প্রহার করার যে শপথ তিনি নিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা সেটারও একটা সুষ্ঠু সমাধান করে দেন। কারণ, তাঁর প্রতিও আল্লাহর দয়া ছিলো এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতিও আল্লাহর দয়া ছিলো, যিনি এই চরম বিপদের মুহূর্তে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেছেন এবং পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা আইয়ুব (আ.)-কে একগুচ্ছ কাঠি নিতে বললেন এবং তা দিয়ে স্ত্রীকে একবার আঘাত করতে বললেন। আর সেভাবেই তিনি শপথ ভংগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। বলা হয়েছে,

তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ শলা নাও, তা দ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভংগ করো না।' (আয়াত ৪৪)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত আইয়ুব (আ.)-কে নানা প্রকার বালা-মসিবতের মধ্যে সবর এখতিয়ার করতে দেখেছেন, দেখেছেন তাঁর আনুগত্যপূর্ণ কাজ ও ব্যবহার এবং যেভাবে তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর ওপর খুশী হয়ে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে সকল সমস্যার সহজ সমাধান ও নানা প্রকার নেয়ামত দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে সবর এখতিয়ারকারী হিসাবে পেয়েছি, উৎকৃষ্ট বান্দা (আমার), নিশ্চয়ই সে সর্বান্তকরণে (আমার কাছে) রুজুকারী।'

এ ঘটনাগুলোর আরো কিছু বিবরণ

এ সূরার মধ্যে উল্লেখিত এই তিনটি কাহিনী বর্ণনা করার পর আমরা এসবের কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করার প্রয়োজন বোধ করছি। যেন রসূলুল্লাহ (স.) এরূপ যেসব ঘটনার স্মরণ করে অন্যেরা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তাতে সবর করতে পারেন। এ পর্যায়ে অতীতের সকল রসূলের অবস্থা সামনে রেখে তাঁদের কার্যপ্রণালীর কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, তাঁদের প্রত্যেক জীবনের ঘটনাবলী নানা প্রকার বিপদ-আপদের মধ্যে ফেলে তাদের চরমভাবে পরীক্ষা করার দৃশ্য, সাথে সাথে আরও দেখা যায় সেই অসংখ্য বিপদের মধ্যে তাদের অপরিসীম সবরের দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাশাপাশি বহু রসূলের যিন্দেগীতে অজস্র পুরস্কার ও প্রভূত মান মর্যাদাপ্রাপ্তির ঘটনা দেখা গেছে। যেমন দাউদ, সোলায়মান ও আইয়ুব (আ.)-এর আমলে তাদের জীবনে প্রাচুর্য ও প্রচুর মান সম্ভ্রম দেখা গেছে, তাদের মধ্যে এমন অনেকে অতীত হয়েছেন যাদের আগমনকাল জানা আছে আবার অনেকের আগমনকাল জানা যায়নি। কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল কোরআন এবং সত্যের মূল উৎস তো রয়েছে আমার কাছে, যার পরিসীমা কেউ করতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইব্রাহীম, এসহাক, ইয়াকুবকে (-ও) স্মরণ .... স্মরণ করো ইসমাঈল, ইয়াসা ও যুল কিফলের কথা, এরাও সবাই ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।' (আয়াত ৪৫-৪৮)

ইবরাহীম, এসহাক, ইয়াকুব এবং ইসমাঈল অবশ্য দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর পরে এসেছেন, কিন্তু আইয়ুব (আ.)-এর যামানায় তারা কে কোথায় ছিলেন তা আমাদের জানা নেই। নবী ইয়াসা' ও নবী যুল-কিফল কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন তাও আমরা কেউ জানি না। আল কোরআনে তাঁদের কথা বলতে গিয়ে কিছু ইংগিত দেয়া হয়েছে মাত্র, যাতে করে সেই প্রসংগের আলোচনা থেকে দ্রুতগতিতে মনোযোগ পরবর্তী আলোচনার দিকে সরে যায়। অর্থাৎ

ওখানে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে আগত, হিব্রু ভাষায় উচ্চারিত 'ইলয়্যশা'-নামক আর একজন নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, যাঁকে সম্ভবত আরবী ভাষায় 'আল ইয়াসা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যুল-কিফল নামক নবী সম্পর্কে শুধু এতোটুকু আমরা জানি যে, আল কোরআনে তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সে ভালো লোকদের মধ্যে একজন ছিলো।'

অতপর মহান আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম, এসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর গুণাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন, তারা 'সবাই শক্তিশালী এবং দূরদর্শী মানুষ ছিলো।' এসব কথা দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ভালো কাজ, তাদের দূরদর্শিতাপূর্ণ পদক্ষেপ ও সুস্থ চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনার দিকে ইংগিত করেছেন, যেন তিনি বুঝাতে চাইছেন, ভালো কাজ যে করবে না তার ক্ষমতা পাওয়ার কোন অধিকারই নেই, আর যে সুস্থ চিন্তা না করবে তার বুদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোনো বিষয়ে তার মতামতও গ্রহণযোগ্য নয়।

এভাবে অতীতের নবী রসূলদের মর্যাদাপূর্ণ মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, তিনি সেসব নবী রসূলকে বিশেষ কিছু গুণাবলী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন যেন তাঁদের অনুসারীরা আখেরাতের যিন্দেগীর কথা স্মরণ করতে পারে এবং সেই যিন্দেগীর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ছাড়া অন্যসব কিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদের পরকালের স্মরণকারী জনগণ হিসাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছি।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরকালের স্মরণই তাদের বৈশিষ্টমন্ডিত বানানোর আসল হাতিয়ার, আর এই বিশেষ গুণটিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাদের কাছে তাদের মর্যাদাবান বানিয়েছে, বিশেষ করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে এ গুণটিই তাদের প্রিয় করে তুলেছে। 'অবশ্যই আমার কাছে ওদের স্থান চিরদিনের জন্যে সম্মানজনক হয়ে রয়েছে।'

আর এমনি করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবী ইসমাঈল, আল ইয়াসা এবং যুল কিফল– এরা সবাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। এরপর আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী ও তাঁর শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মোহাম্মদ (স.)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে জানাচ্ছেন যেন তিনি তাঁর পূর্বসূরী নবী রসূলদের অবস্থা স্মরণ করেন এবং যেভাবে তারা শত বিরোধিতাপূর্ণ পরিবেশে অবিচল জীবন যাপন করেছেন, সেভাবে তিনিও যেন সকল অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন, তাঁদের সবর থেকে এবং তার ফলে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর পথভ্রষ্ট জাতির হঠকারিতায় ঘাবড়ে না যান এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বানানোর হীন প্রচেষ্টার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যেন পর্বতসম দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। কারণ সবর বা অবিচলতাই হচ্ছে ভ্রান্ত জনগণের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়ার উত্তম এবং দাওয়াতদানের মোক্ষম পদ্ধতি। আর এটা সত্য কথা যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর দৃঢ়তা অবলম্বনকারী ও ধৈর্যশীল বান্দাদের কখনো অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন না; বরং সর্বাবস্থায় তাদের সবরের কারণে তিনি উত্তম প্রতিদান দেন এবং তাঁর রহমত, বরকত ও মর্যাদা দানে তাদের তিনি ভূষিত করেন। কেননা আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। অপরদিকে চক্রান্তকারীদের বলা হচ্ছে, সত্যকে উৎখাত প্রচেষ্টায় তারা যতো যাইই করুক না কেন, তারা কিছুতেই সাফল্যমন্ডিত হবে না, যেহেতু রসূল (স.)-কে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করা, তাঁকে পরিচালনা করা, তাঁকে পুরস্কৃত করা এবং মর্যাদা দান করার সাথে সথে পেয়ারা নবী (স.)-কে মিথ্যাবাদী বানানোর অপচেষ্টারত ব্যক্তিদের চক্রান্ত জাল ছিন্ন করার সকল কাজ তিনিই আনজাম দিয়ে থাকেন। এরশাদ হচ্ছে,

'এ পাক কালাম হচ্ছে এক মহান উপদেশ বা চিরন্তন স্মরণিকা, যে বিষয়ে (আজ) জাহান্নামীরা তর্ক-বিতর্ক করছে।' (আয়াত ৪৯-৬৪)

وَاذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ﴿٥٨﴾ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ ﴿٦١﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি আরো স্মরণ করো ইসমাঈল, ইয়াসা' ও যুল কিফলের কথা; এরাও সবাই ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো; ৪৯. এ (বিবরণ) হচ্ছে একটি (মহৎ) দৃষ্টান্ত; অবশ্যই পরহেযগার লোকদের জন্যে উত্তম আবাসের ব্যবস্থা রয়েছে, ৫০. (সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা (হামেশাই) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে, ৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমূল ও পানীয় সরবরাহের আদেশ দেবে। ৫২. তাদের পাশে (আরো) থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা তরুণীরা। ৫৩. (হে ঈমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নেয়ামত) যা বিচার দিনের জন্যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। ৫৪. এ হচ্ছে আমার দেয়া রেযেক– যা কখনো নিঃশেষ হবে না, ৫৫. এ তো হলো (নেককারদের পরিণাম, অপরদিকে) বিদ্রোহী পাপীদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতম ঠিকানা, ৫৬. জাহান্নাম– যেখানে তারা গিয়ে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট নিবাস এটি! ৫৭. এ হচ্ছে (তাদের পরিণাম,) অতএব তারা তা আস্বাদন করুক, (আস্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, ৫৮. (তাদের জন্যে রয়েছে) এ ধরনের আরো (বীভৎস) শাস্তি; ৫৯. (যখন দলপতিরা) অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখবে (তখন বলবে), এ হচ্ছে (আরেকটি) বাহিনী, (যারা) তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করার জন্যে (ধেয়ে) আসছে (আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত তাদের ওপর), তাদের জন্যে কোনো রকম অভিনন্দনের ব্যবস্থা এখানে নেই; এরা জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে। ৬০. তারা (দলপতিদের) বলবে, বরং তোমাদের ওপরও (আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ অভিসম্পাত, আজ এখানে) তোমাদের জন্যেও তো কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের এ (মহা-) বিপদের সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ আবাসস্থল! ৬১. (যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنٰهُمْ

سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬২. তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, (আজ জাহান্নামে) আমরা সেসব মানুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন– যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ লোকদের দলে শামিল (মনে) করতাম; ৬৩. তবে কি আমরা তাদের অহেতুকই ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না (আমাদের) দৃষ্টিশক্তি তাদের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ৬৪. জাহান্নামীদের (নিজেদের মাঝে) এ বাকবিতন্ডা (সেদিন) হবে অবশ্যম্ভাবী।

তাফসীর

আয়াত ৪৯-৬৪

ওপরের আয়াতগুলোতে অতীতের ঘটনাপ্রবাহের নিশ্চিত সংবাদ বর্ণিত হয়েছে এবং নানা প্রকার বিপদ আপদের মধ্যে ফেলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করার বহু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সে সকল প্রতিকূল ও কন্টকাকীর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতিতে তাদের সত্য সঠিক পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং তার পুরস্কার স্বরূপ তাদের জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহর রহমত ও মর্যাদা লাভ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ সব কিছুই রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সংগী সাথী এবং পরবর্তীকালের মোত্তাকী মুসলমান বান্দাদেরকে এই পৃথিবীতে এক স্বর্ণালী জীবনের সন্ধান দিয়েছে এবং তাদের পরকালীন যিন্দেগীর জন্যে তাদের কাছে মহাসাফল্যের সুসংবাদ বয়ে এনেছে। এরপর আল্লাহর মোত্তাকী বান্দাদের পরবর্তী যিন্দেগীতে কি প্রতিদান দেয়া হবে এবং দুনিয়ার বাকী জীবনেও বা তারা কি পাবে তা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা ..... এ সবের পর উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে কেয়ামতের নানাবিধ দৃশ্যের মধ্য থেকে একটি বিশেষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআনুল করীমের বহু পৃষ্ঠাব্যাপী এসব দৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব সেসব কঠিন দৃশ্যের বর্ণনা যে কোন হৃদয়ে ছাপ রেখে যায়।

কেয়ামত পরবর্তি কিছু দৃশ্য

কোরআনে বর্ণিত কেয়ামতের নানাবিধ দৃশ্যের মধ্যে এখানে দুটি ছবি দেখা যাচ্ছে, যেগুলো সকল দিক দিয়েই পরস্পর তুলনাযোগ্য। একটি ছবি হচ্ছে মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের, যারা জীবনে আল্লাহর ভয়ে ভালো মন্দ বাছবিচার করে চলেছে। যা কিছু ভালো এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর সেটাই তারা গ্রহণ করেছে, এতে অবশ্য তাদের কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যা কিছু মন্দ, কষ্টকর হলেও তারা আল্লাহর ভয়ে সেগুলো ত্যাগ করেছে। এসব লোকদের জন্যে রয়েছে সুন্দর পরিণতি। আর একটি দৃশ্য হচ্ছে অহংকারী ও আল্লাহর রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকামী বিদ্রোহীদের– তাদের জন্যে রয়েছে চরম মন্দ পরিণতি। প্রথম শ্রেণীর লোকদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ (ফুলে ফলে সুশোভিত বাগ-বাগিচা পরিবেষ্টিত মনোরম বাসস্থান), যেগুলোর দরজাসমূহ তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। তাদের জন্যে সেখানে সজ্জিত থাকবে আরাম কেদারার শ্রেণীবিন্যাস, যাতে তারা আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বেহেশতের সুরভি ভোগ করবে, থাকবে রকম-বেরকমের খাদ্য ও পানীয় সজ্জিত রেকাবি ও পানপাত্রসমূহ।

তাদের বালাখানায় আরও থাকবে নানা উপাদেয় ভোগ্য সামগ্রী (যার জন্যে পৃথিবীতে তারা লালায়িত ছিলো)। আর যার চাহিদা আল্লাহর ভয়েই পৃথিবীতে তারা নিয়ন্ত্রিত রেখেছে। আরও থাকবে সেখানে তাদের জন্যে সকল নেয়ামতের বড় নেয়ামত আয়তলোচনা সুন্দরী যুবতী ললনারা। এরা সর্বাংগীণ সুন্দরী যুবতী হওয়ার সাথে সাথে হবে ঢুলুঢুলু আঁখি এবং বিনয় নম্রতার কারণে চোখ যেন তাদের ওঠতেই চাইবে না, চোখ তুলে চোখে চোখে তাকাতে পারবে না, এরা সবাই হবে সমবয়স্কা। এসব নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এসব নেয়ামত কখনও শেষ হয়ে যাবে না। অর্থাৎ এসব নেয়ামতের লয় বা ক্ষয় থাকবে না 'থাকবে না এসবের কোনো পরিসমাপ্তি।'

অপর ছবির লোকদের জন্যেও থাকবে তাদের কিছু বিছানা, কিন্তু সেখানে কোনো আরাম থাকবে না। সেটা হবে জাহান্নাম– 'নিকৃষ্টতম বিছানা।' আর তাদের জন্যে সেখানে থাকবে গরম পানীয় এবং এমন খাদ্য যা খেতে গেলে বমি হয়ে তা ওঠে আসবে, বরং এগুলো হবে নিকৃষ্টতম তরল পানীয়, যা জাহান্নামবাসীর দেহ থেকে পুঁজ বা পাচড়ার ধোয়ানি আকারে বেরিয়ে আসবে। অথবা এ ধরনের আযাবের আরও রকম-বেরকমের সংস্করণ সেখানে উদ্ভাবিত হবে। এর অর্থ করতে গিয়ে বলা হয়েছে। 'এগুলো হবে জানা অজানা জোড়া জোড়া আযাব।' অর্থাৎ আরও বহু প্রকারের আযাব এতে সংযোজিত হবে।

এরপর এই দৃশ্যের যবনিকা পতন হচ্ছে তৃতীয় এক ছবির উল্লেখের মাধ্যমে, যাতে সেই জাহান্নামীদের বাক-বিতন্ডার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে একটি অহংকারী গোষ্ঠী, দুনিয়ার জীবনে ওই গোষ্ঠী ছিলো পরস্পরের কাছে প্রিয়, একে অপরের দরদী এবং তাদের মধ্যে মহব্বতের বিনিময় হতো, কিন্তু আজ কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে তারা একে অপরকে ঘৃণা করবে, দোষারোপ করবে পরস্পরকে। তারাই তো সেসব মানুষ যারা অতীতে একে অপরকে ভুল পথে চলার ব্যাপারে সহায়তা করত। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলো যারা মোমেনদের ওপর নিজেদের পজিশন বড় মনে করে অহংকার প্রদর্শন করতো এবং তাদের দাওয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো, যেহেতু তারাই তখন সুখ-সম্পদের মধ্যে ছিলো। কোরায়শ সর্দারদের মতো তাদের দাবী ছিলো, তারা দুনিয়াতে যেমন নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে, তেমনি পরকালেও তারা সুখ-সম্পদের অধিকারী হবে, যেমন করে তারা কটাক্ষপাত করে বলতো, 'আমাদের মধ্যে সেই (ইয়াতীম ও অসহায়) লোকটির ওপরেই কি নাযিল হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব উপদেশবাণী?'

হাঁ, সেসব লোকই হবে দোযখবাসী যারা দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তারা একে অপরকে বলবে, 'ওই যে দলটি (আসছে) ওরাও তোমাদের সাথেই প্রবেশ করবে' (এই দোযখে) .... বলুন তো ওদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব কি হবে? ..... এর জওয়াব দিতে গিয়ে তখন রাগে ফেটে পড়বে এবং বলবে, না, কিছুতেই ওদের জন্যে কোনো অভ্যর্থনা নয়, ওরা অবশ্যই দোযখে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় দোষারোপ করা ব্যক্তিরা কি চুপ থাকতে পারে? ওরা সেই একইভাবে জওয়াব দেবে। বলবে, তোমাদের জন্যেও আজ কোনো অভিনন্দন নেই, তোমরা তো আমাদের পূর্বে এখানে এসেছো, তোমাদের জন্যে অতি নিকৃষ্ট এ বাসস্থানটি .... কিন্তু তোমরাই তো এই আযাবে আমাদের প্রবেশ করার কারণ ঘটিয়েছ। যখন সেই ডাকের মধ্যে ক্রোধ, সংকীর্ণতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে যাবে, তখন ওরা বলবে, হে আমাদের রব, কে আমাদের এখানে নিয়ে এলো? যে বা যারা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে তাকে বা তাদেরকে আজ তুমি দ্বিগুণ আযাব দাও!

এরপর কি হবে? এরপর হঠাৎ করে তাদের সামনে থেকে সেই মোমেনরা হারিয়ে যাবে, যাদের ওপর পৃথিবীর বুকে তারা প্রভুত্ব করতো বা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো, ওরা বরাবর তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখার চেষ্টা করেছে এবং তারা নিজেরা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে থাকার কারণে সেই গরীব, নিরীহ এবং অসহায় মোমেনদের সদা-সর্বদা উপহাস বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে রেখেছে। সেই কেয়ামতের দিন যখন ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিরীহ মোমেনদের জাহান্নামের আযাবের মধ্যে পাবে না এবং যখন তারা দেখবে, হঠাৎ করে সকল কষ্টকর অবস্থা থেকে সে মোমেনদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করবে, তারা আজ কই? কোথায় গেলো ওরা? তোমরা কি তাদের দেখতে পাচ্ছ, নাকি আমাদের চোখগুলো বিকল হয়ে গেলো যে, তাদের দেখতে পাচ্ছি না? এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা বলবে, কি হলো আমাদের, আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি না কেন? কেন দেখছি না আজ সেসব হতভাগা ব্যক্তিদের যাদের আমরা গোবেচারা মনে করতাম এবং নিকৃষ্ট জ্ঞানে যাদের কোনো দাম দিতাম না, বরং সব সময় তাদের সাথে উপহাস বিদ্রূপ করতাম? না কি আমাদের চোখগুলোই বিকল হয়ে গেলো? আসলে যখন তাদের সম্পর্কে এসব কথা চলতে থাকবে তখন তাদের অবস্থান হবে জান্নাতের মনোরম বাসস্থানে।' এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই সেদিন যে আসবে এ কথা সত্য এবং তখন দোযখবাসী পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে।'

অতপর আলোচনার ধারা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দোযখবাসীদের বাসস্থান, সেসব নেক ও মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের বাসস্থান থেকে বেশী দূরে থাকবে না, যাদের ওরা দুনিয়ার জীবনে উপহাস বিদ্রূপ করত এবং সেদিন আল্লাহ তায়ালা যে সম্মান তাদের দেবেন সেটাকে তারা খুব বেশী মনে করতে থাকবে, আর কি ভয়ানক বিপজ্জনকই না হবে তাদের সেদিনের সেই পাওনা, যার জন্যে তারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে তারা ব্যস্ততা দেখাতো! তারা বলতো 'হে আমাদের রব, হিসাব নিকাশের দিনটি আসার আগেই আমাদের পাওনাটা দিয়ে দাও না! বলো, আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র .... আর অবশ্যই কিছুদিন পরে তোমরা জানতে পারবে।' (আয়াত ৬৫-৮৮)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾ اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾

রুকু ৫

৬৫. (হে নবী, এদের) বলো, আমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি মহাপরাক্রমশালী, ৬৬. (তিনি) আসমান ও যমীনের মালিক– (মালিক তিনি) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও, তিনি প্রচুর ক্ষমতাশালী ও মহা ক্ষমাশীল। ৬৭. (তাদের) তুমি বলো, এ (কেয়ামত) হচ্ছে মূলত একটি বড়ো ধরনের সংবাদ, ৬৮. আর তোমরা (কিনা) এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। ৬৯. (হে নবী, তুমি বলো,) আমার তো ঊর্ধ্বজগত ও তার বাসিন্দা (ফেরেশতা)-দের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে) বিতর্ক করছিলো। ৭০. (এ তো) আমাকে ওহী করে (জানিয়ে) দেয়া হয়েছে, আমি হচ্ছি (তোমাদের জন্যে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৭১. (স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি। ৭২. যখন আমি তাকে বানিয়ে সম্পূর্ণ সুঠাম করে নেবো এবং ওতে আমার (কাছ থেকে) জীবনের সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হবে। ৭৩. অতপর ফেরেশতারা সবাই (তাকে) সাজদা করলো, ৭৪. একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ৭৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলীস, তোমাকে কোন্ জিনিসটি তাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো– যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি, তুমি কি এমনিই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٢﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٤﴾ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

৭৬. সে বললো (হাঁ), আমি তো তার চাইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে। ৭৭. তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে এখনি বের হয়ে যাও, কেননা তুমি হচ্ছো অভিশপ্ত, ৭৮. তোমার ওপর আমার অভিশাপ থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। ৭৯. সে বললো, (হ্যাঁ আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তবে) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন সব মানুষদের (দ্বিতীয় বার) জীবিত করে তোলা হবে। ৮০. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত, ৮১. অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত (তুমি থাকবে)। ৮২. সে বললো (হ্যাঁ), তোমার ক্ষমতার কসম (করে আমি বলছি), আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো, ৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা তাদের ছাড়া। ৮৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এ হচ্ছে) চূড়ান্ত সত্য, আর আমি এ সত্য কথাটাই বলছি, ৮৫. তোমার ও তোমার অনুসারীদের সবাইকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। ৮৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, না যারা লৌকিকতা করে আমি তাদের দলের লোক! ৮৭. এ (কোরআন) হচ্ছে সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) জন্যে একটি উপদেশ মাত্র। ৮৮. কিছুকাল পর (কেয়ামত সংঘটিত হলে) তোমরা অবশ্যই তার (সত্যতা) সম্পর্কে জানতে পারবে।

তাফসীর

আয়াত ৬৫-৮৮

এ শিক্ষামূলক অধ্যায় পুনরায় সেই বিষয়টি নিয়ে আসছে যা শুরু হয়েছিলো সূরার একেবারে গোড়ার দিকে, আর সে বিষয়গুলো হচ্ছে তাওহীদ, ওহী এবং আখেরাতের ভয়ংকর দিনে নেক প্রতিদান বা শাস্তি দান করা। এ প্রসংগে ওহীর প্রমাণস্বরূপ আদম (আ.)-এর কেসসা পেশ করা হচ্ছে, এটা তো পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে যে, এ জীবন শেষে মহাহিসাব দিবসে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে। এ কাহিনীর সাথে ঘটনাও জড়িত রয়েছে, যার

সম্পর্ক রয়েছে অহংকারী ও অবাধ্য শয়তানের সাথে, যাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে বের করে দেয়া হয়েছিলো এবং আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা হয়েছিলো। যখন সে আদম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ মর্যাদাদানকে একটা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মনে করেছিলো তখনই তাকে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো। এমনি করে সেই দিন থেকেই শয়তান ও আদম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে এক স্থায়ী রেষারেষি ও চিরস্থায়ী সংঘাতের সূত্রপাত হলো। এই শত্রুতা শুরু হলো তো হলোই, আর কোনোদিন এই দুই সৃষ্টির মধ্যে শত্রুতায় ভাটা পড়েনি। এ শত্রুতার মাত্রাও কোন সময়ে কম মনে হয়নি। তখন থেকেই শয়তানের সকল চিন্তা ও চেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে যেন তার ষড়যন্ত্র জালে সে আদম সন্তানদের বেশী বেশী সংখ্যায় আবদ্ধ করতে পারে এবং তাদের নিয়েই সে দোযখে প্রবেশ করতে পারে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদের বাপের সাথে তার শত্রুতা, যার কারণে তাকে চিরদিনের জন্যে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো, কাজেই এই সংঘর্ষের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হতভাগা আদম সন্তানরা শয়তানের এই দুরভিসন্ধি বুঝেও বুঝতে চায় না, তার দ্বারা বার বার ধোঁকা খায় এবং তাদের পুরাতন দুশমনের কাছে নিজেদের সোপর্দ করে দেয়। এই ঘটনার মূল কারণ এবং আলোচ্য মূল বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বদানের সাথেই সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে, এর বাইরে অন্য যেসব জিনিস থেকে সে হঠকারী ও মিথ্যারোপকারীরা উদাসীন হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে–

'বলো, অবশ্যই আমি একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই এবং সকল শক্তির আধার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নিঃশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য নয়, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব কিছুর মালিক। তিনি মহাশক্তিমান, তিনি মহা-ক্ষমাশীল।'

বলে দাও সেই মোশরেকদের, যারা হতভম্ব হয়ে থাকতো, বিস্মিত হয়ে বলতো, 'সে কি সকল উপাস্যকে বাদ দিয়ে একজনকেই মাবুদ বানিয়ে দিয়েছে? এটা তো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়?' বলে দাও ওদের, হ্যাঁ, এটাই আসল সত্য, 'প্রকৃতপক্ষে শক্তি ক্ষমতার মালিক সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।' .... ওদের আরও বলো, অবশ্য তোমার নিজেরও কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই, আর তোমার ওপর এছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই যে, তুমি তাদের আযাবের ভয় দেখাবে এবং সতর্ক করবে, এরপর লোকদের ডাকবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে। তিনি আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সে সবের মালিক, পালনকর্তা ও পরিচালক।'

এ সব ক্ষমতার মধ্যে তাঁর অংশীদার কেউই নেই এবং তাঁর কাছে ছাড়া আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে এবং এ দুই মধ্যবর্তী স্থানে এমন কেউ নেই যার কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে, আর 'একমাত্র তিনিই ক্ষমতাধর'। তিনিই শক্তিমান, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই 'ক্ষমাশীল', তিনি বান্দার ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন এবং প্রকৃত তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন, তিনি তাকে মাফ করে দেন যে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়।

ওদের বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছি এবং যা কিছু ওরা অস্বীকার করছে বা ওরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা ধারণা করছে, তার থেকে তিনি অনেক বড় এবং অনেক মহান। যেসব জিনিসের মধ্যে ওরা আজকে মজে রয়েছে তার বাইরের যে জগত ওদের চোখের আড়ালে রয়েছে, সেসব কিছু থেকে ওরা সম্পূর্ণভাবে গাফেল হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সেসব বিষয়ে ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও ওটা এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ খবর, যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রয়েছো।'

অর্থাৎ, ওদের কাছাকাছি যেসব জিনিস ওরা দেখছে, সেসব কিছু থেকে অনেক বড় জিনিস সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বাণী। এ পবিত্র কালাম হচ্ছে গোটা সৃষ্টির মধ্যে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এর মর্যাদা হচ্ছে গোটা সৃষ্টির চাইতেও বেশী। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে এ বিশ্বের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান এবং যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেসবের চাইতেও এ কেতাব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর প্রেরিত এ মহাবাণী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল বিষয় ও সকল বস্তু থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়– সেসকল জিনিস থেকে দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুও নয়; বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকল জিনিসের সাথে এর অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক রয়েছে। এ পাক কালামে অতীতের অনেক অজানা বিষয় বিবৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দূর ভবিষ্যতের এমন সব খবর দেয়া হয়েছে যা মানুষের বুদ্ধির সীমার বাইরে।

বিজয়ের ঝান্ডা বুলন্দ করার জন্যেই কোরআন এসেছে

মহাবিস্ময়কর সংবাদবাহী এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন এসেছিলো মক্কা নগরীতে অবস্থিত কোরায়শ ও আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিকতা এবং তৎসন্নিহিত ভ্রান্ত মতবাদের ওপর সত্যের বিজয় কেতন উড়ানোর মহান লক্ষ্যে। অতপর এ কেতাবের শক্তিতে যে যে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল মহাসত্যের এই সম্মোহনী বাণী, সে সমস্ত এলাকাতেও সত্যের জয়-ডংকা বেজে ওঠলো। এতো শক্তিশালী এ পাক কালামের আকর্ষণ যে, এর অগ্রযাত্রা স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে জগদ্বাসীকেও বিমোহিত করলো এবং ভবিষ্যতের সকল যামানার সকল দেশেও এ পাক কালামের উপস্থাপিত আদর্শ হতাশাগ্রস্ত মানুষকে পুনরায় আশান্বিত করতে সক্ষম হবে। এরই ফলে দেখা গেছে, যারাই এ পবিত্র কেতাবের রংগে রঞ্জিত হয়েছে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব পৃথিবীর সবখানে সর্বশ্রেণীর মানুষের ওপরেই ছেয়ে গেছে। এ মহাসত্য সমাগত হওয়ার পর মানব নির্মিত সকল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর আল কোরআনের উপস্থাপিত ব্যবস্থা বিজয়ী ও পরিব্যাপ্ত হয়ে ততোদিন পর্যন্ত তার ভূমিকা পালন করলো, যতোদিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাইলেন।

এভাবে এ মহা সংবাদবাহী কেতাব মানব রচিত সকল মত ও পথের গতি পরিবর্তন করে বিশ্ব সম্রাটের প্রদর্শিত পথের সাথে সবাইকে একাত্ম করে দিলো। এ পাক কালাম প্রদর্শিত পথ এতোই মযবুত এবং এতোই আকর্ষণীয় যে, যে এলাকাতেই এর ধারক বাহকরা নিজেদের ব্যবহার ও বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে এর দাওয়াত যথার্থভাবে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানকার অধিবাসীরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এ ব্যবস্থাই মানতে বাধ্য হয়েছে; যারা এর ওপর ঈমান এনেছে তারা তো অন্তর দিয়ে এর আদর্শ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে, তারা এর অপ্রতিরোধ্য গতি ঠেকাতে পারেনি। যেসব এলাকায় আল কোরআনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যে সকল এলাকায় এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, সে সকল অঞ্চলে এ বিজয় যাত্রার সাথে যারা সহযোগিতা করেছে, আর যারা এর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে, তারা সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখে নিয়েছে যে, মানবেতিহাসের কোনো অধ্যায়েই আল কোরআন প্রদর্শিত উন্নত এবং সর্বাংগীণ সুন্দর ব্যবস্থা আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সফল পরিচালনায় আল কোরআন প্রদর্শিত এ বিজয়ী ব্যবস্থা মানুষের অন্তরে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো এবং পৃথিবীর সর্বত্র তার ভিত্তি এমন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলো, যা আরববাসী কোনোদিন কল্পনা করেনি বা এমন অবস্থা তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি।

আল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সেই কঠিন সময়ে আরববাসীরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, এই মহা সংবাদবাহী কেতাব পৃথিবীর চেহারা পরিবর্তন করার মহৎ উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, ইতিহাসের গতি বদলে দেয়ার জন্যে এবং আল্লাহর আইন কানুন তাঁর রাজ্যে ও মানুষের বাস্তব জীবনে চালু করার জন্যে নাযিল হয়েছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টির সকল কিছুর দ্বারপ্রান্তে এ ব্যবস্থার মহিমা পৌঁছে দিতে নাযিল হয়েছে, তাও তারা বুঝতে পারেনি। আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সবের সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে এই ব্যবস্থা সর্বত্র চালু করার এক মহাপরিকল্পনা। কাজেই সে বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেয়ামত পর্যন্ত অবিরামভাবে চলতে থাকবে। মানুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ন ও তাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে এ প্রচেষ্টা দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকের মুসলমানরা আরববাসীদের মতোই সেই শুভ দিনের স্বপ্ন দেখছে। যদিও পৃথিবীতে অতীত কালের কোনো অধ্যায়ে বা ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কোনোদিনই কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। তবুও তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একদিন সেই স্বর্ণালী জীবন ব্যবস্থা তেমনি করে চালু হবে যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে চালু হয়েছিলো। তারা এ পাক কালামের বিরোধীদের মতো হতাশাবাদী নয় এবং কখনও এ জীবন ব্যবস্থাকে ছোট করেও দেখে না। অবশ্য মুসলমানরা তাদের এই বিপ্লবাত্মক অবস্থা নিকট অতীতে বা বর্তমানে দেখেনি, তাই ভবিষ্যতে এর রূপরেখা ঠিক কেমন হবে তা তারা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না, তবে এ কাজ যে শেষ যামানা পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে– একথা তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানার প্রথম দিকে আরবরা মনে করতো, তাঁর আনীত এ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ তাঁর কাছে এ মহাগ্রন্থ যখন নাযিল হয়েছে তখন তার একটা তাৎপর্য অবশ্যই আছে। তারা এইভাবে একটা সীমার মধ্যেই বিষয়টিকে চিন্তা করতো, কিন্তু তারা যা ভেবেছিলো পরবর্তীকালে আল কোরআন তাদের দৃষ্টিতে এই প্রসার এনে দিয়েছিলো যে, আল কোরআনের প্রভাববলয় থেকে আরও অনেক অনেক বেশী প্রশস্ত হয়ে পড়লো। এর ক্ষেত্র শুধু আরব জগত এবং মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স.) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মোহাম্মদ (স.) তো মাত্র এই মহাগ্রন্থের বহনকারী ও পৌঁছে দেয়ার মালিক। তিনি নিজে এই মহাগ্রন্থের উদ্ভাবক নন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শিক্ষা না দিলে এর মধ্যে উল্লেখিত কথার সাধারণ অর্থের বাইরে কোনো অর্থ তাঁর পক্ষেও বুঝা সম্ভব ছিলো না। আর শুরু থেকে উর্ধ্বাকাশের কোথায় কি আছে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে না জানালে তাও তার পক্ষে বুঝা সম্ভব ছিলো না। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন ওরা আমার সাথে নানা প্রকার বাদানুবাদে লিপ্ত হলো তখন উর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে আমার তো জ্ঞান ছিলো না, তাই ওহীর মাধ্যমে আমাকে তো শুধু এতোটুকু বলতে বলা হয়েছে যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

মানব সৃষ্টির আদি কাহিনী

এখানে মানব জাতির সৃষ্টির কাহিনী পেশ করা হয়েছে। সৃষ্টির শুরুতে উর্ধ্বলোকে মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা নিয়ে আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদের যে আলোচনা হয়েছিলো, সেই সম্পর্কে কিছু কথা এ প্রসংগে জানানো হয়েছে। এ আলোচনায় পৃথিবীর জীবনে মানব জাতির সফরের রূপরেখা চিহ্নিত করা হয়েছে, আল্লাহর নযরে তাদের মর্যাদার কথা এবং পরিশেষে তারা কোথায়

ফিরে যাবে এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের কর্তব্য সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। সময় থাকতেই তাদের সতর্ক হয়ে চলার শিক্ষা দান করার জন্যে শেষ যামানায় মোহাম্মদ (স.)-কে পাঠানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি কাদামাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করতে চাই, অতপর যখন তার গঠন কাজ সম্পন্ন করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু অংশ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার সামনে (শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে) সাজদাবনত হয়ে পড়বে।'

আমরা একথা জানি না আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেমন করে বলেছিলেন অথবা কেমন করে তিনি ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, আর ফেরেশতারাই বা আল্লাহর সাথে কিভাবে সাক্ষাত করে। ফেরেশতাদের প্রকৃতি কেমন তাও আমরা জানি না। আল্লাহর কিতাবে তাদের যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে– ব্যস শুধু ততোটুকুই আমরা জানি। আর সত্যিকারে বলতে কি, তাদের সম্পর্কে আর অধিক জানার বা চিন্তা করার তেমন প্রয়োজনই বা আমাদের কি আছে। এই চিন্তার কোনো কূল কিনারাও আমরা কোনোদিন পাবো না। আল কোরআন তাদের সম্পর্কে আমাদের যেটুকু জানিয়েছে, আমরা সেটুকু মাত্র জানি এবং ততোটুকুর ওপরই আমরা তৃপ্ত থাকি।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, যেমন করে এই সৃষ্টিকুলের অন্য সবাইকেও তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মাটির দ্বারাই সকল বস্তু ও সকল উপাদানের অস্তিত্ব এসেছে, আর এসবের মধ্যেই রয়েছে জীবনের সে সকল রহস্য, যা কেউ জানে না। কেউ বলতে পারে না কেমন করে এগুলো এলো এবং কোত্থেকে এলো। এই মাটি থেকে যে মানুষকে সৃষ্টি করার উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে, তাও একটি বড় রহস্য। লক্ষণীয় বিষয়, মর্যাদাপূর্ণ রূহ ফুঁক দিয়ে মাটির দেহে প্রবেশ করানোর পর সেই নির্জীব কাঠামোটি কিভাবে মানুষে পরিণত হয়ে গেলো। এই মানুষের দেহের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ তো মাটির তৈরী। পরবর্তীতে সে শরীর পৃথিবীর পানি থেকেই এসেছে। ফলে তার অংগ প্রত্যংগ সে পানির দ্বারাও নির্মিত, কিন্তু আল্লাহর রহমতের দান অজানা, সেই রহস্যপূর্ণ আত্মা বা রূহ দেহ থেকে সরে গেলে সে দেহ আর মানুষ থাকে না, মানুষ বলে তাকে ডাকা যায় না এবং মানুষের কোনো গুণাবলীও তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের অস্তিত্বের জন্যে যেমন সেই কায়াটি প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ওই অজানা অচেনা ও অদৃশ্য রহস্যঘেরা রূহ, যা মানুষকে মানুষের নাম দিয়েছে। এই ফুঁক দেয়ার তাৎপর্য যে কি তা আমরা জানি না, বুঝি না এবং বুঝতে চাইলেও কিছুতেই তা আমরা অনুধাবন করতে পারি না; তবে শূন্য সেই দেহ অবয়বের মধ্যে রূহ থাকলে তার নড়াচড়া ও দেহাভ্যন্তরের সকল কলকব্জার কর্মক্ষমতা প্রত্যক্ষ করি। এ জন্যে বলা হয়, রূহ না দেখতে পেলেও তার কার্যকারিতা বা প্রভাব আমরা অনুভব করি। এই কার্যকারিতা বা তার অস্তিত্বের লক্ষণ মানুষকে অন্য সব কিছু থেকে পৃথক করে এবং পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। বুদ্ধি বিবেক ও আত্মার প্রভাবে অন্য সব কিছু নিয়ে সে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়। এই রূহই এমন এক শক্তি যা তাকে অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণের যোগ্যতা দান করে। শুধু তাই নয়, এই রূহই তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধি বিবেক ও অনুভূতি শক্তির উর্ধ্বের আরও অনেক কিছু আঁচ করার যোগ্যতা দান করে, যার ফলে সে পেছনের অনেক কিছু দেখতে পায় এবং অনুভব করতে পারে।

এভাবে মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও আত্মার উন্নতি রূপ যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই তাকে অন্য সব কিছু থেকে স্বাতন্ত্র্য দেয় এবং তাকে এতো বেশী বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বানায়, যার শামিল দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু বা প্রাণী হতে পারে না। মানব সৃষ্টির লগ্ন থেকে আরও অনেক প্রকার প্রাণী তার সাথে বসবাস করে আসছে, কিন্তু অন্য কোনো প্রকার বা শ্রেণীর প্রাণীর স্বভাব প্রকৃতি বা কার্যকলাপের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো উন্নতি হয়েছে বলে ইতিহাস আমাদের জানায়নি। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এতো দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে, কিন্তু এ সমগ্র সময়কালের মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো একটি প্রাণীর আকার আকৃতি বা স্বভাব প্রকৃতি বা তাদের কার্যপ্রণালীর সামান্যতম কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলেও জানা যায় না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফুঁক দানের মাধ্যমে একমাত্র মানুষকেই তাঁর রূহ থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন কারণ পৃথিবীতে তাকে তাঁর খলীফা বানানোর পরিকল্পনার মধ্যেই তাঁর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। একমাত্র তাকেই তিনি পৃথিবী নামক এই গ্রহের মধ্যে তাঁর খলীফা হিসাবে বাস করার যোগ্যতা দিতে চেয়েছেন। তাঁর খলীফা হিসাবে তাঁরই নির্ধারিত এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত অপরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা, নতুন নতুন বস্তু ও সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে তোলার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে যোগ্যতা, শক্তি ক্ষমতা সবই তিনি তাকে দিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের প্রকৃতির মধ্যে জানবার বুঝবার এবং বিশ্বভুবনে কোথায় কি আছে তা আবিষ্কার করার প্রচুর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা দিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম রূহ ফুঁকে দেয়ার দিন থেকেই মানব দেহের মধ্যে এসব যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটতে শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ওই যোগ্যতা আসছিলো সকল শক্তি ক্ষমতার উৎসমূল স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকেই। সুতরাং যখন কোনো মানুষ যোগ্যতার সেই মহান উৎসমূল থেকে দূরে সরে যায় তখন সে তার জ্ঞানের চোখ হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে সৃষ্টি রহস্য জানা ও বুঝার যোগ্যতা। তখন তার গোটা অস্তিত্ব ও তার জীবন এলোমেলো হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তার সকল প্রকার ভারসাম্য তখন সম্মুখপানে যতোই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন সে আরও পিছিয়ে যায়। জীবনের পরস্পর বিরোধী গতি তার মনোযোগ বিশৃংখল করে দেয়। সে অবস্থায় তার জ্ঞান, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যতো বেশীই থাকুক না কেন তা কোনো কাজে লাগে না এবং সে অবস্থায় তার মধ্যে অবস্থিত বৈশিষ্ট্যসমূহ একেবারে খতম হয়ে না গেলেও প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের বাঞ্ছিত অগ্রগতি ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

অতীতের ইতিহাস সামনে রাখলে আমরা দেখতে পাবো, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বুকে মানুষের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, গড়ে ওঠেছে অনেক নগর ও সভ্যতা। এমন এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে যা জ্ঞান বিজ্ঞানের আজকের এই চরম উন্নতির যুগের মানুষের জন্যেও এক মহা বিস্ময়, তা সত্তেও সেসব কিছু নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো তাদের ভূমিকা পালন করে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে গেছে এবং এইভাবে এই সত্য কথাটি প্রমাণীত করেছে যে, মানুষের উদ্ভাবিত সকল পদ্ধতি ও সকল অগ্রগতির একটি সীমা আছে, আছে মানুষের শক্তি ও যোগ্যতার একটি পরিমাপ, যা এক পর্যায়ে থেমে যায় এবং যা এক বিশেষ সময় পর্যন্তই ব্যবহার করা যায়। তারা জানতে চায় অনেক, কিন্তু সে জানারও একটা সীমা আছে, ইচ্ছা করলেই যতো খুশী ততো জ্ঞান লাভ করা যায় না, আর যা কিছু জ্ঞান অর্জন করা হয় তা সবই মনে রাখা যায় না, বা ইচ্ছা করলেই তার পুরোপুরি ব্যবহারও করা যায় না। ততোটুকুই ব্যবহার করা যায়, যা পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে মনযুর করেন।

আমাদের সকল উৎকর্ষ সাধনের পেছনে যদি আল্লাহর মেহেরবানী না থাকতো, তাহলে কে আমাদের পরিচালনা করতো? কে আমাদের কঠিন দিনে সাহায্য করতো, কারো আছে কি এমন ক্ষমতা যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে? সারা বিশ্বের তুলনায় মানুষ কত ছোট, কত তুচ্ছ এবং কত হীনবল। সে সৃষ্টির বুকে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা এই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে এক তুচ্ছ এক প্রাণী হিসাবে বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, একবার ভেবে দেখুন মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র, যা অন্য যে কোনো এক তারকার ন্যায় এক বিশেষ নিয়মের অধীনে চলছে, চলছে এক অদেখা ক্ষমতাধরের পরিচালনায়। এই তারকারাজির সংখ্যাই বা কত? মহাশূন্যে অবস্থিত কত কোটি কোটি তারকা বর্তমান রয়েছে তার কোনো সীমা সংখ্যা জানা মানুষের জন্যে অসম্ভব। কেউ কোনোদিন এদের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারেনি, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ কোনোদিন তা জানতেও পারবে না। এখন আমাদের কাছে অবশ্যই এটা একটা অবোধ্য ব্যাপার যে, যে মানুষের নিজের কোনো ক্ষমতা নেই সে মানুষকে শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে কেন মহাদয়াময় আল্লাহর ফেরেশতাদের সাজদা করতে বলা হলো? এর একটা জওয়াবই খুঁজে পাওয়া যায়, আর তা হচ্ছে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'অবশ্য আমি মহান আল্লাহ, বনী আদমকে সম্মানিত করেছি।'

অর্থাৎ সারা জগতের সকল প্রাণী ও সকল বস্তুজগতের ওপর তাকে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা, সম্মানিত করেছি। ফেরেশতাদের ইচ্ছাশক্তি, পরিচালনার স্বাধীনতা না দেয়ায় তারা আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য। জ্বিনদের ভালো মন্দ বুঝার শক্তি দেয়ার সাথে সাথে তাদের ইচ্ছাশক্তি খাটানোর অধিকারও দেয়া হয়েছে। ইবলীস জ্বিনদের সমগোত্রীয় হওয়া সত্তেও সে ততোদিন স্বেচ্ছায় আনুগত্য করেছিলো যতোদিন সে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। তারপর যখনই আল্লাহ তায়ালা সবার থেকে অধিক মর্যাদা দান করার উদ্দেশ্যে আদমকে সাজদা করার জন্যে উপস্থিত সকল ফেরেশতাদের প্রতি সরাসরি নির্দেশ দিলেন, তখন পরোক্ষভাবে নির্দেশটি আগুনের তৈরী জ্বিন ইবলীসের ওপরও বর্তায় এবং স্বাধীনতা থাকা সত্তেও সে নিজেকে ফেরেশতাদের মতোই আজ্ঞাবহ দাস মনে করতো বলে সে 'এ নির্দেশ কেবল ফেরেশতাদের প্রতি-তার প্রতি নয়'—এ কথা বলেনি।

একমাত্র মানুষই ইচ্ছাশক্তিতে স্বাধীনতা থাকা সত্তেও যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তখন আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা গেলো, আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বাধা বিঘ্ন কঠিন অবস্থা যাইই আসুক না কেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর ওপর ভরসা রেখে যে সকল ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে, একমাত্র সে-ই মহাসম্মানের অধিকারী হয় যা আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাকে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু যখন এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আনুগত্য করতে মানুষ পিছপা হয়ে গেছে, তখনই রূহের দাবী উপেক্ষা করে সে তার তুচ্ছ গঠন উপাদান মাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ তখনই সে তুচ্ছ ও হীন মাটির পিন্ডে পরিণত হয়ে গেছে?

আদমকে সাজদা করার জন্যে যখনই ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম এল, তখন তাদের প্রকৃতির দাবী অনুসারে আল্লাহর সে হুকুম তারা যথাযথভাবে পালন করলো এবং তখনই তারা সাজদায় পড়ে গেলো। যার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে,

'ফেরেশতাদের সকলেই এবং সবাই (এক সাথে) সাজদা করলো।'

প্রশ্ন জাগে, কেমন করে সাজদা করলো, কোথায় সাজদা করলো এবং কখন সাজদা করলো? এসব প্রশ্নের জওয়াব আমরা জানি না, এগুলো সবই রহস্যের আড়ালে ঢাকা, আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আদম সৃষ্টির কাহিনীর অবতারণা হয়েছে যে উদ্দেশ্যে, তার সাথে এসব রহস্যর সম্পর্ক গৌণ বিধায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ বিষয়ে কিছুই জানাননি। ওপরে বর্ণিত আয়াতে এসব ঘটনা উল্লেখের মূল উদ্দেশ্য যা প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে, মাটি দিয়ে তৈরী মানুষের মর্যাদা তখনই শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হয়েছে যখন তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখনই মানুষ তার রূহের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে নিজ কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছে তখনই সে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে এবং এভাবে তার মালিকের কাছে সে বাঞ্ছিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে চিন্তা করে দেখার বিষয়, কেন ফেরেশতাদের আদমের সামনে সাজদাবনত হতে বলা হলো এবং কেনই বা তারা সাজদা করলেন। আসলে এই সাজদার তাৎপর্য হচ্ছে, আনুগত্যবোধে আল্লাহর হুকুম পালন এবং যা তাঁরা দেখলেন তাতে আল্লাহর হেকমত (হুকুমের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা) তারা অনুধাবন করলেন।

ব্যতিক্রম হলো ইবলীস, সে বড়াই করলো এবং অস্বীকার করে (কাফের) দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। এখন স্বভাবতই আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে, 'ইবলীস কি তাহলে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো?' সাধারণভাবে আমরা জানি সে ফেরেশতাদের মধ্যকার কেউ নয়। কেননা যদি সে ফেরেশতাদের গোত্রীয় কোন ব্যক্তি হতো তাহলে সে আল্লাহর হুকুম কিছুতেই অমান্য করতো না। ফেরেশতাদের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের যে হুকুম দেন তারা তা অমান্য করে না, করতে পারে না। যেহেতু অমান্য করার কোনো ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয়নি, তারা তো তাই করে যা করার জন্যে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

সত্য কথা হচ্ছে এই যে, ইবলীস হচ্ছে আগুনের সৃষ্টি, আর হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, ফেরেশতাদের সৃষ্টি নূর (স্নিগ্ধ আলো) থেকে, কিন্তু সে ফেরেশতাদের সাথে ছিলো এবং (তাদের দলের সাথে মিশে থাকার কারণে) তার প্রতিও সাজদার হুকুম দেয়া ছিলো। তাকে বিশেষভাবে নাম নিয়ে সাজদা করতে এই জন্যে বলা হয়নি যে, তাতে পরীক্ষা ছাড়াই তার অবমাননা করা হতো। অবশ্য পরবর্তীতে নাফরমানীর কারণে তার অবমাননাকর স্বভাবের কথা বুঝা গেলো। সাজদা না করায় পরবর্তীতে তার প্রতি যে ধমক আসল তাতে আমরা জানতে পেরেছি, তার প্রতিও সাজদা করার হুকুম ছিলো। এই ধমকে বলা হয়েছে, হে ইবলীস, 'নিজ হাতে যাকে আমি সৃষ্টি করলাম তাকে সাজদা করার ব্যাপারে তোমাকে কোন জিনিস বাধা দিলো? তুমি বড়াই করলে, না তুমিই একজন খুব সম্মানী ব্যক্তি হয়ে গেলে?

অর্থাৎ, কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিলো সেই ব্যক্তিকে সেজদা না করতে যাকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি? আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার নিশ্চয় কোনো গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রূহের কিছু অংশ ফুঁকে দিয়ে যে মানুষকে অস্তিত্বে আনলেন, নিশ্চয়ই তার দ্বারা তিনি গোটা সৃষ্টির প্রতি এক বিশেষ রহমত বর্ষণ করতে চেয়েছেন। ইবলীসের কাছে তাঁর এই যে জিজ্ঞাসা, আমার হুকুম পালন করা থেকে 'তুমি কি তাকাব্বুর করলে? না, তুমি হয়ে গেলে মহাসম্মানী কোনো ব্যক্তি?' অর্থাৎ তুমি কি এতো বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গেলে যে নত হতে পারে না?

জওয়াব এলো, আমি তো ওর থেকে ভালো। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন দ্বারা আর ওকে সৃষ্টি করেছো কাদা মাটি দিয়ে।'

আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে গিয়ে এ কথা বলায় ইবলীসের পক্ষ থেকে প্রচন্ড এক হিংসা প্রকাশ পেলো। তার মনে আদমের প্রতি চরম ঘৃণা অবহেলা পয়দা হলো, অথবা সে আদম নামক সে ব্যক্তিত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতা দেখালো যাকে আল্লাহ তায়ালা কাদা দিয়ে পয়দা করা সত্তেও মর্যাদা দিলেন। অবশ্যই আদম এই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু (অহংকারের কারণে) তার কাছ থেকে এই মন্দ জওয়াব এলো যার মধ্যে সত্য সঠিক ও সুন্দর বিষয় গ্রহণ করার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে।

এর ফলে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনর পক্ষ থেকে সে অহংকারী ব্যক্তিকে বিতাড়িত করার নির্দেশ জারি হয়ে গেলো,

তিনি বললেন, 'বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে, অবশ্যই তুমি বিতাড়িত ব্যক্তি এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা জেনে নাও যে, কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর আমার লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হতে থাকবে।'

এখন 'মিনহা' শব্দটির মধ্যে 'হা' দ্বারা যে জায়গা বুঝানো হয়েছে আমরা (আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী) তার অর্থ সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারি না। এর দ্বারা কি জান্নাত বুঝানো হয়েছে না এর দ্বারা আল্লাহর রহমতের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে?.......... এ দুটো অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে– এতে বড় রকমের কোনো বিতর্ক বা জটিলতা অনুভব করার কোনো কারণ নেই। এখানে মূল কথা হচ্ছে, ইবলীসের অহংকারের কারণে তাকে অভিশাপ দেয়া ও বিতাড়নের মাধ্যমে শাস্তি দান করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণে তাকে চিরদিনের জন্যে তাঁর রহমতের দৃষ্টি থেকে দূরে নিক্ষেপ করা।

আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যাওয়ার পর তার হিংসা চরম ঘৃণা ও ক্রোধে পরিণত হলো এবং তার মধ্যে প্রতিশোধ নেয়ার উদগ্র এক বাসনা জন্ম নিলো। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার রব, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে (বেঁচে থাকার) সময় বা সুযোগ দাও।' সে যে কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো তার এই দোয়া কবুল করা এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ দানের ফয়সালা গ্রহণ ছিলো আল্লাহর মহা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে এক হেকমত। তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সুযোগ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হলো।'

এবার শয়তান তার রাগ ও ঘৃণা চরিতার্থ করার জন্যে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললো।

'সে বললো, ঠিক আছে, তোমার ইযযতের কসম খেয়ে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো, তবে যারা তোমার খাঁটি বান্দা হবে তাদের বাদে।'

এভাবে শয়তান তার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি শাণিত করলো। লক্ষণীয় যে, কেমন করে এই শয়তান আল্লাহর ইযযতের কসম খেয়ে সকল আদম সন্তানকে গোমরাহ করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে। শুধুমাত্র তারাই তার চক্রান্ত জাল থেকে রেহাই পাবে যাদের ওপর তার কোনো ক্ষমতা খাটবে না। তাদের সে করুণা করে রেয়াত দেবে তা নয়, বরং যেহেতু তার ক্ষমতা সেখানে চলবে না, এজন্যে তাদের থেকে সে সরে আসবে। এভাবে তার ও তার ষড়যন্ত্র জাল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে যে বস্তু ঢাল হয়ে দাঁড়ায় তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সেই রক্ষাকারী ঢাল যা উভয় পক্ষের মধ্যে

দাঁড়িয়ে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে তা হচ্ছে আল্লাহর নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। এটাই মুক্তির একমাত্র বন্ধন– এটাই সফল জীবন ধরে রাখার অভংগুর রশি। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও তাঁর সিদ্ধান্তক্রমে শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হিসাবে এই পদ্ধতিই স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর পদ্ধতি ও পথ বলে দিয়েছেন, তিনি বলছেন, হক বা সত্য কথা এটাই, আর এই সঠিক কথাটাই আমি বলছি, 'তোমার ও তোমার অনুসরণ যারা করবে, সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম ভরে দেবো।'

অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা সদা-সর্বদাই সত্য সঠিক কথা বলেন। আল কোরআন এই কথাকেই মযবুত বানাচ্ছে এবং এ সূরাটির মধ্যে গুরুত্বসহকারে এই কথাটির দিকে নানাভাবে ও নানা প্রসংগে ইংগিত দিচ্ছে। এরই আরেকটি ঘটনা হচ্ছে দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনা। এতে বিবদমান ব্যক্তিরা দাউদ (আ.)-এর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট খাস কামরায় কেমনভাবে (দেওয়াল পার হয়ে) প্রবেশ করলো। তারা বললো,

'আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন, দেখবেন বিচার যেন সঠিক হয় এবং আপনার ফয়সালা কোনো প্রকার পক্ষপাতদুষ্ট যেন না হয়' .... আল্লাহ তায়ালাও তাঁর (নেক) বান্দা দাউদ (আ.)-কে ডাক দিয়ে বলছেন, 'হাঁ তুমি মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার ফয়সালা করবে এবং কোনো সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে সাবধান, যেন কোনো কু-প্রবৃত্তির তাড়নে না পড়ে যাও।' এরপরই আল্লাহ রব্বুল আলামীন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সেই দিকে ইশারা করে বলছেন, 'আমি, মহান আল্লাহ, আকাশ পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সেগুলোকে বেকার (অর্থহীন) অবস্থায় পয়দা করিনি।' কাফেররা তো মনে করে এগুলো পয়দা করার পেছনে তেমন কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই– আসলে এটা কাফেরদের একটা নিছক ধারণামাত্র। তারপর সত্য সঠিক আল্লাহর সঠিক বর্ণনা আসছে সর্বশক্তিমান আল্লাহরই যবানীতে, তিনি বলছেন, 'এটাই চূড়ান্ত সত্য কথা এবং প্রকৃত সত্য কথাই আমি বলছি। ....'

অর্থাৎ, তিনিই সত্য, যাঁর বর্ণনা বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্নভাবে এসেছে, তার প্রকৃতি এবং তাঁর জ্ঞানের কথা শাণিত করে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর পক্ষ থেকেই এই সত্য ওয়াদা আসছে, 'অবশ্যই আমি জাহান্নামকে তোমার দ্বারা এবং তোমার যারা অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা ভরে দেবো।'

এই হচ্ছে সেই সংঘর্ষ যা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই শয়তান ও আদম সন্তানদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আদম সন্তানরা এ বিষয়ে সেই সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই চিন্তা করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে তাই দান করেছেন। তারা কর্তব্যবোধেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কেতাব থেকে শিক্ষা নেয়ার সাথে সাথে নবী রসূলদের জীবনী ও কর্মধারা স্বেচ্ছায় এবং ভক্তিভরে অনুসরণ করে। আল্লাহর রহমতের দাবীও হচ্ছে এই। তারা যেন ভুলেও নবী রসূলদের শিক্ষা পরিত্যাগ না করে বা কখনও তা থেকে গাফেল না হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা এ অধ্যায়ের শেষে এবং সূরাটির পরিসমাপ্তিতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে দায়িত্ব দিচ্ছেন তিনি যেন তাদের এই প্রসংগের শেষ কথাটি জানিয়ে দেন,

'বলো (হে রসূল), আমি তোমাদের এ (কাজের) জন্যে কোনো প্রতিদান চাই না, না আমি কোনো কৃত্রিম লৌকিকতাকারী। এ কিতাব তো সারাবিশ্বের জন্যে এক স্মরণিকা, আর এর (মধ্যে প্রদত্ত) খবর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সময় পর তোমরা জানতে পারবে।'

অবশ্যই এ (কেতাব) নাজাত হাসিল করার জন্যে এক খাঁটি ও নির্ভেজাল দাওয়াত (আহ্বানকারী গ্রন্থ)। মানুষের শেষ পরিণতি ও প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে খবর পৌঁছানো এবং শেষ বিচারের বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে সতর্ক করার সাথে সাথে এ কেতাব মানুষকে সার্বিক কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে এক উপদেশদাতা হিসেবে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। এমন এক ব্যক্তির যবানীতে এ দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে, যিনি কোনো পারিশ্রমিক বা প্রতিদান চান না এবং এ দাওয়াত মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির কাছে যুক্তিপূর্ণ ও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। দাওয়াতের এ কেতাব যেন নিজেই কথা বলে, যখন তেলাওয়াত করা হয় তখন এর হৃদয়গ্রাহী যুক্তি ও মিষ্টি মধুর কথামালা শ্রোতার অজান্তেই তার হৃদয়ের মধ্যে দাগ কাটতে থাকে। এ কালাম কথা বলতে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতা করে না, যা বলতে চায় তা সরাসরিই বলে, আর মানুষের স্বভাব প্রকৃতির দাবী পূরণ করতে গিয়ে ওহীস্বরূপ যা কিছুই নাযিল হয়েছে তাই বলে। এ কেতাব এসেছে সারাবিশ্বের সকল মানুষের জন্যে উপদেশবাণী হিসাবে, তবু মানুষ এ বাণী ভুলে যায়, এ কিতাব থেকে তারা বে-পরওয়া হয়ে যায়। অবশ্যই এ কেতাব এক মহাখবর, যার দিকে লক্ষ্য করাটা এখন আর দরকার মনে করা হচ্ছে না, তবে এটা সত্য যে, এর মাধ্যমে যে মহা খবর এসেছে তা এক নির্দিষ্ট সময় পরই মানুষ জানবে। এ মহাসংবাদ পৃথিবীর যিন্দেগীতেই মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হবে, যেমন এর অবতরণকালে যারা এর সামনে ছিলো তাদের জীবনে কয়েক বছরের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। আল কিতাবের এ খবর অবশ্যই এক সময়ে বাস্তবায়িত হবে। যেদিন আল্লাহর নিশ্চিত ওয়াদা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে, 'অবশ্য আমি ভরে ফেলবো জাহান্নামকে তোমার দ্বারা এবং যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা।'

সূরাটির পরিসমাপ্তিতে যে আলোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে এর শুরুতে আলোচিত বিষয়ের পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। সমাজের গভীরে যে ব্যাধি প্রোথিত রয়েছে তার ওষুধ হিসাবে এ মহা কেতাবের আগমন। যে অবস্থা অবশ্যই একদিন সামনে আসবে, যার প্রেক্ষাপটে এ কিতাব নাযিল হয়েছিলো, নাযিল হয়েছিলো আত্মবিস্মৃত জনগণকে সতর্ক করার জন্যে। এরশাদ হচ্ছে,

'জানবে তোমরা এক নির্দিষ্ট সময় পরে।'

সূরা আঝ ঝুমার

আয়াত ৭৫ রুকু ৮

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۚ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. এ (মহা-) গ্রন্থ (আল কোরআন)— পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই (এর) অবতরণ। ২. আমি এ (কেতাব) তোমার কাছে যথার্থভাবেই নাযিল করেছি, অতএব নিষ্ঠাবান হয়ে তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো; ৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ এবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নিবেদিত হওয়া উচিত); যারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়; কিন্তু তারা যে (সব) বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ। ৪. আল্লাহ তায়ালা যদি সন্তান গ্রহণ করতেই চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই বাছাই করতে পারতেন, তাঁর সত্তা অনেক পবিত্র; তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী। ৫. তিনি আসমান ও যমীন সুপরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও

عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝ إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۗ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

চন্দ্রকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল। ৬. তিনি তোমাদের সবাইকে (আদমের) একই সত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি সেই (সত্তা) থেকে তার যুগল বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার পশু (-এর বিধান) অবতীর্ণ করেছেন; তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন– তিনটি অন্ধকারে একের পর এক (অবয়ব দিয়ে গেছেন); এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের মালিক, তাঁর জন্যেই সার্বভৌমত্ব, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারপরও (মূল বিষয়) থেকে তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে? ৭. (হে মানুষ,) তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার কুফরী করো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের বান্দার এ না-শোকরী (আচরণ) কখনো পছন্দ করেন না, তোমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন; (কেয়ামতে) কেউই কারো (গুনাহের) ভার ওঠাবে না: অতপর তোমাদের তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেদিন তিনি তোমাদের (বিস্তারিত) বলে দেবেন তোমরা কি করতে; তিনি নিশ্চয়ই জানেন যা কিছু অন্তরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটা বলতে গেলে পুরোপুরিই তাওহীদের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সমগ্র সূরা জুড়েই বার বার এ বিষয়টি মানুষের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই আলোচ্য বিষয়। যেটুকু বিভিন্নতা, তা কেবল বর্ণনাভংগিতে, বিষয়বস্তুতে নয়।

সূরার শুরু থেকেই এই একই বিষয় গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে! বলা হয়েছে, 'এটা মহাবিজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কেতাব। আমি তোমার কাছে ন্যায়সংগতভাবেই কেতাবখানা নাযেল করেছি। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাত করো।'

এ ধরনের বক্তব্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, 'তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর

এবাদাত করি......।' (আয়াত ১১-১৫) অথবা, 'বলো, ওহে অজ্ঞ লোকেরা, তোমরা কি আমাকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করার আদেশ দিচ্ছ?' (আয়াত ৬৪-৬৬) আর পরোক্ষভাবে যেমন 'আল্লাহ তায়ালা এক ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন........।' (আয়াত ২৯) অথবা, 'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?' ...(আয়াত ৩৬) তাওহীদের বিষয়টা ছাড়াও এ সূরায় আমরা মহান আল্লাহর এমন কিছু বাণীও পাই, যা মানুষের মনমগযে চেতনা ও জাগরণের সঞ্চার করতে চায়, তার উদ্দীপনা ও প্রেরণা বৃদ্ধি করতে চায় এবং ঐশী আদেশ গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তীব্রতর করতে চায়। যেমন (আয়াত ১৭, ১৮, ২৩ ও ৮)। এ সূরার আরো একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আখেরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। পাঠকের বেশীর ভাগ সময় আখেরাতের স্মরণেই কেটে যায়। এ বিষয়টা এ সূরায় বার বার আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টভাবে হোক অথবা আভাসে ইংগিতে হোক, খুব ঘন ঘন কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক জায়গায় কেয়ামত ও আখেরাতের বিশদ বিবরণ এসেছে। তাছাড়া নিম্নের আয়াতগুলোতে সংক্ষিপ্ত বিবরণও লক্ষণীয় (আয়াত ৯, ১৩, ১৯, ২৩, ২৬, ৩২, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮)।

অন্যান্য মক্কী সূরায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তুলে ধরার মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী করার প্রচেষ্টা নানা ভংগিতে ও বিপুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এ সূরায় তার উপস্থিতি খুবই কম।

সূরার প্রথম দিকে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে (আয়াত ৫০)। অন্যান্য আয়াতে আর একটা দৃশ্য তুলে ধরে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন ইংগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরায় মানবজীবনের বিভিন্ন বাস্তব দিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বক্তব্য রাখা হয়েছে।

সূরার শুরুতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে। ৮ নং আয়াতে সুখে দুঃখে মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণানা করা হয়েছে। ৪৯ নং আয়াতেও এ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ৪১ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, নিদ্রিত অথবা জাগ্রত উভয় অবস্থায় মানুষের প্রাণ আল্লাহর মুঠোর মধ্যে থাকে। আখেরাত সংক্রান্ত বক্তব্যও বিস্তৃত রয়েছে সমগ্র সূরা জুড়েই। এমনকি সূরার শেষ আয়তটাতেও কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে; 'তুমি ফেরেশতাদের দেখবে আরশ বেষ্টন করে রেখেছে..........।'

সূরার সামগ্রিক পরিবেশ ও এর বিভিন্ন মর্মস্পর্শী আলোচনার সাথে এ দৃশ্যটার মিল রয়েছে। কেননা সূরার সামগ্রিক পরিবেশটায় আখেরাত সংক্রান্ত ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র সূরায় আমরা এমন সব দৃশ্যের সাক্ষাত পাই যা মানুষের মনকে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত করে। যেমন এক আয়াতে এমন একজন এবাদাতকারীর দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যে, আখেরাতের ভয়ে এবং আল্লাহর রহমতের আশায় দাঁড়িয়ে ও সাজদা করে রাত কাটিয়ে দেয়। আর এক আয়াতে আল্লাহর সেই সব বান্দার দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যাদের চামড়া কোরআন শুনে শিউরে ওঠে, আবার তা নরম হয়ে যায় এবং তাদের মন আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হয়। কয়েকটা আয়াতে বিশেষভাবে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, যেমন (আয়াত ১০, ১৩ ও ১৬)। কেয়ামত ও তার ভয়ভীতি এবং বিনয় ও আনুগত্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে।

সূরাটা ছোট ছোট বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং সবগুলো অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাওহীদ ও আখেরাত। প্রায় প্রতিটা অংশই কেয়ামতের কোনো না কোনো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। শীঘ্রই এই অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে দেয়ার চেষ্টা করবো। কেননা এ সূরাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। এর আয়াতগুলোর প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাকার। সমষ্টির বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ।

তাফসীর

আয়াত ১-৭

এ কেতাব নাযিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। (আয়াত ১-৩)

এই চূড়ান্ত বক্তব্য দিয়ে সূরাটা শুরু হয়েছে।

'আল-আযীয'- মহাপরাক্রমশালী'। অর্থাৎ এত ক্ষমতাধর যে, কেতাব নাযিল করার ক্ষমতা রাখেন। আল-হাকীম-প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি এত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী যে, কোন উদ্দেশ্যে ও কোন বক্তব্য দিয়ে এ কিতাব নাযিল করেছেন তা তিনিই জানেন। আর বিচক্ষণতার সাথে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহকারে ও সুকৌশলে এই কেতাব নাযিল করার কাজটা তিনিই সম্পন্ন করেন।

আয়াতে এ বিষয়টা অর্থাৎ কোরআন নাযিল করার বিষয়ের আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করা হয়নি। কেননা এটাকে সেই আসল বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার আলোচনায় বলতে গেলে সমগ্র সূরাটাই নিবেদিত এবং যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এই কেতাব নাযিল হয়েছে। সে বিষয়টা হলো আল্লাহর একত্ব, আল্লাহর এবাদাতের একনিষ্ঠতা, তাঁর ঐকান্তিক আনুগত্য, সর্বপ্রকারের শেরেক থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা এবং যে কোনো সুপারিশকারী বা মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই তাঁর শরণাপন্ন হওয়া, তাঁর কাছে ধর্না দেয়া ও তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা।

বলা হচ্ছে, 'আমি তোমার কাছে সত্য সহকারে কেতাব নাযিল করেছি।'

আর যে সত্য সহকারে এ কেতাব নাযেল হয়েছে তার ভিত্তি হলো সর্বাত্মক একত্ব, যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগত টিকে আছে। পঞ্চম আয়াতেও বলা হয়েছে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত সেই একই সত্যের ভিত্তিতে আসমান যমীনের সৃষ্টি হয়েছে, এই কেতাবও নাযিল হয়েছে। সে-ই একক সত্য, যার পক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর একীভূত ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং এই কেতাবও সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহাবিশ্বে মহান স্রষ্টার হাত থেকে নির্গত প্রতিটা সৃষ্টিই একই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুতরাং তুমি আল্লাহর এবাদাত করো তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে।'

এখানে সম্বোধনটা করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর একনিষ্ঠ এবাদাতের আদেশ দেয়া হয়েছে রসূল (স.)-কে, যাঁর ওপর কেতাব নাযেল হয়েছে। তিনি যে বিধানের দিকে সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানান তা হলো এক আল্লাহর এবাদাত, এক আল্লাহর আনুগত্য এবং গোটা জীবনকে আল্লাহর একত্ব ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা।

আর আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার মতো কথাই নয়; বরং একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যার সূচনা হয় অন্তরে একটা বিশেষ আকীদা ও বিশ্বাস পোষেণের মধ্য দিয়ে, আর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক এবং বিভাগে একটা সর্বাত্মক বিধানের আকারে কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে যার সমাপ্তি।

আল্লাহর আনুগত্য শুধু মুখে উচ্চারণের বিষয় নয়

যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস পোষণ করে, সে সমগ্র জীবনে এক আল্লাহর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নোয়ায় না, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চায় না এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের কারো ওপর নির্ভর করে না। কেননা তার কাছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র তিনিই তার সকল বান্দার ওপর পরাক্রমশালী। বান্দারা সবাই দুর্বল ও অক্ষম। কেউ তার ক্ষতিও করতে পারে

না, উপকারও নয়। সুতরাং তাদের কারো কাছে তার মাথা নত করার প্রয়োজন হয় না। তারা সবাই তারই মতো। লাভ লোকসান করার ক্ষমতা রাখে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর দাতা অথবা বঞ্চিতকারী। একমাত্র তিনিই ধনী আর সমগ্র সৃষ্টি দরিদ্র। কাজেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে তার ধর্না দেয়ার প্রয়োজন নেই।

যে ব্যক্তির মন এক আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে, সে সমগ্র সৃষ্টিজগত পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক নিয়মের একত্বেও বিশ্বাস করে, আর এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, তা সেই প্রাকৃতিক বিধানেরই অংশবিশেষ এবং এই জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ ছাড়া মানব জীবন এই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না যার ভেতরে সে বসবাস করে। এ বিশ্বাসের কারণেই সে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না এবং গোটা প্রাকৃতি ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত ও সামঞ্জস্যশীল, আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া আর কোনো কিছুর আনুগত্য অনুসরণও করে না।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহর একত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়, সে আল্লাহর সৃষ্টি করা বিশ্বজগতের প্রতিটা বস্তু বা প্রাণীর সাথে নিজের নৈকট্য অনুভব করে। এমন একটা বন্ধুপ্রতিম বিশ্বে সে বাস করে যা তার প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে ও তার প্রতি সাড়া দেয়। সে তার চারপাশের সব কিছুতে আল্লাহর হাত রয়েছে বলে অনুভব করে। ফলে সে আল্লাহর সাথে এবং তার চোখে পড়া ও হাতে লাগা প্রত্যেকটা সৃষ্টির প্রতি সখ্য অনুভব করে এবং এই পরিবেশেই সে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে সে এ ব্যাপারে সচেতন থাকে যে, সকল বস্তুর স্রষ্টা, সকল জীবের জীবনদাতা, সকল জীব ও বস্তুর প্রভু এবং তার প্রভু মহান আল্লাহর হুকুম ও অনুমতি ছাড়া কাউকে কষ্ট দেয়া, কোনো বস্তু নষ্ট করা এবং কোনো জিনিস বা প্রাণীকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা তার কর্তব্য।

এই একত্ববাদ বা তাওহীদ বিশ্বাসের লক্ষণাদি চিন্তায় ও অনুভূতিতে এবং সকল কাজে ও আচরণে প্রকাশ পায় আর তা মানবজীবনের জন্যে একটা পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা তৈরী করে দেয়। বস্তুত তাওহীদ কেবল মুখে উচ্চারিত একটা কথা কখনো নয়। সে কারণেই তাওহীদী আকীদা বিশ্বাস যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তার পুন পুন আলোচনা কোরআনে এতো বেশী দেখা যায়। কেননা এ বিষয়টা সর্বকালে ও সকল পরিবেশে এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেকেরই তা বুঝা দরকার। তাই তাওহীদ একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়।

'জেনে রেখো, নির্ভেজাল আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।' এটা একটা গম্ভীর ঘোষণা। এর বর্ণনাভংগি খুবই লক্ষণীয়। কথাটার শুরু হয়েছে সতর্কতার সংকেতবাহী অব্যয় 'আলা' দিয়ে, যার অর্থ দাঁড়ায়, 'জেনে রেখো', 'মনে রেখো' বা 'সাবধান'। আর 'কাসর'-এর প্রক্রিয়ার কথাটা উচ্চারিত হওয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। এভাবে শাব্দিক গঠনপ্রণালী দিয়েই বিষয়টির ওপর প্রচন্ড গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা এটা সেই স্তম্ভ, যার ওপর গোটা জীবনই শুধু নয়, বরং গোটা সৃষ্টি জগতেরই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যেই এরূপ প্রবল ও জোরদার ভংগিতে কথটা বলা হয়েছে যে, 'মনে রেখো' একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য নির্ভেজাল আনুগত্য।' এর পরে আলোচনা করা হয়েছে মোশরেকদের সেই জটিল ভুয়া ও খোঁড়া যুক্তিটা নিয়ে, যা দিয়ে তারা তাওহীদী আকীদা বিশ্বাসের মোকাবেলা করতো।

'আর যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের মনিব হিসাবে গ্রহণ করে, তারা যুক্তি দেয় যে, আমরা তো এ সব দেব-দেবীর উপাসনা কেবল এ জন্যেই করি যেন তারা আমাদের আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।....... ' (আয়াত ৩)

বস্তুত মোশরেকেরা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের ও আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু যিনি সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র তাঁরই উপাসনা এবং একমাত্র তাঁরই নির্ভেজাল ও নিরংকুশ আনুগত্য করা উচিত— এই স্বভাবগত যুক্তি তারা গ্রহণ করেনি। তারা বরঞ্চ একটা উদ্ভট কাল্পনিক মতবাদ তৈরী করেছিলো। সেটা ছিলো এই যে, ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। এই ধারণার ভিত্তিতে তারা ফেরেশতাদের কাল্পনিক প্রতিমূর্তি তৈরী করতো এবং সেগুলোর পূজা করতো। সেই সাথে তারা দাবী করতো যে, ফেরেশতাদের মূর্তির পূজা করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এ পূজা নিছক ফেরেশতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে করা হয় না; বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় পূজায় তুষ্ট হয়ে ফেরেশতারা তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং তাদের আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী করবে, এই আশায় তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। এসব মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো লাত, মানাত ও উয্যা।

অথচ এই বিশ্বাসটা সহজ সরল ও স্বভাবসুলভ চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে চরম বিকৃতি এবং ভ্রষ্টতার পথে পা বাড়ানোর শামিল। কেননা ফেরেশতারা যেমন আল্লাহর মেয়ে নয়, তেমনি মূর্তিগুলোও ফেরেশতাদের প্রতিমূর্তি নয়। আর মহান আল্লাহও এই বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতায় খুশী নন। তিনি তাদের ব্যাপারে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নন আর এ পন্থায় কাউকে তিনি নিকটবর্তীও হতে দেন না।

যে সহজ সরল ও নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস নিয়ে ইসলাম এসেছে এবং যা প্রত্যেক রসূল প্রচার করেছেন, তা থেকে মানব জাতি যখনই বিচ্যুত হয়, তখনই প্রকৃতির স্বভাবগত যুক্তি থেকে সে বিচ্যুত হয়। আজকাল আমরা সর্বত্র ধর্মযাজক ও ওলী আওলিয়াদের উপাসনা দেখতে পাই। প্রাচীন আরবদের ফেরেশতা পূজা বা ফেরেশতাদের মূর্তিগুলো পূজা করার সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আল্লাহর কাছে তাদের সুপারিশ লাভের আশা উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান। অথচ সুপারিশ ও নৈকট্য লাভের পন্থা আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পন্থাটা হলো নির্ভেজাল তাওহীদ, এই আদিম পদ্ধতির সুপারিশ বা মধ্যস্থতার সাথে যার কোনো সাদৃশ্য বা মিল নেই।

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে সুপথ দেখান না যে মিথ্যুক, অতিশয় অবিশ্বাসী।'

মোশরেকেরা মিথ্যুক। কারণ একে তো তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর মেয়ে বলে, যা নির্জলা মিথ্যা। উপরন্তু এই মূর্তিপূজাকে তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা বলে প্রচার করে থাকে। অথচ এটাও মিথ্যা প্রচারণা। মোশরেকেরা অতিশয় অবিশ্বাসীও। কেননা তারা মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর নির্ভেজাল এবাদাতে অবিশ্বাস প্রকাশ করছে এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট ও অকাট্য আদেশের অবাধ্যতা প্রদর্শন করছে।

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ ও তাঁর প্রতি কুফরী যে ব্যক্তিই করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সুপথ দেখান না। কেননা সুপথপ্রাপ্তি হচ্ছে একটা পুরস্কার। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মনোনিবেশ। নির্ভেজাল আনুগত্য, তাঁর মনোনীত পথপ্রাপ্তির আকাংখা এবং তার অনুসন্ধানের বিনিময়ে ও প্রতিদানে এ পুরস্কার দেয়া হয়। যারা মিথ্যাচার ও কুফরীতে লিপ্ত থাকে তারা আল্লাহর হেদায়াত ও অভিভাবকত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা তারা নিজেরাই সে পথ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গোটা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে তাওহীদের প্রমাণ

পরবর্তী আয়াতে মোশরেকদের সেই ধারণার নিকৃষ্টতা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকেই চাইতেন তাকেই গ্রহণ করতে পারতেন।' (আয়াত ৪)

এটা চিন্তাধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে তর্কের খাতিরে সাময়িকভাবে ধরে নেয়া একটা বিষয়ে মতো। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে যে কোনো একটা সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে পারতেন। কেননা তাঁর ইচ্ছার পথে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা বাধাবন্ধনহীন ও চূড়ান্ত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন। এরপর তাঁর সন্তান থাকার কথা বলা এবং অমুকে তার সন্তান ইত্যাদি বলার অধিকার কারো নেই। এটা একমাত্র আল্লাহরই একচ্ছত্র অধিকার, একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত ও একচ্ছত্র ইচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষাংশে সন্তান গ্রহণের এ অপবাদ খন্ডন কর বলেছেন–

'তিনি পবিত্র! তিনিই এক, অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ।'

সন্তান গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে কোথেকে? তিনি তো সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, সকল বস্তু ও সকল প্রাণী তাঁরই মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি।

'তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ন্যায়সংগতভাবে সৃষ্টি করেছেন। রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন।' (আয়াত ৫)

আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য, দিন ও রাত, সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত ও বশীভূত করে রাখার প্রতি এই দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্য মানবীয় বিবেকবুদ্ধিতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এই সত্য বদ্ধমূল করছে যে, তাঁর কোনো সন্তান বা অংশীদার থাকা তাঁর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা যিনি এই বিশ্বজগত একাকীই সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোনো সন্তান বা অংশীদারের মুখাপেক্ষী থাকেন না।

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল এবং বিশ্বজগতের পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক বিধিমালায় মহান সৃষ্টিকর্তার একত্বের নিদর্শন সুস্পষ্ট, এমনকি আকাশ ও পৃথিবীর দিকে খালি চোখে তাকালেও মনে হয়, যে ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্তকারী শক্তি এর সৃষ্টি এবং ব্যবস্থাপনার পেছনে সক্রিয়, তা এক ও অদ্বিতীয়। এ যাবত মানুষের যতো আবিষ্কার উদ্ভাবনের তথ্য জানা গেছে, তাতেও পর্যাপ্ত একত্বের প্রমাণ মেলে। বিশ্বজগতের যতটুকু এ যাবত মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে, তা এমন সব অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত, যা এই স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী, আর সেই অণু-পরমাণুও একই স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী রশ্মিসমূহ দ্বারা গঠিত। এ কথাও সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেখানে অথবা সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রে যে সমস্ত অণু-পরমাণু রয়েছে এবং সেসব অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত যেসব বস্তু রয়েছে, তার সবই স্থায়ীভাবে আবর্তনশীল। এই আবর্তন একটা চিরস্থায়ী বিধান। ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশালাকার নক্ষত্র পর্যন্ত কোনো কিছুই এই বিধানের বাইরে নয়। এটাও জানা গেছে যে, এই আবর্তনের আগে একটা চিরস্থায়ী বিধি ব্যবস্থা রয়েছে, যা বিশ্বজগতের সৃষ্টির একত্ব ও ব্যবস্থাপনার একত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দেয়। উপরন্তু এই বিশ্বজগতের পরিকল্পনায়ও যে ঐক্য রয়েছে, মানব জাতি প্রতিনিয়ত তার প্রমাণাদি একের পর এক উদঘাটন করে চলেছে। এই পরিকল্পনায় এমন একটা চিরস্থায়ী ন্যায়নীতিরও উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া গেছে, যা কারো খেয়াল খুশী বা ঝোঁকের বশে পরিবর্তিত হয় না, তার রদবদল ঘটে না এবং তা কোনো পক্ষপাতিত্ব দোষেও দুষ্ট হয় না।

'তিনি ন্যায়সংগতভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।' তিনি তো কেতাবও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহাবিশ্বে কার্যকর সত্য ও ন্যায়নীতি এবং এই কেতাবের মধ্যে কার্যকর সত্য ও ন্যায়নীতি একই জিনিস, তা একই উৎস থেকে নির্গত এবং মহাবিজ্ঞানী, মহা শক্তিশালী স্রষ্টার একত্বেরই নিদর্শন বহন করে।

'রাত দিয়ে দিনকে এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন।' এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ বাচনভংগি, যা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দিতে পাঠককে বাধ্য করে। এ কথা সত্য যে আমি সমগ্র যিলালুল কোরআনে এই মনোভাব পোষণ করে এসেছি যে, মানুষের রচিত বা আবিষ্কৃত মতবাদগুলোর ওপর ভিত্তি করে কোরআনের ব্যাখ্যা করবো না। কেননা ওগুলো কখনো ভুল, কখনো সঠিক, কখনো গ্রহণযোগ্য কখনো বাতিল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অথচ কোরআন চিরসত্য। এর সত্যতার প্রমাণ সে নিজেই বহন করে। দুর্বল ও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী মানুষের আবিষ্কার উদ্ভাবনের দেয়া সম্মতি বা অসম্মতি থেকে কোরআন নিজের বক্তব্যের সত্যাসত্য প্রমাণ করার অপেক্ষায় থাকে না।

কিন্তু এই মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও এ আয়াতটার বর্ণনাভংগি আমাকে পৃথিবীর গোলাকার হওয়ায় তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে। ভূপৃষ্ঠে বাস্তবিকভাবে দৃষ্টিগোচর একটা সত্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গোলাকার পৃথিবী সূর্যের সম্মুখে নিজেরই চারপাশে ঘোরে। এই ঘোরার সময়ে তার গোলাকার পৃষ্ঠের যে অংশটা সূর্যের সম্মুখে থাকে তা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয় এবং সেই স্থানে দিন হয়। কিন্তু এই অংশটা স্থিতিশীল থাকে না। কেননা পৃথিবী আবর্তনশীল। যখনই তা আবর্তিত হয়, অমনি রাত এসে সেই অংশটাকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেয় যেখানে দিন ছিলো। আর এই ভূ-পৃষ্ঠ গোলাকার বিধায় দিন তাকে ঢেকে দেয় এবং তার অব্যবহিত পরই আবার রাত এসে তাকে ঢেকে দেয়। আবার কিছু সময় অপরদিক থেকে দিন উদ্ভূত হয়ে রাতের ওপর চড়াও হয়। এভাবেই চলতে থাকে চিরন্তন আবর্তন। 'রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন।' আয়াতের ভাষা আকৃতি, অবস্থা এবং পৃথিবী ও তার আবর্তনের ধরন চিহ্নিত করছে। পৃথিবী গোলাকার ও তার ঘূর্ণায়মান হওয়ার মতবাদ দ্বারা রাতের এ অংশটার অধিকতর নির্ভুল তাফসীর পাওয়া যায়।

'আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। উভয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলমান থাকে।'

সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। উভয়ে আল্লাহর হুকুমে চলে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ দাবী করে না এবং করতে পারে না যে, সে চন্দ্র ও সূর্যকে পরিচালনা করে। আবার স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি এ কথাও মানতে রাযি নয় যে, উভয়ে কোনো চালক ছাড়াই চলতে সক্ষম। কোটি কোটি বছর ধরে এমন সুশৃংখলভাবে চলতে থাকা যে, এক চুলও পরিবর্তন নেই, কোনো পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ছাড়া সম্ভব নয়। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র এভাবে চলতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না সেই মেয়াদের পরিমাণ কী।

'মনে রেখো, তিনিই মহাশক্তিধর, ক্ষমাশীল।'

অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা, সীমাহীন শক্তি এবং পরাক্রম সত্ত্বেও তিনি ক্ষমাপ্রার্থী ও পাপের পথ থেকে ফিরে আসা লোকদের জন্যে ক্ষমাশীল। চাই তারা অতীতে যতোই কুফরী, মিথ্যাচার ও শেরেকে লিপ্ত থাক না কেন, তাদের সামনে সব সময় তাওবার দরজা খোলা আছে।

মহাবিশ্বের অথৈ দিগন্তে দৃষ্টি আকর্ষণের পর বান্দাদের নিজ সত্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মানুষ ও তাদের বশীকৃত প্রাণীদের ইহকালীন জীবনের দিকে ইংগিত করে বলা হচ্ছে, 'তোমাদের তিনি একই সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন.....। (আয়াত ৬)

আর যখন মানুষ তার নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন দেখতে পায় যে, এই সত্ত্বাকে সে নিজে সৃষ্টি করেনি এবং এর সৃষ্টি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে যা কিছু তথ্য জানিয়েছেন তা ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। সে আরো জানতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষেরই সত্ত্বা একই প্রকৃতি এবং একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যা তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আওতায় এসে যায় পৃথিবীর সকল মানুষ। পৃথিবীর সকল অঞ্চল ও সকল প্রজন্মের কোটি কোটি মানুষের মনমানসিকতা ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য একই রকমের। আর প্রত্যেকের জোড়াও তারই মতো। এ সকল বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সকল নারী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মোটামুটি মিল রয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষ সৃষ্টির মূল নকশা ও পরিকল্পনায় নারী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না।

মানব সত্ত্বার জোড়ার এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের সাথে সাথে বলা হচ্ছে, পশুদের বেলায়ও এই বৈশিষ্ট্য বহাল রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, সকল প্রাণীর সৃষ্টির মূলে একই মূলনীতি কার্যকর ছিলো।

'আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা পশুদের মধ্য থেকে আট জোড়া সৃষ্টি করেছেন।'

অন্য আয়াতে এই আট জোড়ার বিবরণ এসেছে এভাবে, মেষ (নারী ও পুরুষ), ছাগল (নারী ও পুরুষ) গরু (নারী ও পুরুষ) এবং উট (নারী ও পুরুষ)। নারী ও পুরুষকে একত্রে উল্লেখ করে জোড়া বলা হয়ে থাকে। এভাবে তারা সামগ্রিকভাবে আট জোড়া হলো। 'তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন' কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মানব জাতির অনুগত করে দিয়েছেন। এই অনুগত করাটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা। তার পক্ষ থেকে এটা অনুমোদিত।

মানুষ ও পশুর ভেতরে নর নারীর জোড়া সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া সমভাবে প্রচলিত– এ কথা উল্লেখ করার পর মাতৃগর্ভে এদের জন্মের কি কি স্তর পার হতে হয় তা বর্ণনা করা হচ্ছে,

'তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন।' যেমন বীর্যফোঁটা থেকে জমাট রক্তে, জমাট রক্ত থেকে গোশতের টুকরোয় রূপান্তর, অতপর এই স্তর থেকে মানুষের উপাদান ও আকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়, এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

'তিনটি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে..................।'

প্রথম অন্ধকারটা হলো থলির অন্ধকার, দ্বিতীয়টা এই থলি যে জরায়ুতে থাকে তার অন্ধকার এবং তৃতীয় যে পেটে এই জরায়ু থাকে সেই পেটের অন্ধকার। এই তিন রকমের অন্ধকারের ভেতরে আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্র ভ্রূণটাকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। এই ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে তিনি তত্ত্বাবধান করেন, বেড়ে ওঠার শক্তি দেন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ক্ষমতা দেন এবং তার স্রষ্টা তার জন্যে যেভাবে পূর্ণাংগ মানুষের রূপ ধারণ করার পরিকল্পনা করেছেন সেভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেন।

এবার মানব ভ্রূণের এই স্বল্পমেয়াদী অথচ সুদূরপ্রসারী সফরের দিকে লক্ষ্য করুন, এই বিকাশ, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির কথা ভাবুন এবং সেই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, যা এই দুর্বল কোষটাকে তার বিস্ময়কর অভিযাত্রার দিকে টেনে নিয়ে যায়। ভেবে দেখুন, যে মানুষের জ্ঞান, দৃষ্টি ও ক্ষমতার আওতার বাইরে গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এ বিস্ময়কর বিকাশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কিভাবে চলে।

এই প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবলেই মানুষের মন মহান স্রষ্টার হাত সক্রিয় দেখতে পায়। দেখতে পায় সেই জীবন্ত, স্পষ্ট ও মূর্তিমান হাতের নিদর্শনের মাধ্যমে, দেখতে পায় সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একত্বের

প্রকাশ্য লক্ষণগুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে। এজন্যেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, এমন দেদীপ্যমান সত্যের দর্শন থেকে মানুষের মনকে কিভাবে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুত করা সম্ভব?

'এই হচ্ছেন তোমাদের প্রভু আল্লাহ তায়ালা। সমগ্র রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব তোমরা পথচ্যুত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

মহান আল্লাহর একত্ব ও সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শনের এই সুস্পষ্ট দর্শনের পর পরবর্তী আয়াতে মানুষকে তার নিজ সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হচ্ছে, তাকে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার মধ্য থেকে যে কোনো একটা পথ বেছে নিতে বলা হচ্ছে, আর এই পথ বেছে নেয়ার দায়দায়িত্ব তাকেই নিতে বলা হচ্ছে। অতপর এই যাত্রার শেষ গন্তব্যস্থল এবং সেখানে তার জন্যে যে হিসাবনিকাশ অপেক্ষা করছে, তা দেখানো হচ্ছে। যিনি তাকে তিন রকমের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং তারা যা কিছু হৃদয়ের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখে তা যিনি জানেন, তিনিই তার এই হিসাব নিকাশ গ্রহণ করবেন।

'যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর, তা হলে (আল্লাহর কিছুই আসে যায় না।) তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।.......' (আয়াত ৭)

মাতৃগর্ভে বিকাশ বৃদ্ধির এই সফরটা দীর্ঘ যাত্রাপথের একটা ধারা মাত্র। এর পরই আসছে মাতৃগর্ভের বাইরের জীবনের স্তর। তারপর আসবে হিসাব ও কর্মফল পাওয়ার স্তর। মহাজ্ঞানী মহান স্রষ্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনাক্রমেই একে একে এ স্তরগুলো আসে ও যায়। মহান আল্লাহ দুর্বল ও দরিদ্র মানুষের কাছে কোনো ব্যাপারেই মুখাপেক্ষী নন। মানুষের দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কেবল নিজ দয়াগুণেই মানুষের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

'তোমরা যদি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করো, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।'

বস্তুত আল্লাহর প্রতি তোমাদের ঈমান আনয়নের ফলে আল্লাহর সম্পত্তিতে কিছুই বৃদ্ধি ঘটে না। আর তোমাদের কুফরী এবং অকৃতজ্ঞতায়ও তাঁর কণা পরিমাণ ক্ষতি বা লোকসান হয় না। তবে তিনি কাফেরদের কুফরীতে সন্তুষ্ট হন না এবং তা পছন্দও করেন না।

তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট হন না।'

'আর যদি তোমরা শোকর করো তবে তিনি তোমাদের ওপর খুশী হবেন।' অর্থাৎ এটা তিনি তোমাদের জন্যে পছন্দ করবেন এবং এ জন্যে তোমাদের ভালোও বাসবেন।

এরপর বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কর্মের জন্যেই দায়ী, একমাত্র নিজের কাজের জন্যেই তাকে হিসাব দিতে হবে, কেউ অন্যের দায়িত্ব বহন করবে না। কেননা প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে।

'কোনো গুনাহকার অন্যের গুনাহর দায়িত্ব বহন করে না। আর সর্বশেষ গন্তব্য একমাত্র আল্লাহই, আর কেউ নয়। তার কাছ থেকে কারো পালানোর জায়গা নেই এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।'

'অতপর তাঁর কাছেই তেমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজ করছিলে।' এ ব্যাপারে তাঁর অজানা কিছু নেই। কেননা—

'তিনি হৃদয়ের মধ্যে গোপন করা সব কিছু জানেন।'

এ হচ্ছে পরিণতি। আর এই সাথে হেদায়াতের প্রমাণাদিও বর্ণনা করা হলো। এ হচ্ছে বিভিন্ন পথের মিলনস্থল। তাই এখানে বসে প্রত্যেককে নিজ নিজ পথ বেছে নিতে হবে যুক্তি প্রমাণের আলোকে, বিচক্ষণতা সহকারে এবং জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার সাহায্যে।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

৮. (নিয়ম হচ্ছে,) মানুষকে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার মালিকের দিকে ধাবিত হয়, পরে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত দিয়ে তার ওপর অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে জন্যে আগে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো তা ভুলে যায়, সে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানায়, যাতে করে সে (অন্যদের) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে; (হে নবী,) তুমি এমন লোকদের বলে দাও, নিজের কুফরীর আরাম আয়েশ (হাতেগোনা) কয়টি দিনের জন্যে ভোগ করে নাও, (পরিণামে) তুমি অবশ্যই জাহান্নামী (হবে)। ৯. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয় কিংবা দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে এবং পরকালের (আযাবের) ভয় করে, (সর্বাবস্থায়) তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; (হে নবী, এদের) বলো, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই (এসব তারতম্য থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

রুকু ২

১০. (হে নবী, এদের) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যারা এ দুনিয়ায় কোনো কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্যে (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে), আল্লাহ তায়ালার যমীন অনেক প্রশস্ত; (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।

তাফসীর

আয়াত ৮-১০

প্রথম পর্বে মানুষকে তার জন্মের কাহিনী শুনিয়ে, একই ব্যক্তি থেকে সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টির তথ্য জানিয়ে, তার স্বজাতীয় অপর জনের সাথে তার জোড়া বানানো, পশুদের একইভাবে জোড়া বানানো এবং তিনটি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির কেসসা শুনিয়ে তার হৃদয় স্পর্শ করা হয়েছে। শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাকে মানবীয় স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী

করেছেন এবং তারপর কিভাবে তাকে বেঁচে থাকা ও উন্নতি লাভ করার যোগ্যতা দান করেছেন, তা জানিয়েছেন।

বিপদ মসিবতের সময়ই মানুষের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে

এখানে দেখানো হয়েছে, সুখের সময় মানুষের কী অবস্থা হয় এবং দুঃখের সময় কী অবস্থা হয়। মানুষের ভেতরে কত দ্রুত পরিবর্তন আসে, কত দুর্বলতার শিকার হয়, কত বড় বড় বুলি আওড়ায় এবং আদর্শের ওপর সে কেমন অস্থিতিশীল, তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে এটাও দেখানো হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ও তার অনুগত হয়, তখন সে সঠিক পথ চিনতে পারে, প্রকৃত সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে গুণবৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা দ্বারা উপকৃত হয়।

'আর যখন মানুষের ওপর কোনো দুঃখ মসিবত আসে তখন সে তার প্রতিপালককে পরম বিনয় সহকারে ডাকে।' (আয়াত ৮)

বস্তুত মানুষ যখন দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তখন তার স্বভাব প্রকৃতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে, তার ওপর থেকে সমস্ত মরিচা দূর হয়ে যায়, সকল পর্দা সরে যায় এবং সমস্ত কু-সংস্কার ও কু-ধারণা সে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ফলে সে তার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করে এবং একমাত্র তাঁর কাছেই বিনীত হয়। কেননা সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। সে এও বুঝতে পারে যে, সে যেসব শরীক বা সুপারিশকারীর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তা সবই মিথ্যা।

কিন্তু যখনই বিপদ মসিবত দূর হয়ে যায়, যখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন এবং তার দুর্যোগ হটিয়ে দেন, তখনই তার ওপর আবার মরিচা পড়ে, আল্লাহর একত্বের কথা সে ভুলে যায়, বিপদের সময় সে যে একমাত্র তাঁর কাছেই ধর্না দিয়েছিলো ও তাঁরই সাহায্য চেয়েছিলো তাও ভুলে যায়। সে সময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ যে তাকে সাহায্য করতে ও বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারতো না, তা আর তার মনে থাকে না। ফলে সে আল্লাহর সাথে অন্য শরীক গণ্য করে। হয় সে জাহেলী যুগের মত অন্যদের সরাসরি মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে নতুবা কোনো বিশেষ চিন্তাধারাকে, মূল্যবোধকে, ব্যক্তিকে বা ব্যবস্থাকে আল্লাহর শরীক বানায়, যেমন বহু জাহেলী সমাজে করা হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মানুষ নিজের প্রকৃতির লালসাকে, কামনা ও বাসনাকে, বাঞ্ছিত বস্তুকে, ভীতিজনক ব্যক্তি বা বস্তুকে, সম্পদ সম্পত্তিকে, সন্তান সন্তুতিকে, মুরব্বীদের বা শাসকদের আল্লাহর মতোই বা তার চেয়েও একনিষ্ঠভাবে পূজা করে, সেগুলোকে আল্লাহর মতোই বা তার চেয়েও বেশী ভালোবাসে। শেরেক বহু রকমের হয়ে থাকে। কোনোটা এতো সূক্ষ্ম যে, মানুষ তাকে শেরেকই মনে করে না। কেননা তা প্রচলিত শেরেকের আকৃতি ধারণ করে না, কেবল প্রকৃতিগতভাবে তা শেরেকের আওতাভুক্ত।

কিন্তু এর পরিণতি হয়ে থাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্টতা। কেননা আল্লাহর পথ একটা-একাধিক নয়। একমাত্র এককভাবে তাঁকে ভালোবাসলে, তাঁর কাছে একনিষ্ঠভাবে ধর্না দিলে এবং একমাত্র তাঁর এবাদাত করলেই তাঁকে পাওয়া যায়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে অন্তরে আর কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করার অবকাশ থাকে না। ধন সম্পদ, সন্তান সন্তুতি, দেশ, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়কে তার সমপর্যায়ে রাখা চলে না। এর কোনো একটাকেও আল্লাহর সমপর্যায়ে রাখলে তা শেরেকে পরিণত হবে এবং গোমরাহী বলে গণ্য হবে।

'বলো, তুমি কিছুকাল তোমার কুফরীর সুফল ভোগ করে নাও। তুমি তো অবশ্যই দোযখবাসী।'

পৃথিবীর ভোগ বিলাস যতো বেশী ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন, তা নিতান্তই তুচ্ছ। তার আয়ুষ্কাল যতোই বেশী হোক না কেন, তা সামান্য। বরঞ্চ আখেরাতের তুলনায় সমগ্র মানব জাতির পার্থিব জীবন খুবই ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী।

মানুষের এই দুর্ভাগ্যজনক চিত্রের পাশাপাশি অন্য একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। এটা হচ্ছে আল্লাহভীরু, আল্লাহকে নিরন্তর স্মরণকারী, সুখে দুঃখে কোনো অবস্থায় আল্লাহকে ভোলে না, পৃথিবীতে জীবন যাপনকালে আখেরাত সম্পর্কে সচকিত থাকে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় থাকে এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার কারণে জগত ও জীবন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয় এমন মোমেনের চিত্র। 'আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সাজদারত অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে এবাদাত করে, আখেরাতকে ভয় করে...... ' (আয়াত-৯)

সাজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা এ একটা উজ্জ্বল মনোরম চিত্র। এবাদাত, আনুগত্যে মনোনিবেশ করা এবং এতো সংবেদনশীল থাকা যে, সর্বক্ষণ আখেরাতের ভয়ে ভীত ও আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত— এটা এমন একটা স্বচ্ছ ও সুন্দর অবস্থা যা মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয় এবং হৃদয়কে দর্শন ও গ্রহণের ক্ষমতা দান করে। এসব কিছু মানুষের একটা উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ চিত্র তুলে ধরে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে অংকিত দুর্ভাগ্যজনক চিত্রের ঠিক বিপরীত। তাই আয়াতের শেষভাগে যে তুলনাটা করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসংগিক; 'বলো, যাদের জ্ঞান আছে আর যাদের জ্ঞান নেই, তারা কি সমান?'

বস্তুত সত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধিই হলো প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান অন্তশ্চক্ষুকে খুলে দেয়। এই জ্ঞান দ্বারাই বিশ্বজগতের চিরন্তন সত্যের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপিত হয়। বিচ্ছিন্ন যেসব তথ্য মনমগযে ভিড় জমায়, অথচ জগত ও জীবনের বৃহত্তম সত্য সম্পর্কে অবহিত করে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগতের বাইরে প্রসারিত হয় না, তা জ্ঞান বা এলেম নয়।

এটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ও আলোকময় তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ। আল্লাহর এবাদাত, হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, আখেরাত সম্পর্কে সতর্কতা, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের আশা এবং আল্লাহর ভয়ে সর্বক্ষণ ভীতসন্ত্রস্ত থাকা— এই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথ। যারা এই পথ অবলম্বন করে তারাই জ্ঞানবান হয়, যা দেখে শোনে ও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হয় এবং ছোট ছোট অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে চিরন্তন সত্যের কাছে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে যারা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের সীমানায় গিয়েই থেমে যায়, তারা তথ্য সংগ্রহকারী বটে কিন্তু জ্ঞানী নয়।

'জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।'

অর্থাৎ যারা এতো খোলা মনের অধিকারী যে, দৃশ্যমান জগতের বাইরের তথ্যও তারা অর্জন করে এবং যা দেখে ও যা জানে, যা কিছু দেখে ও স্পর্শ করে তা দ্বারা উপকৃত হয়, তাতে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিনকে ভোলে না।

এই দুটো চিত্র তুলে ধরার পর মোমেনদের তাকওয়া ও এহসান অর্জনের আহবান জানানো হচ্ছে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে আখেরাতের জীবনের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী পুণ্য অর্জন করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১০)

'বলো, হে আমার মোমেন বান্দারা, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো... ।' অর্থাৎ আমার মোমেন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলো, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। তবে কথাটা আহবান

জানানোর রীতিতে বলা হয়েছে। কেননা আহবান জানানোতে ঘোষণা এবং সর্তকবাণীও থাকে। আসলে রসূল (স.) মানুষদের কখনো 'হে আমার বান্দারা' বলে আহবান জানাবেন না। কেননা মানুষ আল্লাহর বান্দা। কাজেই এ আহবানটা মোহাম্মদ (স.)-কে জানাতে বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই আহবান। রসূল (স.) শুধু আহবান পৌঁছে দেয়ার জন্যে আদিষ্ট।

তাকওয়া হচ্ছে হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি ও স্পর্শকাতরতা, আল্লাহর ক্রোধের ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের আশা। এ হচ্ছে সেই উজ্জ্বল ছবি, যা পূর্ববর্তী আয়াতে অংকিত হয়েছে। এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের ছবি।

'যারা পৃথিবীতে এহসান (সৎকাজ) করবে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।'

কী চমৎকার প্রতিদান। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটা ভালো কাজের প্রতিদান দেয়া হবে চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনে। এটা কেবল মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহেরই ফল। তিনি তার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও তার চেষ্টার দীনতা হীনতার কথা জানেন, তাই তাকে রেয়াত দেন ও তার প্রতি মহানুভবতা দেখান।

'আর আল্লাহর পৃথিবী সু-প্রশস্ত।'

কাজেই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের ভালোবাসা ও প্রেম যেন তোমাদের আটকে না রাখে, আত্মীয়স্বজন ও বাসস্থানপ্রীতি যেন তোমাদের সেখান থেকে হিজরত করার পথে অন্তরায় না হয়, যদি তোমাদের দ্বীন অনুসারে জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সেখানে বসে সৎকাজ করা অসম্ভব হয়। বস্তুত এ রকম পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড আঁকড়ে পড়ে থাকা শয়তান অনুপ্রবেশের পথ করে দেয়ার শামিল হবে এবং মানব হৃদয়ে আল্লাহর অংশীদার গ্রহণেরই পর্যায়ভুক্ত হবে।

এটা মানব মনের গোপন শেরেকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের একটা নিপুণ কোরআনী কৌশল। আল্লাহর একত্ব ও তাকওয়া সংক্রান্ত আলোচনার একটা অনুষংগ হিসেবে এটা এসেছে। এ দ্বারা এই কোরআনের উৎস সম্পর্কেও আভাস দেয়া হয়েছে। কেননা মানুষের অন্তরের ব্যাধির এমন সুন্দর চিকিৎসা তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও অন্তর্যামী।

তিনি মানুষের স্রষ্টা বিধায় জানেন, জন্মস্থান থেকে হিজরত করা তার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। জন্মস্থানের সাথে নানাভাবে জড়িয়ে থাকা সম্পর্ক ও বন্ধনগুলো ছিন্ন করা এবং নতুন জায়গায় জীবন যাপন জীবিকা খুঁজে পাওয়া ও জীবনের আদত অভ্যাসগুলো ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর। এজন্যে এখানে হিজরতকারীদের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে এর জন্যে অফুরন্ত সওয়াবের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

'ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে।'

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে উপযুক্ত আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করেছেন, তাদের দুর্বল হৃদয়ের যথোচিত চিকিৎসা করেছেন, কঠিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর তাদের দয়া ও অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়ে প্রবোধ দিয়েছেন এবং মাতৃভূমিতে ছেড়ে আসা জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী ও আত্মীয়স্বজনের উপযুক্ত প্রতিদান নিজের কাছ থেকে বিনা হিসাবে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরের এতো সূক্ষ্ম ও গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত মহান রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ﴿١٤﴾ فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমি যেন আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি, ১২. এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রণী হই। ১৩. তুমি বলো, আমি যদি আমার মালিকের না-ফরমানী করি তাহলে আমি আমার ওপর একটি মহা দিনের শাস্তির ভয় করি। ১৪. তুমি বলো, আমি একান্ত নিষ্ঠাবান হয়েই আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি, ১৫. তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো; (হে নবী,) তুমি বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা, যারা (অন্যের গোলামী করার কারণে) কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের ভীষণ ক্ষতি করবে; তোমরা জেনে রেখো, এ (আখেরাতের) ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১৬. তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বীভৎস) আযাব, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো। ১৭. যারা শয়তানী শক্তির গোলামী করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং (একনিষ্ঠভাবে) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে এসেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাসুসংবাদ, অতএব (হে নবী), তুমি আমার (এমন সব) বান্দাদের সুসংবাদ দাও, ১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং ভালো কথাসমূহের অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ। ১৯. (হে নবী,) যে ব্যক্তির ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আযাবের

الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ

اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে (তাকে কে বাঁচাবে); তুমি কি (তাকে) বাঁচাতে পারবে যে জাহান্নামে (চলে গেছে), ২০. তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদা বরখেলাপ করেন না।

তাফসীর
আয়াত ১১-২০

এ অংশটাতে সম্পূর্ণরূপে আখেরাতের বিবরণ, আখেরাতের আযাবের ভীতি ও সেখানকার পুরস্কারের আশার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর শুরু হয়েছে রসূল (স.)-কে নির্ভেজাল তাওহীদের বাণী প্রচারের আদেশদান এবং নবী হয়েও তিনি যদি তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হন তবে তার ভয়ংকর পরিণতি হবে বলে ঘোষণা করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে। সেই সাথে তাঁকে তাঁর আদর্শ ও নীতির ওপর অবিচল থাকার ঘোষণা দিতে, মোশরেকদের তাদের আদর্শ ও মতবাদের ওপর ছেড়ে দিতে এবং কেয়ামতের দিন এই উভয় গোষ্ঠীর পরিণাম জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'তুমি বলো, আমি আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে তাঁর এবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি এবং সবার আগে আত্মসমর্পণকারী হতে আদিষ্ট হয়েছি। তুমি বলো, আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করলে ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করি।'

রসূল (স.) যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করতে, তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য করতে ও এভাবে প্রথম আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হতে আদিষ্ট, আর তিনি আল্লাহর অবাধ্য হলে তার যে ভয়ংকর আযাবের আশংকা রয়েছে এ ঘোষণা ইসলামের তাওহীদ আকীদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিরাট অবদান রাখে। এখানে রসূল (স.) নিছক আল্লাহর দাস ছাড়া আর কিছু নন। এবাদাত বা দাসত্বের জায়গায় দাসরা সব এক কাতারে দাঁড়ায়। আর মহান আল্লাহর সত্তা সকল দাসের ওপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এটাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

এই পর্যায়ে উলুহিয়াত তথা প্রভুত্ব এবং উবুদিয়াত তথা দাসত্বের অর্থটা এতো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, উভয়ের ভেতরে আর কোনো অস্বচ্ছতা ও দুর্বোধ্যতা নেই। আল্লাহ তায়ালা যে এক এবং তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই, সে বিষয়টা দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে ওঠেছে আর স্বয়ং মোহাম্মদ (স.) যখন আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে এই ঘোষণা দেন এবং অবাধ্যতা করলে এমন আযাবের ভয় পান, তখন মোশরেকরা তাদের এবাদাতে আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদের বা মূর্তিগুলোকে অংশীদার বানিয়ে তাদের সুপারিশে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করবে, এর কোনো অবকাশই নেই।

তাওহীদ আলোচনার পুনরাবৃত্তি

পরবর্তী আয়াত কয়টিতে পুনরায় এই তাওহীদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর মোশরেকদের তাদের বাতিল মতাদর্শ নিয়ে থাকতে ও যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি ভোগ করতে দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

'তুমি বলো, আমি শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করবো তার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে। আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া যার ইচ্ছা দাসত্ব করো। বলো, যারা কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনদের ক্ষতি সাধন করে, মনে রেখো, তাদের সেই ক্ষতিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

অর্থাৎ এখানে এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করানো হলো যে, আমি আমার পথে চলবোই। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও এবাদাত করবো এবং তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য করবো। আর তোমরা? তোমরা যে পথে ইচ্ছা চলো। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যার যার দাসত্ব করতে চাও করো। তবে জেনে রেখো, এতে এমন ক্ষতি হবে যার চেয়ে বড় ক্ষতি আর হতে পারে না। প্রথমত নিজের ক্ষতি জাহান্নামে যাওয়া। দ্বিতীয়ত আপনজনদের হারানো। তারা মোমেন কিংবা কাফের যাই হোক না কেন। তারা যদি মোমেন হয় তবে মোশরেকরা তাদের হারাবে। কেননা তারা যাবে একদিকে আর মোশরেকরা যাবে অন্যদিকে। আর যদি তারা মোশরেক হয় তবে সবাই মিলেই যাবে জাহান্নামে।

তারপর এই সুস্পষ্ট ক্ষতির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে,

তাদের ওপর থেকে নামবে রাশি রাশি আগুন, আর নীচ থেকেও ওঠবে রাশি রাশি। এও সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।'

এটা যথার্থই একটা আতংকজনক দৃশ্য। ওপর থেকেও আগুন, নীচ থেকেও আগুন। এই আগুনের মাঝখানে থাকবে তারা। আগুন তাদের ঘিরে রাখবে।

এটা একটা ভয়াবহ দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সামনে এ দৃশ্য তুলে ধরেন। তারা এ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। আর তারা যাতে আত্মরক্ষা করে সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সতর্ক করেন,

'আল্লাহ তায়ালাও এ বিষয় থেকেই তার বান্দাদের সাবধান করেন।' তিনি তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের জন্যে আহবান জানান;

'হে আমার বান্দারা, আমাকে ভয় করো।

অপরদিকে অবস্থান নেবে মুক্তিপ্রাপ্তরা, যারা এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিকে ভয় পেতো।

'আর যারা তাগুতের উপাসনা থেকে বিরত থাকতো এবং আল্লাহর অনুগত থাকতো, তাদের জন্যে সুসংবাদ। এতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও।....(আয়াত ১৭, ১৮) 'তাগুত' শব্দটার উৎপত্তি 'তুগইয়ান' থেকে, যেমন মিল্ক থেকে মালাকুত ইত্যাদি। এতে আধিক্য ও বড়ত্ব বুঝানো হয়। যে কোনো সীমা অতিক্রমকারী ও বিদ্রোহকারীকে 'তাগুত' বলা যায়। যারা তাগুতের উপাসনা পরিহার করে তারাই হচ্ছে আল্লাহর অনুগত এবং একমাত্র তাঁরই এবাদাতকারী।

এসব লোকের জন্যেই সুসংবাদ। উর্ধ্বজগত থেকে এ সুসংবাদ এসেছে আর রসূল (স.) আল্লাহর আদেশে তাদের কাছে এ সুসংবাদ পৌঁছাবেন। একজন মহান রসূল যে উর্ধ্বন জগতের এ সুসংবাদ বহন করছেন, এটাই একমাত্র অনুগ্রহ।

এদের অন্যতম গুণ হলো, তারা সবার সব কথা শোনে, কিন্তু কেবল ভালো কথাগুলোই অনুসরণ করে এবং অন্য কথাগুলো প্রত্যাখ্যান করে। তারা কেবলমাত্র সেসব পবিত্র কথাবার্তাই

অনুসরণ করে, যা দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয়। যাদের মন পবিত্র, তারা ভালো কথা গ্রহণ করে ও মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে। আর যাদের মন অপবিত্র, তারা কেবল অপবিত্র কথাই শোনে ও মেনে নেয়।

'তারাই সেসব লোক, যাদের আল্লাহ হেদায়াত করেছেন।' যেহেতু আল্লাহ তায়ালা জানেন যে তাদের অন্তর সত্যপন্থী ও কল্যাণমুখী, তাই তিনি তাদের সৎ কথা শোনা ও মেনে নেয়ার পথে চালিত করেছেন। আর আল্লাহ যে পথ দেখান সেটাই প্রকৃত পথ।

'আর তারাই বিবেকবান লোক।'

বস্তুত পরিচ্ছন্ন ও নির্মল বিবেকই মানুষকে শুদ্ধি ও মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি শুদ্ধি ও মুক্তির পথ অনুসরণ করে না, সে যেন বিবেকের ন্যায় আল্লাহ অমূল্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।

এই বিবেকবান মোমেনরা আখেরাতে যে নেয়ামত উপভোগ করবে, তার দৃশ্য তুলে ধরার আগে বলা হচ্ছে যে, তাগুতের উপাসকরা ইতিমধ্যেই জাহান্নামে পৌঁছে গেছে। কেউ তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

'যে ব্যক্তির ওপর আযাবের হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে, তুমি কি সেই জাহান্নামীকে মুক্তি দিতে পারবে?' (আয়াত-১৯)

এখানে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি যদি তাদের আগুন থেকে মুক্ত করতে না পারেন তাহলে আর কে পারবে?

এদের দোযখে অবস্থানের দৃশ্য তুলে ধরার পর পরই দেখানো হয়েছে আল্লাহভীরু মোমেনদের জান্নাতে অবস্থানের দৃশ্য,

'কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদের জন্যে থাকবে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ.... '(আয়াত-২০)

প্রাসাদগুলো এমনভাবে নির্মিত হবে যে, তার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে এবং ওপরে থাকবে আরো বহু প্রাসাদ। এ দৃশ্যটা হলো জাহান্নামের দৃশ্যের ঠিক বিপরীত। সেখানেও নীচে রাশি রাশি আগুন এবং ওপরে রাশি রাশি আগুন। পরস্পর বিরোধী দৃশ্য তুলে ধরার এই রীতি কোরআনের বাচনভংগির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

যে মুসলমানদের কাছে কোরআন প্রথম এসেছিলো, তারা এ সকল দৃশ্যকে দূর ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি বা হুমকি নয়, বরং বর্তমানের বাস্তব ঘটনা হিসেবে দেখতেন। তারা এগুলো দেখতেন, অনুভব করতেন, প্রভাবিত হতেন, শিহরিত হতেন এবং সাড়া দিতেন। এ কারণেই তাদের ভেতরে এমন সর্বাত্মক পরিবর্তন আসতো এবং তাদের ইহকালীন জীবন পরকালীন বাস্তবতার আলোকে গড়ে ওঠতো। কেননা ইহকালীন জীবনেই তারা পরকালীন জীবনের বাস্তবতা অনুভব করতো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক মুসলমানের এভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

২১. (হে মানুষ,) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি যে, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তিনিই তা যমীনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করান, পরে তিনিই (আবার) তা দিয়ে (যমীন থেকে) রং বেরংয়ের ফসল বের করে আনেন, (কিছুদিন) পরে তা (আবার) শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের (ফসল হিসেবে) দেখতে পাও, অতপর তিনিই তাকে আবার খড় কুটায় পরিণত করেন; অবশ্যই এতে (এ নিয়মের মধ্যে) জ্ঞানবানদের জন্যে (বড়ো রকমের) উপদেশ রয়েছে।

রুকু ৩

২২. অতপর (তুমি বলো, হে নবী,) যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) একটি (হেদায়াতের) নূরের ওপর রয়েছে; দুর্ভোগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে; (মূলত) এরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। ২৩. আল্লাহ তায়ালা সর্বোৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন (উৎকৃষ্ট) কেতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল, অভিন্ন (যেখানে আল্লাহর ওয়াদাগুলো বার বার পেশ করা হয়েছে), যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ (কেতাব শোনার) ফলে তাদের চামড়া (ও শরীর) কেঁপে ওঠে, অতপর তাদের দেহ ও মন বিগলিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এ (কেতাব) হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার আসলেই কোনো পথপ্রদর্শক নেই। ২৪. যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখের দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মতো হবে যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, সেদিন) যালেমদের বলা হবে, তোমরা (দুনিয়ায়) যা কামাই করেছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো!

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۖ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৫. তাদের আগের লোকেরাও (নবীদের ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছে, আর এমন দিক থেকে (আল্লাহ্ তায়ালার) আযাব তাদের ওপর এসে তাদের গ্রাস করলো যে, তারা টেরই পায়নি। ২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানিত করলেন, (তাদের জন্যে) আখেরাতের আযাব হবে (আরো) গুরুতর। (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো! ২৭. আমি এ কোরআনে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে (ছোটো বড়ো) সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, ২৮. এ কোরআন (আমি বিশুদ্ধ) আরবী ভাষায় (নাযিল করেছি), এতে কোনো জটিলতা নেই, (এর উদ্দেশ্য) যেন তারা (আল্লাহ্ তায়ালার না-ফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে। ২৯. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বোঝার জন্যে) একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, (উদাহরণটি হচ্ছে দু'জন মানুষের, এদের) একজন মানুষ (হচ্ছে গোলাম), যার বেশ ক'জন মালিক রয়েছে– যারা (আবার) পরস্পর বিরোধী (প্রত্যেকেই গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে), আরেক ব্যক্তি, যে কেবল একজনেরই (গোলাম); তুমিই বলো (হে নবী), এ দু'জন গোলাম কি এক সমান হবে? (না, কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

তাফসীর

আয়াত ২১-২৯

সূরার এ অংশে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামার পর পৃথিবীর উদ্ভিদ ও তরুলতার কী অবস্থা হয় এবং কিভাবে তা পার্থিব জীবনের শেষ পরিণতিতে পৌঁছে যায়, তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝানোর জন্যে অনেক সময় এটাকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিবেকবান লোকদের এ উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেও বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে আকাশ থেকে কেতাব ও ওহী নাযিল হওয়ার দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। সেই সাথে এই কিতাবের প্রতি যাদের অন্তর উন্মুক্ত, তাদের অন্তরের সাড়াদানের বিষয়টাও চিত্রিত করে দেখানো

হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, কত ভয় ভীতি শিহরণ, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে তাদের অন্তর এই কেতাবের প্রতি সাড়া দেয়। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর কেতাবকে মেনে নেয় এবং যারা পাষাণ হৃদয় হওয়ার কারণে মেনে নেয় না, এই উভয় গোষ্ঠীর পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। সবার শেষে তাওহীদ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক আল্লাহর এবাদাতকারী ও একাধিক উপাস্যের উপাসকের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এই উভয় গোষ্ঠী এক সমান নয় এবং তাদের অবস্থাও এক রকম নয়। অনুরূপ যে দাস একাধিক মালিকের অধীন এবং যে দাস একজনমাত্র মালিকের অধীন ও অধিষ্ঠিত, এই দু'জন দাসও সমান নয়।

'তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন ....।' (আয়াত-২২)

বৃষ্টির পানি ও মাঠের ফসল সবই আল্লাহর কুদরত

এখানে যে বিষয়টার প্রতি কোরআন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং চিন্তাভাবনা করার আহবান জানিয়েছে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বার বার সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে এটাকে আর নতুন কিছু মনে হয় না এবং এর প্রতি কারো তেমন কৌতূহল থাকে না। তথাপি কোরআন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হাত সক্রিয় থাকা ও তার ফলশ্রুতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আকাশ থেকে বর্ষিত এই পানি আসলে কী এবং কিভাবে বর্ষে? বার বার দেখার কারণে এর সাথে আমরা এত পরিচিত হয়ে গেছি যে, এর প্রতি আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া ও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করি না; বরং ব্যাপারটা এক নযর দেখেই তাড়াতাড়ি নিজের কাজে চলে যাই। আসলে পানির সৃষ্টিই একটা অলৌকিক ঘটনা। আমরা যদিও জানি, নির্দিষ্ট পরিবেশে দুই বিন্দু হাইড্রোজেনের সাথে এক বিন্দু অক্সিজেন মিলিত হলেই পানির সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই তথ্য আমাদের মনকে সচকিত করে দেয় যেন আমরা এই জিনিসটার সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর হাত সক্রিয় দেখি। আল্লাহর হাত এই সমগ্র বিশ্বজগত এমনভাবে সৃষ্টি করেছে যে, এখানে ঠিক প্রয়োজনীয় পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং এগুলোর মিলিত হওয়া ও মিলিত হওয়ার মাধ্যমে পানি সৃষ্টি হওয়ার অনুকূল পরিবেশও বিরাজ করে। এ কারণেই পৃথিবীতে পানি যদি না থাকতো তাহলে জীবনের অস্তিত্বও থাকতো না। এভাবে আসলে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রথমে পানি ও তারপর জীবনের উদ্ভব ঘটেছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে রয়েছেন মহান আল্লাহ। আর এর প্রতিটা ধাপ ও প্রতিটা জিনিস আল্লাহর তৈরী। তারপর পানির সৃষ্টি হওয়ার পর তা যেভাবে পৃথিবীতে নামে, সেটা আরেকটা আলৌকিক ব্যাপার। পৃথিবী ও প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টিই করা হয়েছে এমনভাবে যে, আল্লাহর ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পানির উৎপত্তি ও তার বর্ষণ সম্ভব হয়।

এরপর পানি আকাশ থেকে নামার পরবর্তী সময়ে যে কাজটা সম্পন্ন হয়, তা হলো.

'তারপর সেই পানিকে তিনি জলাশয়গুলোতে নিয়ে যান।' এই জলাশয় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠস্থ নদীনালা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস উভয়ই বুঝানো হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি চুইয়ে চুইয়ে ধীরে ধীরে ভূগর্ভে গিয়ে সংরক্ষিত হয়। তারপর পুনরায় তা ঝর্ণা ও পুকুরের আকারে বেরিয়ে আসে। আল্লাহর হাত এই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভূগর্ভের এতো তলদেশে যেতে দেয় না যেখান থেকে তা আর বেরিয়ে আসবে না।

'অতপর তা দ্বারা নানা রকমের ফসল ফলান।'

বৃষ্টির পানি থেকে যে উদ্ভিদ-জীবনের উন্মেষ ঘটে, সেটাও একটা অলৌকিক ব্যাপার। এর ভেতরে মানুষের চেষ্টা তদবীরের কোনোই হাত থাকে না। ক্ষুদ্র একটা চারাগাছ তার ওপর থেকে মাটির আবরণ ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং বিপুল পরিমাণ মাটির ভারী বোঝা সরিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে আলো বাতাসপূর্ণ মুক্ত দিগন্তে মাথা তোলে। তারপর সে ধীরে ধীরে শূন্যের দিকে ওঠতে থাকে। এ দৃশ্য দেখলেই যে কোনো মানুষের মুক্ত মন আল্লাহর স্মরণে সোচ্চার হয়ে ওঠতে পারে। প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও পথপ্রদর্শক মহান আল্লাহর অনুভূতি ও চেতনা সেখানে জেগে ওঠতে পারে। একই জমিতে কত রকমারি উদ্ভিদ জন্মে। আবার একই উদ্ভিদে এবং একই ফুলে কত রংয়ের সমারোহ ঘটে। এটা আসলে সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতার প্রতীক আর একই সাথে মানুষ যে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তারও অকাট্য প্রমাণ।

এই বাড়ন্ত, অপরিপক্ক, কোমল ও কচি চারাটি পূর্ণতা লাভ করে এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পর তা ভিন্নরূপ ধারণ করে। বলা হয়েছে,

'ফলে তোমরা তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও।'

অর্থাৎ চারাটি এখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে যা সৃষ্টির বিধানে, জগতের নিয়মে এবং জীবনের বিবর্তনে একই ধারায় নির্ধারিত করা আছে। তাই এখন সেটা কাটার উপযুক্ত হয়েছে। এরপর আসছে আর একটি স্তর। তা হলো, 'এরপর তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন।' কারণ এখন এর সময় ফুরিয়ে এসেছে, এর কার্যকারিতা শেষ হয়েছে এবং জীবনদাতা তার জন্যে যে কালচক্র নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেটাও থমকে গেছে। এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের চিন্তা ভাবনা করা এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। তাই বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।'

'আল্লাহ তায়ালা যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন......।' (আয়াত ২২-২৩)

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে যেরূপ বৃক্ষ তরুলতা ও ফলমূল উৎপন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ আকাশ থেকে ঐশীবাণী প্রেরিত হয়, যার স্পর্শ পেলে হৃদয় সজীবতা লাভ করে, উন্মুক্ত হয় এবং স্পন্দিত হয়, কিন্তু কঠিন হৃদয়ে এর কোনো প্রভাবই পড়ে না, যেমন প্রভাব পড়ে না কঠিন পাথরের ওপর। কারণ পাথরে জীবনের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কোনো কোমলতা নেই।

যেসব হৃদয়ের মাঝে সত্য ও মঙ্গল গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা আছে বলে আল্লাহ তায়ালা জানেন কেবল সে হৃদয়কেই তিনি ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, তাঁর আলোর সাথে সংযুক্ত করে দেন, ফলে সেসব হৃদয় তাঁর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই এসব হৃদয়ের মাঝে এবং অন্যান্য কঠিন হৃদয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য ও দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।'

আলোচ্য আয়াতে সেসব হৃদয়ের গুণাগুণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে যা ইসলাম গ্রহণ করার উপযুক্ত। কেবল সেসব হৃদয়ই ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত হয়। কারণ, এসব হৃদয় আল্লাহর নূর থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর কাছ থেকেই জীবন ও সজীবতা লাভ করে। অপরদিকে কঠিন হৃদয়ের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। এসব হৃদয় হয় কঠিন শুষ্ক, মৃত ও আলোশূন্য। কাজেই দু'ধরনের হৃদয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে মোমেনদের হৃদয় এই কোরআন কিভাবে গ্রহণ করে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই কোরআন হচ্ছে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যার প্রকৃতিতে কোনো অসংগতি নেই, যার

দিকনির্দেশনায় কোনো অসংগতি নেই, যার মূল বক্তব্যে কোনো অসংগতি নেই এবং যার বৈশিষ্ট্যের মাঝে কোনো গরমিল নেই। এর ঘটনাগুলো বার বার বর্ণিত হয়েছে। এর নির্দেশাবলী বার বার বর্ণিত হয়েছে। এর দৃশ্যগুলো বার বার চিত্রায়িত হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও এতে আদৌ কোনো বিরোধ নেই, কোনো অসংগতি নেই। বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে অত্যন্ত সুচারুরূপে ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভংগিতে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, যারা সতর্কভাবে জীবন যাপন করে, যারা আল্লাহর ব্যাপারে আশা পোষণ করে, তারা এই মহান বাণী গ্রহণ করতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে ওঠে, এক অব্যক্ত ও প্রচন্ড প্রভাবের ফলে তাদের পশম খাড়া হয়ে ওঠে। এরপর তাদের আত্মা শান্ত হয়ে যায়, তাদের মন এই বাণীর সাথে পরিচিত হয়। ফলে তাদের দেহ-মন ভরে ওঠে অনাবিল প্রশান্তি ও বিনম্রতায়।

এই জীবন্ত ও সংবেদনশীল দৃশ্যটি শব্দের মাধ্যমে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে যেন তাতে একটা গতির সঞ্চার হয়েছে। দেহ ও মনের এই অবস্থা কেন এমন হয়, সেদিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।'

অর্থাৎ সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যখন আল্লাহর কুদরতী হাত মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয় তখনই তাতে স্পন্দন জাগে, তাতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পথভ্রষ্টদের ব্যাপারে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন– তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'

অর্থাৎ তিনি যাদের সম্বন্ধে জানেন যে, এরা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করবে না; বরং পথভ্রষ্টতার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকবে, কেবল তাদেরই তিনি সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত রাখেন। পরকালে এদের পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে.........।' (আয়াত ২৪)

মানুষ সাধারণত দু'হাত দিয়ে নিজের চেহারা ও দেহকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু সে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে এই হাত দিয়েও রক্ষা করতে পারবে না, আর পা দিয়েও রক্ষা করতে পারবে না। ফলে সেদিন তাকে চেহারার সাহায্যেই সে আগুন ঠেকাতে হবে এবং নিজেকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। কি ভয়ানক দৃশ্য, কি মর্মান্তিক শাস্তি! এই কঠিন মুহূর্তে আবার তাকে শুনতে হবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনাপূর্ণ মন্তব্য। তাকে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন করো।'

এই দৃশ্য বর্ণনা করার পর এখন প্রসংগ চলে যাচ্ছে কাফের মোশরেকদের আলোচনার দিকে, যারা রসূলুল্লাহ (স.) এর মুখোমুখি হতো, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতো। এদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী আল্লাহদ্রোহী লোকদের পরিণতি কি হয়েছিলো তা তুলে ধরা হচ্ছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে,

'তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিলো, ফলে তাদের কাছে.............।' (আয়াত ২৫)

এই হচ্ছে কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা। দুনিয়াতে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর পরকালে রয়েছে মহা শাস্তি। আল্লাহর শাস্তির এই বিধান চিরকালই চলতে থাকবে। এতে কোনো ব্যতিক্রম হবে না। অতীতের জাতিগুলোর করুণ পরিণতি এর জ্বলন্ত সাক্ষী। ওদিকে পরকালের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর সতর্কবাণী এখনও বহাল রয়েছে। তাই এখনও পূর্ণাংগ সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের সংশোধন হওয়া উচিত, উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যদি তাদের মাঝে বিবেক বুদ্ধি বলতে কিছু থেকে থাকে।

'আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি.........।' (আয়াত ২৭-২৯)

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাওহীদবাদী বান্দা ও শেরেকবাদী বান্দার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছেন। শেরেকবাদী বান্দার দৃষ্টান্ত সেই ক্রীতদাসের ন্যায় যার রয়েছে একাধিক মালিক বা প্রভু। এ সকল প্রভু তাকে নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকে। তার ওপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, মালিকানা রয়েছে। ফলে তাকে প্রত্যেকের কথাই শুনতে হয়, প্রত্যেকের নির্দেশই মানতে হয়, প্রত্যেকের দেয়া দায়িত্বই পালন করতে হয়। এসব করতে গিয়ে সে খেই হারিয়ে ফেলে, দিশাহারা হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না সে কোন দিকে যাবে, কার কথা শুনবে। তাদের সবাইকে এক সঙ্গে খুশী করা এবং প্রত্যেকের পরস্পর বিরোধী মানোবাঞ্ছা পূরণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তার জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। অপরদিকে তাওহীদবাদী বান্দার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ক্রীতদাসের ন্যায়, যার মালিক মাত্র একজন। এই একজন মালিকের নির্দেশ পালন করতে তার জন্যে কোনো সমস্যা হয় না। কারণ, মালিক তাকে এককভাবে নির্দেশ করে আর সে এককভাবেই তা পালন করে। ফলে সে সুখ শান্তিতে এক অবস্থার ওপরই টিকে থাকে। তাই প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?' না, কখনও সমান হতে পারে না। কারণ এক প্রভুর অধীনে যে কাজ করে সে শান্তিতে থাকে, প্রভুর চাহিদা জানতে পারে। তার চলার পথ থাকে সরল ও স্পষ্ট, কিন্তু যে একাধিক ঝগড়াটে প্রভুর অধীনে কাজ করে সে সারাক্ষণ মানসিক যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তায় ভোগে, অস্থিরতায় ভোগে। ফলে সে সবাইকে সন্তুষ্ট করবে তো দূরের কথা, একজনকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না।

এই উপমার মধ্য দিয়ে তাওহীদ ও শেরকের বাস্তবতা এবং প্রকৃতি ফুটে ওঠেছে। তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী মন এই পৃথিবীর বুকে তার চলার পথ সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই সম্পন্ন করে। কারণ এই চলার পথে সরাক্ষণ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দিগন্তে উদ্ভাসিত কেবল একটি নক্ষত্রের ওপর। তাই সে পথ হারায় না। তাছাড়া সে ভালো করেই জানে, জীবন জীবিকা ও শক্তি ক্ষমতার উৎস এক, লাভ ক্ষতির উৎস এক, দেয়া ও না দেয়ার মালিক এক, তাই এই একক ও অভিন্ন উৎসের পানেই সে ধাবিত থাকে, তার কাছ থেকেই সে শক্তি আহরণ করে এবং একমাত্র তার ওপরই নির্ভর করে। এর ফলে তার লক্ষ্য থাকে এক ও নির্দিষ্ট। সে লক্ষ্য থেকে সে একবিন্দুও বিচ্যুত হয় না। সে যেহেতু একক মালিক প্রভুর আনুগত্য দাসত্ব করে, তাই মালিকের মর্জি ও চাহিদা তার জানা থাকে আর সে অনুযায়ী সে কাজ করে। যা করলে মালিক সন্তুষ্ট হয় সে তাই করে আর যা করলে মালিক অসন্তুষ্ট হবে, রুষ্ট হবে সে তা পরিহার করে। এভাবেই সে পৃথিবীর বুকে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে এক আল্লাহর পানে তাকিয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে এবং নিজের দক্ষতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে।

এই দৃষ্টান্ত পেশ করার পর যে মন্তব্য এসেছে তাতে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, তিনি নিজ বান্দাদের জন্যে সুখ, শান্তি, পরিতুষ্টি, স্থিরতা ও স্থিতিশীলতার পথ নির্বাচিত করেছেন। এ সত্তেও তারা বিপথগামী হয়। কারণ তাদের অধিকাংশই বির্বোধ ও অজ্ঞ।

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন মানুষকে উপদেশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই কোরআনের ভাষা হচ্ছে আরবী, এতে কোনো জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই এবং কোনো বক্রতা নেই। যুক্তির মাধ্যমে এবং বোধগম্য ভাষায় মানুষের সামনে তার বক্তব্য তুলে ধরে।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩০. অবশ্যই (একদিন) তুমি মারা যাবে– তারাও নিসন্দেহে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, ৩১. অতপর (নিজেদের কাজের জন্যে একে অপরকে দায়ী করে) তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের মালিকের সামনে বাকবিতন্ডা করতে থাকবে।

রুকু ৪

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য (দ্বীন) এসে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমন সব কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে (হওয়া উচিত) নয়? ৩৩. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, ওদের (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হবে। ৩৪. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে সেসব কিছুই থাকবে যা তারা (পেতে) চাইবে; (মূলত) এটা হচ্ছে সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার,

তাফসীর

আয়াত ৩০-৩৫

'নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে.................।' (আয়াত ৩০-৩৫)

এই অংশটুকু পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর উপসংহার হিসেবে এসেছে। প্রথমে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে। এরপর বৃষ্টির পানির দ্বারা শস্য উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর আল্লাহর কাছ থেকে ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর পবিত্র কোরআনে কি কি উপমা বর্ণনা করা হয় সে কথা বলা হয়েছে। এসব কথার পর বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিষয় এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিষয় আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত থাকবে। তিনিই মৃত্যুর পর তাদের বিচার করবেন। সে বিচারে তিনি অবিশ্বাসী ও মিথ্যাবাদীদের প্রাপ্য সাজায় দন্ডিত করবেন এবং বিশ্বাসী ও সত্যবাদীদের পুরস্কৃত করবেন।

'নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে'..... অর্থাৎ মৃত্যুই হচ্ছে সকল প্রাণীর শেষ পরিণতি। অমরত্বের গুণে কেবল আল্লাহই ভূষিত। মৃত্যুর ক্ষেত্রে সকল মানব সমান। রসূলও

একজন মানব। কাজেই তাঁর বেলায়ও মৃত্যু একটা অভিন্ন সত্য। এরপর দ্বিতীয় যে সত্যটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হলো, মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জীবনযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার চলার পথ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না; বরং তার সামনে রয়েছে পরকালীন জীবনের দীর্ঘ পথ। এই দীর্ঘ পথের সূচনা হচ্ছে মৃত্যু। পরকালে মানুষ যখন পরস্পরের সাথে বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন রসূলুল্লাহ (স.) সেখানে এসে উপস্থিত হবেন এবং নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবেন এবং জীবদ্দশায় তারা তাঁকে কি বলেছিলো, তাঁর সাথে কি আচরণ করেছিলো, আল্লাহর দেখানো সত্য পথ কিভাবে ত্যাগ করেছিলো, এসব বিষয়ে বিচার দাবী করবেন।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে...................।' (আয়াত ৩২)

আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নবোধক বক্তব্যটি অজানা বিষয়কে জানার জন্যে নয়; বরং জানা বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এসেছে। কারণ সবাই জানে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা বলে, তাদের চেয়ে অত্যাচারী আর কেউ নয়। তারা মনে করে আল্লাহর কন্যা আছে, তাঁর শরীক আছে। তাছাড়া তারা রসূলকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর সত্য বাণী অস্বীকার করেছে। তারা একত্ববাদ বা তাওহীদ বিশ্বাস করেনি। আর এটাই হচ্ছে কুফ্র। এই কুফরী মতবাদের যারা ধারক তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে। মোট কথা, প্রশ্ন আকারে বক্তব্যটি পেশ করে মূল বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে, আরও দৃঢ় করা হয়েছে। বিবাদের এক পক্ষ হচ্ছে এই অবিশ্বাসী ও যালেমদের দল। আর অপর পক্ষ হচ্ছে স্বয়ং সেই মহান আত্মা, যিনি আল্লাহর কাছ থেকে সত্য বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি সেই সত্য বাণী স্বীকার করে নিয়ে তার প্রচার করেছেন এবং তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছেন। এই গুণের অধিকারী হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (স.) এবং অন্যান্য সকল নবী-রসূলরা। এই গুণের অংশীদার তারাও যারা সত্যকে বিশ্বাস করবে এবং সত্যকে সত্য বলে বুঝে ও জেনে তার প্রচার করবে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের কথায় ও কাজে এই সত্যের প্রতিফলন ঘটতে হবে। এদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহভীরু।' এদের জন্যে কি পুরস্কার রয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে, এটা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।' (আয়াত ৩৪)

এটা ব্যাপক অর্থবোধক একটা বাক্য। এর দ্বারা মোমেনদের মনের সকল কামনা বাসনা ও আশা আকাংখার কথাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের পালনর্কতার কাছে তাদের জন্যে রয়েছে.................।' অর্থাৎ সেগুলো তাদের প্রাপ্য অধিকার। এই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে না; বরং তাদের এই অধিকারের অতিরিক্ত আরও দেয়া হবে। তাদের প্রতি আরও সম্মান ও কৃপা প্রদর্শন করা হবে। বলা হয়েছে,

'যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মন্দ কাজসমূহ মার্জনা করেন এবং উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদের দান করেন।' (আয়াত ৩৫)

ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হচ্ছে, সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের পুরোপুরি হিসাব-নিকাশ করে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া। আর দয়া ও করুণার দাবী হচ্ছে, সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়ে কেবল পুণ্যের হিসাব-নিকাশ নিয়ে বান্দাকে পুরস্কৃত করা। এর ফলে তার পুণ্যের পাল্লাই ভারী হবে এবং তার পুরস্কারও হবে সর্বোত্তম। এই দয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে কোনো বান্দার সাথে করতে পারেন, এটা তিনি ওয়াদা করে রেখেছেন। এটা হবেই। তাই এই ওয়াদার ব্যাপারে আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বান্দারা আশ্বস্ত।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

৩৫. কেননা, এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালা তা মিটিয়ে দেবেন এবং তাদের ভালো কাজসমূহের জন্যে তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। ৩৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দা (মোহাম্মদের হেফাযত)-এর জন্যে যথেষ্ট নন? (হে নবী,) এরা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়; আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার (আসলে) কোনোই পথপ্রদর্শক নেই, ৩৭. আবার যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা কি পরাক্রমশালী ও কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সত্তা) নন? ৩৮. (হে নবী,) যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আকাশমালা ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, সাথে সাথেই ওরা বলবে, আল্লাহ তায়ালাই (এসব সৃষ্টি করেছেন); এবার তাদের তুমি বলো, তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার ওপর (তাঁর) অনুগ্রহ করতে চান, (তাহলে) এরা তাঁর সে অনুগ্রহ কি রোধ করতে পারবে? (হে নবী,) তুমি বলো, আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত। ৩৯. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও, আমিও (আমার জায়গায়) কাজ করে যাচ্ছি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, ৪০. কার ওপর (দুনিয়ায়) অপমানকর আযাব আসবে এবং (আখেরাতেই বা) কার ওপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে! ৪১. (হে নবী,) আমি মানুষের জন্যে তোমার ওপর সত্য (দ্বীন)-সহ এ কেতাব নাযিল করেছি, অতপর যে কেউ হেদায়াত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায়, তার এ গোমরাহীর ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে, আর তুমি তো তাদের ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও!

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۗ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ

রুকু ৫

৪২. আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি (তখন) তাদেরও (রূহ) বের করেন, অতপর যার ওপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণ তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রূহ)-দের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন; এর (গোটা ব্যবস্থাপনার) মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে। ৪৩. তবে কি এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সুপারিশকারী (হিসেবে) গ্রহণ করেছে? (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে। ৪৪. বলো (হে নবী), যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অতপর তোমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। ৪৫. যখন তাদের কাছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে যখন আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্য (দেবতা)-গুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। ৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আল্লাহ, (হে) আসমান যমীনের স্রষ্টা, (হে) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দাও, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে। ৪৭. যদি এ যালেমদের কাছে সেসব (সম্পদ) মজুদ থাকে, যা এ পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে, তার

لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ

يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝٤٧ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا

بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٤٨ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۡ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٩

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٥٠

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۚ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ

سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٥١ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٥٢

সাথে সমপরিমাণ (সম্পদ) আরো যদি তার কাছে থাকে, কেয়ামতের দিন আযাবের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছু (বিনা দ্বিধায়) দিয়ে দিতে চাইবে; সে সময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সে (আযাব) এসে উপস্থিত হবে, যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি। ৪৮. এরা (যেভাবে) আমল করতে থাকবে, আস্তে আস্তে (সেভাবে) তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে, যে (আযাবের প্রতি) এরা হাসি বিদ্রূপ করতো তা তাদের (আমলের মতোই) তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে। ৪৯. মানুষদের (অবস্থা হচ্ছে,) যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের (যোগ্যতার) ওপরই দেয়া হয়েছে, না (আসলে তা নয়); বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। ৫০. এদের আগের লোকেরাও অবশ্য এ ধরনের (কথাবার্তা) বলতো, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি। ৫১. যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই; এদের মধ্যে যারা যুলুম করে তারাও (একদিন) তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে, এরা কখনো (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না। ৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্যে চান তার জন্যে তা) সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদার লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

তাফসীর

আয়াত ৩৬-৫২

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? ....।' (আয়াত ৩৬-৫২)

আলোচ্য সূরার এই বিরাট পর্বটিতে তাওহীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র বর্ণনাভংগিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই বিশ্বাসী মনের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর নানা শক্তির প্রতি এই বিশ্বাসী মনের আচরণ কি তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে বলা হয়েছে, বিশ্বাসী মন কেবল এক মহাশক্তির ওপরই ভরসা করে, অন্য কোনো দুর্বল শক্তি বা কাল্পনিক শক্তির ওপর নয়। যারা এসব কাল্পনিক শক্তির পূজারী তাদের বিষয়টি পরকালের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজের আদর্শের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর মূল দায়িত্বের কথা। সেই পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হেদায়াত বা গোমরাহীর ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত নেই; বরং মানুষের সর্বময় বিষয়ের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সর্বাবস্থায় তিনিই তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, শাসন করেন। তিনি ব্যতীত বান্দার জন্যে সুপারিশ গ্রহণকারী আর অন্য কেউ নেই। কারণ, যাবতীয় সুপারিশের মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর হাতেই আসমান ও যমীনের মালিকানা। তিনিই হচ্ছেন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।

এরপর মোশরেকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাওহীদের বাণী কানে আসলেই তাদের মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। আর শেরেকের কথা শুনলে তাদের মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তাই রসূলকে এদের বিচারের ভার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরকালে মোশরেকদের অবস্থা কি হবে সে ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা গোটা পৃথিবী বা তার চেয়েও বড় কিছু মুক্তিপণ হিসেবে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

এরপর বলা হয়েছে যে, মোশরেকরা কেবল বিপদে পড়লেই এককভাবে আল্লাহকে ডাকে। আর যখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, আরাম আয়েশে থাকে তখন বড় বড় দাবী করতে থাকে। যেমন এদের কেউ কেউ বলে, এগুলো আমার নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ফলস্বরূপ। এসব কথাবার্তা ইতিপূর্বে যারা বলেছিলো তাদের আল্লাহ তায়ালা যেভাবে পাকড়াও কারেছেন ঠিক একইভাবে এদেরও পাকড়াও করতে পারবেন। এটা তার জন্যে মোটেও কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তাছাড়া জীবিকার প্রাচুর্য ও স্বল্পতা আল্লাহরই নির্ধারিত বিধানের অধীন। এই বিধান তাঁরই ইচ্ছায় চলে, তাঁরই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী চলে। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মালিক একমাত্র তিনিই। তাই বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (আয়াত ৫২)

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?' (আয়াত ৩১-৪০)

এই চারটি আয়াতে সঠিক ঈমানের ভাষাকে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই ভাষা সহজ ও শক্তিশালী, এই ভাষা সুস্পষ্ট ও গভীর। এই সঠিক ঈমান রসূলুল্লাহ (স.) নিজ অন্তরে যেভাবে পোষণ করতেন ঠিক সেভাবেই পোষণ করতে হবে তাঁর রেসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মোমেনকে এবং প্রত্যেক প্রচারককে। কারণ এই রেসালাতই হচ্ছে তার একমাত্র জীবন বিধান। এটাই তার জন্যে যথেষ্ট। অন্য কোনো আদর্শ বা বিধানের তার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ জীবনে চলার পথে এই বিধানই হচ্ছে তার পথপ্রদর্শক।

রসূল (স.)-কে দেব দেবীর অভিশাপের ভয় প্রদর্শন

আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোরায়শ বংশের মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাদের দেব-দেবীর অভিশাপের ভয় দেখাতো। তারা বলতো, তিনি যদি এদের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ না করেন তাহলে অচিরেই বিপদের সম্মুখীন হবেন।

কিন্তু আয়াতের বক্তব্য এর তুলনায় আরও ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ। এখানে সত্যের প্রচারক ও গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধবাদী শক্তির মধ্যকার চিরন্তন লড়াই দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে এসব শক্তির প্রকৃত রূপ প্রকাশ করার পর মোমেনদের মনে কি ধরনের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রশান্তির সৃষ্টি হয় সে চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালাই কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?' নিশ্চয়ই। তাহলে ভয়ের কি আছে? আল্লাহ তায়ালা তো তার সাথেই রয়েছেন। যদি বান্দা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করে তাহলে তিনিই যে তার হেফাযতের জন্যে যথেষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহের কি আছে। কারণ তিনিই তো মহাশক্তিধর, পরম ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল বান্দার ওপর তাঁরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এরপর বলা হয়েছে, 'অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়...... কিন্তু তিনি এদের কেন ভয় করবেন?' স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাকে পাহারা দিয়ে রাখছেন, নিরাপত্তা দিয়ে রাখছেন তাকে ভয় দেখানোর মতো শক্তি কি কোনো দেব-দেবীর আছে? এই গোটা পৃথিবীর বুকে যারা বিচরণ করছে তারা কি আল্লাহর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য নয়? এটা একটা সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয়। এটা প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি তর্কের প্রয়োজন নেই এবং মাথা ঘামানোরও কোনো প্রয়োজন নেই। সোজা কথা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরম শক্তিশালী। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। এই সত্যটি যখন কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে তখন কোনো সন্দেহ থাকবে না, কোনো সংশয় থাকবে না।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়, তাঁর ইচ্ছাই জয়ী হয়। তিনিই বান্দার ফয়সালা করেন। তাঁর এই ফয়সালা বান্দার দেহ-মন এবং চিন্তা চেতনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। তাই বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই।' (আয়াত ৩৬-৩৭)

কারণ তিনিই জানেন, কে হেদায়াতের উপযুক্ত, ফলে তাকে হেদায়াত দান করেন। তেমনি তিনিই জানেন কারা গোমরাহীর পাত্র, ফলে তিনি তাদের গোমরাহ করেন। তাঁর এই ফয়সালা পাল্টানোর ক্ষমতা কারো নেই। কারণ 'আল্লাহ তায়ালা কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?' হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। যার যা প্রাপ্য তিনি তাকে তা দান করেন। যারা প্রতিশোধের উপযুক্ত তাদের কাছ থেকে তিনি প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। কাজেই যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বান্দা তাদের ভয়ের কি আছে?

কারণ আল্লাহ তায়ালাই তো তাদের রক্ষক এবং তিনিই তো তাদের জন্যে যথেষ্ট।

আল্লাহর সত্যিকার পরিচয় যে মোশরেকরাও স্বীকার করে সেটা তাদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণ করার জন্যে বলা হয়েছে, 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ ....।' (আয়াত ৩৮)

আসমান যমীনের স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মোশরেকরা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এর স্রষ্টা। তাদের স্বভাব, ধর্ম ও বিবেক বুদ্ধি এ স্বীকারোক্তি করতে তাদের বাধ্য করতো। শুধু তারাই নয়; বরং যে কোনো বিবেকবান বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই স্বাভাবিক সত্যটি স্বীকার না করে পারবে না। যদি আল্লাহ তায়ালাই এই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যদি তাঁর কোনো বান্দার ক্ষতি সাধন করতে চান অথবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে অন্য কোনো শক্তি কি আছে এতে বাধা দিতে পারে?

এর সাফ সাফ উত্তর হচ্ছে, না, যদি তাই হয়, তাহলে সত্যের ধারক বাহকদের ভয় কিসের? আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের ভয়ের আর কে আছে? আল্লাহ ছাড়া তাদের আশার স্থল কে আছে? কারণ, তিনি ব্যতীত লাভ-লোকসান ও মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক অন্য কেউ তো নেই। তাহলে চিন্তার কি আছে? ভয়ের কি আছে? আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার কে আছে?

এই সত্যটি যখন মোমেন বান্দার হৃদয়ে গেঁথে যাবে তখন তার সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। তখন সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা করবে না; বরং একমাত্র তাঁকেই পরম মনে করবে এবং তাঁর ওপরই ভরসা করবে। তাই বলা হয়েছে, 'বলো, আমার পক্ষে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, নির্ভরকারীরা তাঁরই ওপর নির্ভর করে।'

এই ঘোষণার পর মনে আসবে শান্তি, আস্থা ও দৃঢ় প্রত্যয়। নির্ভয় শান্তি, নিরুদ্বেগ আস্থা এবং অবিচল প্রত্যয়– এই প্রত্যয় নিয়েই সে তার চলার পথে ধাবিত হতে পারবে। বলা হয়েছে, 'বলো, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করো, আমিও কাজ করছি..........।' (আয়াত ৩৯-৪০)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মত ও পথ অনুসারে কাজ করো, আর আমি আমার মত ও পথ অনুসারে কাজ করবো, এই পথ হতে আমি বিচ্যুত হবো না, কাউকে ভয় করবো না এবং কোনো উৎকণ্ঠায়ও ভুগব না। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, পৃথিবীর বুকে কাদের ওপর অপমানজনক শাস্তি নেমে আসছে এবং পরকালে কারা জাহান্নামের আগুনে বসবাস করবে।

স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমান যমীনের স্রষ্টা, আসমান ও যমীনে তিনিই কতৃত্বশীল। যে বাণীর প্রচার নবী রসূলরা করেছেন এবং উম্মতের অন্যান্য লোকজন করছেন সেই বাণীর উৎস তিনি নিজেই। তাহলে আসমান ও যমীনে এমন কেউ আছে কি যে, আল্লাহর সেসব বান্দার উপকার করার কোনো শক্তি রাখে অথবা তাদের কোনো ক্ষতি দূর করতে পারে। অথবা তাদের কোনো মঙ্গল কাজে বাধা দিতে পারে? যদি এমন কেউ না থেকে থাকে, তাহলে গায়রুল্লাহর কাছে আশা করারই বা কি আছে?

সাবধান! বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, পথও নির্ধারিত হয়ে গেছে। এখন আর তর্ক-বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই, কোনো অবকাশ নেই।

এই হচ্ছে আল্লাহর নবী রসূলরা ও তাদের বিরুদ্ধবাদী সকল শক্তির প্রকৃত অবস্থা। এখন তাঁদের দায়িত্ব কি হবে এবং অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে তাঁদের নীতি কি হবে সে সম্পর্কে কেতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণের জন্যে...........। (আয়াত ৪১-৪৪)

আলোচ্য আয়াতে সত্য ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ এ ধর্ম প্রকৃতিগত দিক থেকে সত্য, আদর্শগত দিক থেকে সত্য এবং বিধানগত দিক থেকে সত্য। এ হচ্ছে সেই সত্য যার ওপর নির্ভর করছে আসমান ও যমীন। এ হচ্ছে সেই সত্য যা মানুষের হেদায়াতের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে,

এর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর এই সত্যের প্রচারক হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)। এখন যার ইচ্ছা হেদায়াত গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা বিপথে পরিচালিত হোক, যার ইচ্ছা জান্নাত বেছে নিক আর যার ইচ্ছা জাহান্নাম বেছে নিক। এ ব্যাপারে রসূলের করার কিছু নেই এবং কোনো দায়-দায়িত্বও নেই। তাই বলা হচ্ছে,

'অতপর যে সৎপথে আসে সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের অনিষ্টের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়, তুমি তাদের জন্যে দায়ী নও।' (আয়াত ৪১)

তাদের দায় দায়িত্ব আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা নিদ্রা অবস্থায়, সর্ব অবস্থায়ই তারা আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তাদের পরিচালিত করেন। বলা হচ্ছে. 'আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়...........।' (আয়াত ৪২)

অর্থাৎ মানুষের জীবনের জন্যে নির্ধারিত আয়ু মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নিঃশেষ করেন। এ ছাড়া ঘুমের মাধ্যমেও জীবনের এক ধরনের মৃত্যু ঘটে, যদিও এটাকে প্রকৃত মৃত্যু বলা যায় না। তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মৃতই বলা যায়, কিন্তু যদি ঘুমন্ত অবস্থায়ই মৃত্যু তার ভাগ্যে থেকে থাকে, তাহলে সে আর ঘুম থেকে জাগ্রত হবে না। আর যার মৃত্যুর সময় এখনও হয়নি সে পুনরায় জীবন ফিরে পায় এবং জেগে ওঠে, এরপর নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে। মোটকথা, জাগ্রত ও নিদ্রা দু অবস্থায়ই মানুষের জীবন আল্লাহর হাতের মুঠোয় থাকে। তাই বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' আর সেভাবেই মানুষের জীবন সব সময়ই আল্লাহর মুঠোর মধ্যে থাকে। কাজেই মানুষের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, রসূল নন। তারা যদি হেদায়াত লাভ করে তাহলে সেটার শুভফল তারা নিজেরাই ভোগ করবে। আর যদি বিপথগামী হয় তাহলে এর অশুভ পরিণতিও তারা নিজেরাই ভোগ করবে। অর্থাৎ তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাদের ছেড়ে দেয়া হবে না। যদি তাই হয় তাহলে কেন তারা মুক্তি ও কল্যাণের পথ অনুসরণ করে না?

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, তারা কি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? .... (আয়াত ৪৩)

এই প্রশ্ন তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপপূর্ণ একটি প্রশ্ন। যারা ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে এবং মনে করে এরা আল্লাহর নৈকট্যলাভে তাদের সাহায্য করবে, এই প্রশ্ন তাদের লক্ষ্য করেই করা হয়েছে । কারণ, সুপারিশের অধিকার আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো নেই। তিনি যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার জন্যে অনুমতি দেবেন কেবল সে-ই সুপারিশ করতে পারবে ও সুপারিশের যোগ্য বলে গণ্য হবে, কিন্তু যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনা করে তারা কি কখনও এই সুপারিশের জন্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে?

আর যেহেতু আসমান যমীনের মালিকানা ও কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে ন্যস্ত। তাই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই হবার নয়। তাছাড়া মৃত্যুর পর সবাইকে একমাত্র তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। তাই তাঁর দরবার থেকে পলায়ন করার শক্তিও কারো নেই।

আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্বের বর্ণনার পর এখানে মোশরেকদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'যখন খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়.............।' (আয়াত ৪৫)

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগে মোশরেকদের মানসিক অবস্থা কি ছিলো তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, মোশরেকদের সামনে যখন তাদের দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা হতো তখন তাদের চেহারায় আনন্দের হাসি ফুটে ওঠতো। যখন তাওহীদের কথা বা লা-শরীক আল্লাহর কথা উচ্চারণ করা হতো, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যেতো, মনটা ছোট হয়ে যেতো। আলোচ্য আয়াতটিতে কেবল মক্কার মোশরেকদের মানসিক অবস্থাই চিত্রায়িত হয়নি; বরং বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন পরিবেশের আল্লাহদ্রোহী লোকদের মানসিক অবস্থাও চিত্রায়িত হয়েছে। কারণ আমরা এমন অনেক লোকের সাক্ষাত পাই যাদের সামনে এক আল্লাহর কথা, শরীয়তভিত্তিক আইনের কথা এবং ইসলামী আদর্শের কথা বলামাত্রই তাদের মুখ কালো হয়ে যায়, মেযাজ খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু এদের সামনেই যখন জাগতিক আইনের কথা বলা হয়, জাগতিক নিয়ম-নীতির কথা বলা হয় এবং জাগতিক বিধি বিধানের কথা বলা হয়, তখন তারা হেসে ওঠে, নেচে ওঠে, অন্তর খুলে কথা বলা এবং অত্যন্ত উদার মন নিয়ে তর্ক করতে এগিয়ে আসে। ঠিক এই শ্রেণীর লোকদের কথাই যেন আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। এদের অস্তিত্ব সর্বযুগে এবং সর্বস্থানেই পাওয়া যাবে। এরা বিকৃত স্বভাবের মানুষ, এরা নষ্ট প্রকৃতির মানুষ, এরা ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী। যে কোনো যুগের হোক, যে কোনো পরিবেশের হোক, যে কোনো দেশের হোক এবং যে কোনো জাতির হোক, এদের স্বভাব ও প্রকৃতি এমনটিই হয়ে থাকে।

এই বিকৃতি নষ্টামি এবং ভ্রষ্টতার জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে যা বলার উপদেশ দিচ্ছেন তা হলো, 'বলো, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে।' (আয়াত ৪৬)

এই দোয়া ও আরজি কেবল এমন হৃদয় থেকেই উচ্চারিত হতে পারে যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে না। আর সে কারণেই একমাত্র সেই মহান স্রষ্টার দরবারেই নিজের আকুতি মিনতি জানাচ্ছে। আর সে কারণেই মহান স্রষ্টার উপযুক্ত গুণাবলীর উল্লেখ করছে, তাঁকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করছে, দৃশ্য অদৃশ্য জগতের দ্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করছে এবং তাঁকে শেষ বিচারের মালিক বলে আখ্যায়িত করছে।

মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহর ফয়সালার মুখোমুখি হয়ে মোশরেক ও আল্লাহদ্রোহী লোকেরা কি রূপ আতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্ত হবে সে সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, 'যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সব কিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে।' (আয়াত ৪৭)

মহা আতংকের একটা চিত্র এখানে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই আতঙ্কের ফলে শেরেকের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিরা তাদের যাবতীয় ধন দৌলত এমনকি গোটা পৃথিবীটাও কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণস্বরূপ দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। অথচ এই ধন দৌলত ও পৃথিবীর কারণেই তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

আতঙ্কের আর একটি ভয়াল চিত্র ভাষার আবরণে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 'অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি যা তারা কল্পনাও করতো না।' আল্লাহ তায়ালা ওদের জন্যে কি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এর দ্বারা আরও আতংকের সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন শাস্তিই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন যা তারা কখনও চিন্তা করতে পারে না, ভাবতেও পারে না।

'সেদিন তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে এবং যেসব (আযাবের) বিষয়ে তারা দুনিয়ার জীবনে ঠাট্টা মস্কারি করতো তা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে।' (আয়াত ৪৮)

অর্থাৎ এইভাবে নিকৃষ্ট পরিণতির বহিপ্রকাশ স্বরূপ তাদের শাস্তি আরও বেড়ে যাবে। তখন পার্থিব জীবনে যা কিছু তারা করেছে তা তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তাদের সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শন করাতে তারা অনবরত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। তাই সেই কঠিন দিনে তার শাস্তি তাদের ঘেরাও করে ফেলবে। সেদিন সেই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের মধ্যে তাদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

মানবীয় চরিত্রের দু'টো বিপরীতমুখী দিক

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি-ক্ষমতায় তারা অনেককে অংশীদার বানাতো, তাঁর কথা স্মরণ করার কথা বললে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতো এবং তাদের দেবদেবীদের প্রশংসা করলে তারা খুশী হতো। এ সবের পরিণতিতে যখন তাদের শেষ বিচার দিনে হাযির করা হবে তখন তাদের যে কঠিন দুর্গতি হবে, সে অবস্থার ছবি তুলে ধরার পর জানানো হচ্ছে যে, সেদিন তাদের অদ্ভুত এক অবস্থা হবে, কারণ তারা আল্লাহর একত্বকে অবিশ্বাস করতো, তিনিই যে সকল শক্তি-ক্ষমতার একমাত্র মালিক একথা তারা মানতে চাইতো না; কিন্তু তাদের যখন বিপদ আপদে পেয়ে বসতো তখন একমাত্র তাঁর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে ধর্না দিতো না, তাঁর কাছেই কাতর হয়ে প্রার্থনা করতো ও সর্বান্তকরণে তাঁর দিকে রুজু হয়ে যেতো। আবার যখন পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাদের দয়া করতেন আর তারা বিপদ মসিবত থেকে রেহাই পেতো, তখন পুনরায় তারা অহংকারী ও বেপরওয়া হয়ে যেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'মানুষের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, যখনই তার ওপর কোনো দুঃখ-বিপদ নেমে আসে তখন কায় মনোবাক্যে সে আমাকে ডাকতে থাকে, আবার যখনই আমার পক্ষ থেকে তাকে নেয়ামত দান করি তখন সে বলতে শুরু করে, আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধির কারণেই এগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে। অবশ্যই এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশ ব্যক্তিই জানে না।'

এ আয়াতটি মানুষকে বার বার উদাহরণ দিয়ে তাদের ভ্রান্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে, আর সত্যি বলতে কি, মানুষ যদি এ আয়াতটি বার বার পড়তে থাকে এবং এর তাৎপর্যের দিকে খেয়াল করে, তাহলে আয়াতটি তাদের মনের মধ্যে অবশ্যই দাগ কাটবে এবং তাদের সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারা এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং তার দিকে পৌছানোর সঠিক পথ তারা জানতে পারবে। সুখে বা দুঃখে কোনো অবস্থাতেই তারা আর গোমরাহ হবে না।

দুনিয়ার জীবনে বিপদ আপদ তো আসবেই। আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো, কিছু ভয় ভীতি, ক্ষুধা, আর্থিক সংকট জান মালের ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে।' রহমানুর রহীমের পক্ষ থেকে দেয়া এ সব বিপদ আপদ, এগুলোর সবটাই প্রকারান্তরে তাঁর রহমত; বিপদ আপদ, দুঃখ-সংকট, জ্বালা যন্ত্রণা– এগুলো মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত কু-কাজের চিন্তা মন্দপ্রবণতা ও পুঞ্জীভূত অসৎ তৎপরতার ইচ্ছা দূরে সরিয়ে দেয়, যা পরিশেষে তাদের জীবনকে অশান্তির দিকে এগিয়ে দেয়। সত্য দর্শন থেকে তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়, এ সব বাহ্যিক বাধা বিঘ্নের অন্তরালে নিহিত সত্যের সুষমাকে বুঝতে দিতে চায় না এবং কঠিন শিলাভ্যন্তরে প্রবাহমান সুমধুর সুপেয় পানীয়ের মাধুরীকে জানতে দিতে চায় না, তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দা সেসব কঠিন বিপদের মধ্যে আল্লাহকে পেতে চায়। এ দুঃখ বেদনার মধ্যেই তাঁকে চেনা যাবে এবং তখনই সর্বাত্মকভাবে তাঁর দিকে রুজু করা সহজ হবে, আর তখনই ধীরে ধীরে বিপদ আপদের ঘনঘটা কেটে গিয়ে তিমিরের বুক চিরে সাফল্যের আলোকোজ্জ্বল শুভ্র-সুন্দর মুখচ্ছবি বেরিয়ে আসবে, কিন্তু শয়তানের ফেরেবে পড়ে অনেক সময়ে

মানুষের এ সব চিন্তা-চেতনা বিলুপ্ত হয়ে দুঃখের কষাঘাতে অস্থির হয়ে যায়, দিগন্ত রব্বুল আলামীনের বিস্তৃত করুণারাশি ভুলে যায়, কু-প্রবৃত্তির তাড়নে তার ব্যস্ত বাগীশ মন রহমানুর রহীমের কৃপা-ঝরা কথা থেকে মুখ-ফিরিয়ে নেয়। চরম অকৃতজ্ঞতাভরে আল্লাহর যাবতীয় নেয়ামত, অজস্র সুখ-সম্পদ ও সকল প্রকার মেহেরবানী বিস্মৃত হয়ে বলে ওঠে, 'আরে, আমাকে তো এসব আমার জ্ঞান-গরিমার কারণেই দেয়া হয়েছে।' অতীতের কুখ্যাত ধনকুবের কারুন তো এইভাবেই কথা বলেছিলো, এইভাবেই দুনিয়ার বহু জ্ঞানগর্বী তাদের উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসায় নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে যায় এবং প্রাপ্ত ধন দৌলত, মান সম্ভ্রম ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যে তার নিজেরই বাহাদুরীর কথা প্রকাশ করে বসে। সে ভুলে যায়, এসব নেয়ামতের উৎস কোথায়, কে দিলো এ নেয়ামত তাকে কে দিলো এসব এলেম ও কুদরত- জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস ও যোগ্যতা, কোত্থেকে এলো এ সব উপায় উপাদান, তা ভুলে যায়। ভুলে যায় কে সংগ্রহ করে দিয়েছে তাকে দুনিয়ায় সুখ-সম্ভোগের নানাবিধ উপকরণ। তাকে স্মরণ করাতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'এসব প্রভূত নেয়ামত- অবশ্যই তার জন্যে এক পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।'

এ সব সুখ-সম্ভোগের উপকরণাদির প্রাচুর্য সম্পদশালী লোকদের দুই কারণে দেয়া হয়। এক, আন্তরিকতাপূর্ণ পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবে। দুই, সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ তায়ালা তাদের পাওনা থেকেও বেশী দিয়ে দেখতে চান তারা কমপ্রাপ্তদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে কিনা এবং তাদের অধীনস্থদের প্রতি তারা মানবতাসুলভ ব্যবহার করে কিনা, না নিজেদেরই সম্পদের নিরংকুশ মালিক মনে করে যেভাবে খুশী সে সম্পদ ব্যবহার করে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান, তারা নেয়ামতের শোকরগোযারী করে, না মূল মালিকের দেয়া সম্পদের ওপর খোদকারী করে। এই খোদকারী করা বা নিজেদেরই আসল মালিক মনে করাই হচ্ছে নেয়ামত অস্বীকার করা, অর্থাৎ সকল নেয়ামতের মূল মালিক আল্লাহ তায়ালা এ কথার প্রতি অস্বীকারকারী হয়ে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এভাবে সম্পদ ব্যবহারের সঠিক বা বেঠিক পন্থা অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ রব্বুল ইযযত কারো ওপর খুশী হন এবং কারো কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেন। এর ফলে কেউ আল্লাহর করুণায় হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর কেউ হয় বিপথগামী, ভুল পথের পথিক।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন, এ কেতাবের মালিকের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্যে এক বিরাট রহমত, যা তাদের সামনে তাঁর কৃপা করুণার সুপ্রশস্ত দরজা অবারিত করে দেয় এবং তাদের সম্পদ ও সচ্ছলতায় ভরে দেয়। যুক্তিপূর্ণ এ মহাগ্রন্থকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করার কারণে কাল কেয়ামতের দিনে কাফেরদের কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে- এ কথা স্বতসিদ্ধ বিধায় আজকে তাদেরকে তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। কেয়ামতের দিন ওযর পেশ করার মতো তাদের কাছে আর কোনো ওজুহাত বা কোনো যুক্তিই থাকবে না। তাদের পূর্বে যারা সত্যকে পর্যুদস্ত করার জন্যে নানা প্রকার অন্যায় পদক্ষেপ নিয়েছিলো, তাদের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাদের অপপ্রয়াসের একটি নযির হচ্ছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো- 'আমার জ্ঞান-গরিমার কারণেই আমাকে এটা দেয়া হয়েছে।'

ওদের আগেকার লোকেরাও এভাবে কথা বলেছে, কিন্তু তারা যাই করুক না কেন তাদের তৎপরতা দ্বারা তারা কোনো ফায়দাই পায়নি। যেসব অন্যায় কাজ তারা করেছে অবশ্যই তার শাস্তি তাদের ভোগ করতে হয়েছে, আর যারা ওদের মধ্য থেকে যুলুম করেছে তাদেরও শীঘ্রই তার সাজা পেতে হবে। কিছুতেই তারা সে আযাব প্রতিহত করতে পারবে না।

এখানে তাদের যে ভুল কথাটি উদ্ধৃত করা হলো– এ ধরনের কথা একইভাবে তাদের পূর্বেকার লোকেরাও বলতো। তারাও তাদের মতোই শাস্তি পেয়েছে এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা, ধন সম্পদ বা তাদের শক্তি কোনোটাই তাদের কোনো কাজে লাগেনি। অতএব এখন যারা অনুরূপ হঠকারিতার মধ্যে লিপ্ত হবে তাদেরও নিসন্দেহে একই প্রকার সাজা পেতে হবে। এটাই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ম, যার কোনো পরিবর্তন কোনোদিন হবে না। তারা তাঁকে সাজা দেয়ার ব্যাপারে অক্ষম করতে পারবে না। আল্লাহকে তাঁর এসব দুর্বল ও তুচ্ছ সৃষ্টি কোনো ব্যাপারেই অক্ষম করতে পারে না।

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তারাই শুধু চলতে পারে যাদের তিনি তাঁর কৃপাধন্য করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর অফুরন্ত ভান্ডারে রক্ষিত নেয়ামতের মধ্য থেকে যাদের তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করার সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই গ্রহণ করেছেন, তারাই তার সেসব নেয়ামত লাভ করতে পারে। তিনি যাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে চান দিয়ে দেন, যার জন্যে সংকীর্ণ করতে চান তাকে তা কমিয়ে দেন– এটা তাঁরই ইচ্ছা। এভাবে তিনি তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন এবং যেমন খুশী তিনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে তাঁর ভান্ডারকে খুলে দেন এবং যার জন্যে খুশী তার ভান্ডারের দরজা বন্ধ করে দেন। অবশ্যই এর মধ্যে ঈমানদার কওমের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।'

এ জন্যে তারা যেন আল্লাহর এসব নিদর্শনকে কুফরী ও গোমরাহীর কারণ হিসাবে গ্রহণ না করে; বরং সেগুলো তো হেদায়াত ও ঈমানের উদ্দেশ্যেই এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ

রুকু ৬

৫৩. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো, তারা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (মানুষের) সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৫৪. অতএব, তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছেই (পূর্ণ) আত্মসমর্পণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার আযাব আসার আগেই, (কেননা একবার আযাব এসে গেলে) অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না। ৫৫. তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে কোনো রকম আযাব নাযিল হবার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট (গ্রন্থ) নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, ৫৬. (অতপর এমন যেন না হয়,) কেউ (একদিন) বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি তো (মূলত) ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদেরই একজন! ৫৭. কিংবা একথা (কেউ) যেন না বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেযগারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম, ৫৮. অথবা আযাব সামনে দেখে কেউ বলবে, আহা, যদি আমার (আবার) দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া (নসীবে) থাকতো, তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম! ৫৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হ্যাঁ, আমার আয়াতসমূহ অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছেছিলো, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে, তুমি ছিলে অস্বীকারকারীদেরই একজন। ৬০. কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে,

كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার (বিশ্রী হয়ে গেছে), তুমি কি মনে করো জাহান্নাম (এ রকম) ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিত) নয়? ৬১. (এর বিপরীত) যারা পরহেযগারী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাফল্যের সাথে (জাহান্নাম থেকে) উদ্ধার করবেন, অকল্যাণ কখনো তাদের স্পর্শ করবে না, না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে!

তাফসীর

আয়াত ৫৩-৬১

'বলো, আমার সেসব বান্দা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই তিনি সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।'

এই হচ্ছে আল্লাহর সেই প্রশস্ত রহমত যা সকল গুনাহ ঢেকে দেয় (প্রকাশ থাকে যে, গুনাহ তাই যা আল্লাহর অধিকারের সাথে জড়িত। বান্দার অধিকার এর বাইরে এবং তা বান্দা মাফ না করলে মাফ হয় না, আর এই জন্যেই রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়)। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবাধ্য বান্দাকে কাছে টানার জন্যে তাঁর ক্ষমা করার সীমাহীন ক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি এতো দয়াময় যে, বান্দা যতো বড় নাফরমানীই করুক না কেন, তার ক্ষমার দরজা কখনও তার জন্যে বন্ধ হবে না, তবে শর্ত হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে তাকে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এবং যেহেতু তিনি সুবিচারক, এ জন্যে অন্য কারো অধিকার নষ্ট করলে সে অধিকার আদায় করার দায়িত্বও তাঁর। তাঁর না-ফরমানীর সীমা অতিক্রমকারীদের যারা ভুল পথে চলতে চলতে এত দূরে চলে গেছে, যেখান থেকে ফেরার কল্পনাও করা যায় না– সেসব হতাশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, ফিরে এসো, ফিরে এসো হে আমার ভ্রান্ত বান্দারা, যতো বড় গুনাহই তোমরা করো না কেন। আমার ক্ষমার কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। এ ক্ষমা তার জন্যেই যে আনুগত্য প্রকাশ করে নিজের দাসত্বের প্রমাণ দেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার জন্যে বিশেষভাবে দয়াবান। তিনি তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা জানেন এবং তিনি আরও জানেন যে, বান্দার প্রকৃতির মধ্যে ও বাইরে কোন কোন জিনিস তাকে অবাধ্য বানানোর জন্যে সদা ক্রিয়াশীল রয়েছে। তিনি আরও জানেন, মরদূদ শয়তান জীবনের বন্ধুর পথের বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে থেকে তাকে ভুল পথে চালিত করছে। তিনি জানেন, কেমন করে তাকে ধোকার মধ্যে ফেলার জন্যে শয়তান সকল প্রকার দুরভিসন্ধি এঁটে বসে আছে এবং কেমন করে আল্লাহর পথ থেকে তাকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে তার বিরুদ্ধে তার অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনীকে পরিচালিত করছে। এটাও তিনি ভালো করে জানেন, তার ঘৃণ্য চক্রান্তজাল প্রসারিত করার ব্যাপারে সে কত পারদর্শী। তিনি আরও জানেন, মানবরূপী এ তুচ্ছ সৃষ্টির কাজের উপাদানসমূহ অতি দুর্বল। সে বড়ই অভাবগ্রস্ত, তার হাত থেকে সেই উপাদানসমূহ যখন দ্রুত গতিতে সরে যায় তখন সে নেহায়াত অসহায় হয়ে পড়ে। তার প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন কোন প্রবণতা এবং কোন কোন জিনিসের চাহিদা রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে

না। তার প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা যে রয়েছে তা তিনি জানেন। কেমনভাবে সে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে চালিত হয় এবং এর ফলে সে কত সহজে অপরাধজনক কাজ ও কু-প্রবৃত্তির শিকার হয়ে যায়, জীবনের সব ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কত বেশী দুর্বল আল্লাহ তায়ালা তাও জানেন।

আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত, এ জন্যেই মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাহায্যের জন্যে তাঁর করুণার হাত সদা-সর্বদা প্রসারিত করে রেখেছেন এবং প্রসারিত করে রেখেছেন তাঁর রহমতের হাত, এ জন্যে তিনি ততক্ষণ বান্দার অপরাধের কারণে তাকে সংগে সংগে পাকড়াও করেন না। তার সংশোধনের জন্যে সুযোগ দেন, আত্মোপলব্ধি করে শোধরানোর জন্যে তাকে প্রচুর উপায় উপাদান ও সময় দিতে থাকেন। এরপরও যখন সে অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়, সীমা ছাড়া গুনাহ করে ফেলে, তারপর সে বুঝতে পারে, সে অন্যায় কাজ করতে করতে সঠিক পথ থেকে এতো দূরে চলে গেছে যে, এ সময় তার দোয়া কবুল হবে বলে সে আর মনে করে না, বা সে মনে করে যে তাকে আর সঠিক পথে কেউ এগিয়ে নেবে না, এমনই এক কঠিন হতাশার মুহূর্তে সে শুনতে পায় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ঘোষিত উদাত্ত আহ্বান–

'বলে দাও (হে রসূল), সেসব সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি মাফ করনেওয়ালা, মেহেরবান।'

মানুষ অন্যায় করে, সীমা অতিক্রম করে অপরাধের জালে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এ সব অপরাধের শাস্তি থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, ফলে তার এবং তার মালিকের মধ্যে এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যে তার প্রতি তার মালিকের দয়া মায়া মমতা কমে যেতে শুরু করে, ক্রমান্বয়ে সে রব্বুল আলামীনের রহমতের ছায়া থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকে। সে অবস্থাতে কোন্ জিনিস তার এবং তার এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে এবং মালিক ও বান্দার মধ্যে বিরাজমান দূরত্বের অবসান ঘটাতে পারে? সে উপায়টিই হচ্ছে 'তাওবা'। একমাত্র তাওবা বা অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করাই এই দূরত্ব কমানোর একমাত্র উপায়। অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্যে ক্ষমাপ্রাপ্তির দরজা সদা সর্বদাই অবারিত রয়েছে এবং তাওবাকারীর আবেদন ফিরিয়ে দেয়ার মতো কোনো দারোয়ান সেখানে নেই। প্রয়োজন নেই সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে কোনো অনুমতির। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ফিরে এসো .... এবং তোমাদের অজান্তেই হঠাৎ করে আযাব এসে যাবে।' (আয়াত ৫৪-৫৫)

এবাদাতের সঠিক তাৎপর্য

অন্যায় কাজ করার পর আল্লাহর দিকে রুজু করা, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যভরা মন নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, এগুলোই হচ্ছে আসল এবাদাত। কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক কোনো বিশেষ কাজ বা প্রথা, কোনো মাধ্যম বা মধ্যস্থতা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্যে আসল জিনিস নয়। অর্থাৎ যাই-ই করা হোক না কেন, যদি আনুগত্যভরা মন নিয়ে মালিকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব না থাকে বা অন্যায় করার পর অনুতাপ না হয়, তাহলে শুধু বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়।

যদি আনুগত্যবোধক কার্যাবলী না থাকে তাহলে কারো কোনো সুপারিশ বা মধ্যস্থতা দ্বারাও নাজাত পাওয়া সম্ভব হবে না, আর প্রকৃতপক্ষে যে নিজে তাওবা না করবে তার জন্যে কেউই সুপারিশ করতে পারবে না।

মনিব ও তার গোলামের মাঝে সম্পর্ক সরাসরি, কারো মাধ্যমে নয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেও সেই সম্পর্ক কারো মাধ্যমে নয়। অতএব সৃষ্টিকর্তার দরবার থেকে পলায়নপর ব্যক্তি যদি ফিরে আসতে চায়, সে অবস্থায় তাকে কারো মাধ্যমে আসা লাগে না বা সেখানে কারো সুপারিশেরও দরকার করে না। ভুল পথ পরিহার করে যে সঠিক পথে ফিরে আসতে চায় তাকে বলা হচ্ছে, সে যেন নির্দ্বিধায় নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ফিরে আসে। এমনই অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের জন্যে মহাদয়াময় আল্লাহর তাওবার দরজা চির উন্মুক্ত। নাফরমানী করে কেউ যদি দোষ স্বীকার করে মহান রব্বুল ইযযতের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে যেন নিশংক চিত্তে, নির্ভয়ে পরম করুণাময় পরওয়ারদেগারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। তার জন্যে রয়েছে তাওবার দরজার ওপারে রহমানুর রহীমের মেহেরবানী ঘেরা সুসজ্জিত জান্নাত, যার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ ধীরে ধীরে তার মর্মজ্বালা নির্বাপিত করে তাকে মাবুদের প্রিয়পাত্রে পরিণত করবে– এই হচ্ছে তওবার মাহাত্ম্য। তাওবা করার পর বান্দার মাবুদের কাছে পৌছে যাওয়ার পথে কোনো বাধা নেই, নেই কোনো প্রতিবন্ধকতা এবং নেই তাকে ঠেকানোর মতো কেউ!

অতএব পরম করুণাময় আল্লাহর তরফ থেকে তার পথভ্রষ্ট বান্দার প্রতি জানানো হচ্ছে উদাত্ত আহ্বান। ফিরে এসো, ফিরে এসো, হে আমার পথহারা দিশাহারা বান্দারা, সময় থাকতেই তোমরা ফিরে এসো, সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তোমরা অসীম করুণার মালিকের দরবারে ধর্না দাও, ফিরে এসো কঠিন আযাব নেমে আসার আগেই। কেননা একবার সে আযাব এসে গেলে কিছুতেই আর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। এরপর কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। অতএব ফিরে এসো সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই, কারণ সময় বড়ই বিপদসংকুল, বড়ই বিশ্বাসঘাতক, সময় কোনো নিরাপত্তার ওয়াদা দেয় না। কাজেই সময়ান্তে এটা করব ওটা করবো, সময় পার হওয়ার সাথে সাথে পাপের চিহ্ন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাবে, সময়ই সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাময় প্রদানকারী– এ সব দার্শনিক চিন্তা সবই ভুল প্রমাণিত হবে, বরং 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়' থেকে উত্তম– এই বুঝ নিয়ে কাজ করো। কখন যে সময় শেষ হয়ে যাবে এবং কখন যে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তা কেউই বলতে পারে না। রাত দিনের যে কোনো মুহূর্তে চূড়ান্ত ফয়সালা এসে যেতে পারে এবং তাওবার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, একথা মনে রেখে সময় থাকতেই নিজেকে শুধরে নাও এবং আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রহমতের বারিধারা গ্রহণ করে নিয়ে ধন্য হও। এসো, এসো হে ভ্রান্ত মানব, 'অতি সুন্দর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তোমাদের রব আল্লাহর কাছ থেকে তার অনুসরণ করো।' আর সে হেদায়াতই তো হচ্ছে আল কোরআন, যা তোমাদের সামনেই রয়েছে। সে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করো 'হঠাৎ করে আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই, যখন তোমরা বুঝতেও পারবে না।'

এসো, পথহারা আমার সৃষ্টির সেরা হে মানুষ, সুযোগ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ভুল পথ থেকে ফিরে এসো। আল্লাহর অধিকার ধ্বংস করার দুঃসাহসে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওয়াদার সাথে বিদ্রূপ করো না। এরশাদ হচ্ছে,

'কেউ যেন বলতে না পারে, আল্লাহ সম্পর্কে যে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তার জন্যে আফসোস! আর অবশ্যই আমি ঠাট্টা মস্কারি করনেওয়ালা লোকদের দলভুক্ত ছিলাম।'

অর্থাৎ, এমন কথা কেউ বলতে না পারে, আল্লাহ তায়ালা আমার ভাগ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাই লিখে দিয়েছিলেন। তিনি যদি আমার হেদায়াত যদি লিখে দিতেন তাহলে আজকে আমি

গোমরাহ হতাম না এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে চলতে পারতাম। তাই কালামে পাকে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে হেদায়াত করতেন তাহলে আমি মোত্তাকীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।'

এ হবে শুধু এক সান্ত্বনা, এর ভিত্তি কিছুই থাকবে না। এটা শুধু এক সুন্দর ধারণা হয়েই রয়ে যাবে, বাস্তবে এর থেকে কোনো ফায়দাই পাওয়া যাবে না। হেদায়াতের উপায় পদ্ধতি আজ সব সময়ই উপস্থিত আছে এবং তাওবার দরজা আজও উন্মুক্ত রয়েছে।

'আর কেউ এমন কথাও যেন সেদিন বলতে না পারে, যদি আমি কোনো সুযোগ পেতাম তাহলে অবশ্যই ভাল লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।'

এটা হবে নিছক একটা আকাংখা বা আক্ষেপ, কিন্তু সেদিন এরও বাস্তব কিছু থাকবে না। কারণ এ জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় আর যে এ জীবনে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তোমাদের এটা জানা দরকার যে, তোমাদের এ জাগতিক জীবনই আসল কাজের জায়গা। এখানেই ভালো বা মন্দ যে কোনো কাজ করার সুযোগ রয়েছে, এ জীবন শেষ হয়ে গেলে আর এখানে ফিরে আসা সম্ভব নয়। শীঘ্রই ধমকের সাথে এবং অপমানিত করতে গিয়ে সেদিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছে, কিন্তু নবীকে মিথ্যা বলে সেসব আয়াত তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছো এবং এর ফলশ্রুতিতে তোমরা কাফের হয়ে গেছো।'

আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে, আয়াতগুলো অন্তরের গভীরে এবং চেতনাশীল লোকদের হৃদয়তন্ত্রীতে ধীরে ধীরে আখেরাত সম্পর্কে সাড়া জাগাতে শুরু করেছে............... এরপর আসছে পাশাপাশি আযাবে নিপতিত অপরাধী মানুষের এবং মোত্তাকী-পরহেযগার লোকদের পুরস্কৃত হওয়ার দৃশ্য। এরশাদ হচ্ছে,

আর যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে, দেখবে কেয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। .... আর তারা দুঃখিত হবে না।' (আয়াত ৬০-৬১)

এটাই হচ্ছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে অপমানের গ্লানিতে, জাহান্নামের আগুনের তাপে তাদের গোটা অস্তিত্ব ঝলসে যেতে থাকবে, এরাই ছিলো পৃথিবীতে অহংকারীদের দল। এদের আল্লাহর দিকে ডাকা হয়েছে, নানা প্রকার অপরাধজনক কাজ করতে থাকাবস্থায় তাদের সংশোধনের জন্যে বার বার আহ্বান জানানো সত্তেও তারা আহ্বানকারীদের ডাকে কোনো সাড়া দেয়নি, যার কারণে সে কঠিন দিনে তাদের হীন অবস্থায় সেখানে নেয়া হবে এবং তাদের মুখমন্ডল কলুষ কালিমায় ছেয়ে থাকবে। তাদের পাশেই থাকবে আর একদল লোক, যারা সে কঠিন অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবে এবং কোনো দুঃখ বেদনায় তারা জর্জরিত থাকবে না, এরা হবে সব আল্লাহ্ভীরু মানুষ, তারা আখেরাতের ভয় অন্তরে নিয়েই দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে এবং সদা সর্বদা তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী থেকেছে। এ দলের লোকেরাই আজ নাজাত লাভ করবে, সাফল্য পাবে। ফলে তাদের কোনো দুঃখ কষ্ট এবং কোনো শাস্তি স্পর্শ করবে না ।

এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল হওয়ার পর মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দূতের আহ্বানে যথাযথাভাবে সাড়া দেয়া, যিনি আল্লাহর রহমতের দিকেই আহ্বান জানাচ্ছেন, যিনি ডাকছেন সেই নির্মল ছায়াদার বাগিচার দিকে, যার দরজা প্রকৃত নেককার ব্যক্তিদের জন্যে চির উন্মুক্ত। আর যার খুশী সে অন্যায় অপকর্মে মজে থাকুক, অবশেষে তার মন্দ পরিণাম ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাক, এটা এমনভাবে এসে যাবে যে তারা বুঝতেই পারবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা................সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি সারা জগতের মালিক।' (আয়াত ৬২-৭৫)

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ؗ وَّهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ

اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّیْٓ اَعْبُدُ اَیُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ

وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ

الْخٰسِرِیْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ

حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌۢ

بِیَمِیْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِی

السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِیْهِ اُخْرٰی

فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ یَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ

৬২. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সব কিছুর (একক) স্রষ্টা, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর নেগাহবান! ৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের মূল চাবি (-কাঠি) তো তাঁরই কাছে; যারা (এখন) আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে চলেছে, (পরিশেষে) তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকু ৭

৬৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হে মূর্খ ব্যক্তিরা, তোমরা কি (এরপরও) আমাকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী বরণ করে নিতে বলছো? ৬৫. অথচ (হে নবী,) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও– যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওহী পাঠানো হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্যদের) শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। ৬৬. অতএব, তুমি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো এবং শোকরগোযার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। ৬৭. (আসলে) এ (মূর্খ) লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো, কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে; পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (তাঁর সাথে) যা কিছু শেরেক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। ৬৮. (যখন প্রথমবার) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহুশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা চান (তার কথা আলাদা); অতপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা সবাই দন্ডায়মান হয়ে (সে বীভৎস দৃশ্য) দেখতে থাকবে। ৬৯. (এ সময়) যমীন তার মালিকের

الْكِتٰبُ وَجِایْٓءَ بِالنَّبِیّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۶۹﴾ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ ﴿۷۰﴾

وَسِیْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰی جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰی وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكٰفِرِیْنَ ﴿۷۱﴾ قِیْلَ ادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ﴿۷۲﴾ وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ

নূরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে, মানুষের (কর্মফলের) নথিপত্র (সামনে) রাখা হবে, নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাযির করা হবে, তাদের সবার সাথে ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। ৭০. প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা প্রতিনিয়ত করে বেড়াতো।

রুকু ৮

৭১. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেয়ে) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কেতাবের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার সে) আযাব (সম্পর্কিত) ওয়াদাই আজ বাস্তবায়িত হয়ে গেলো। ৭২. ওদের (তখন) বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজা দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই চিরদিন থাকবে, ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা! ৭৩. (অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে তারা (জান্নাতের দোরগোড়ায়) এসে হাযির হবে (তখন তারা দেখতে পাবে) তার দরজাসমূহ তাদের অভিবাদনের জন্যে খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِيْنَ ۝٧٣ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا

وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ

الْعٰمِلِيْنَ ۝٧٤ وَتَرَى الْمَلٰۤئِكَةَ حَاۤفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ

رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٥

বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্যে এখানে দাখিল হয়ে যাও! ৭৪. তারা (সেখানে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সমস্ত তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সৎ) কর্ম সম্পাদনকারীদের (এ) পুরস্কার কতোই না উত্তম! ৭৫. (হে নবী, সেদিন) তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, ওরা আরশের চারদিকে ঘিরে তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, (সেদিন) ইনসাফের সাথে সবার বিচার (-কার্য যখন) সম্পন্ন হবে, (চারদিক থেকে) একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে– সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

তাফসীর

আয়াত ৬২-৭৫

ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো হচ্ছে সূরাটির শেষ অংশ, যা তওহীদের তাৎপর্য পেশ করছে । এর মধ্যে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ তায়ালাই, তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক। অতপর আল্লাহর নবীর প্রতি মোশরেকদের দাবী কি ছিলো তাও এ আয়াতে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর এবাদাতের পরিবর্তে তাদের কল্পিত মাবুদদের তার সাথে শরীক করার জন্যে তারা নবী (স.)-এর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের আজব আহ্বান। অথচ এটা স্পষ্টভাবে সবাই বুঝছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব চলছে। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে কিভাবে নিরংকুশ আনুগত্য দেয়া যায়? এটাও সবাই খেয়াল করলে বুঝতে পারে যে, একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে আসমান যমীনের চাবিকাঠি। ওদের অদ্ভুত এসব আচরণের প্রেক্ষাপটে এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা আল্লাহর মর্যাদা সঠিকভাবে বুঝেনি বিধায় তাঁকে সেইভাবে মর্যাদাও দেয়নি।' তিনিই একমাত্র মাবুদ, অর্থাৎ সর্বব্যাপী তাঁর ক্ষমতা বিরাজমান বিধায় নিঃশর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য বলে তিনি চালু করার ক্ষমতাও পুরোপুরি রাখেন। 'আর কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকবে এবং আকাশ গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে বিরাজ করবে' ... অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যে মহাসত্য সংঘটিত হবে তারই অবিকল একটি চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে। পরিশেষে আর একটি ছবি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আরশের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে তাদের রবের কৃতিত্ব বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর প্রশংসাগীতি গাইতে থাকবে এবং সকল সৃষ্টিই তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে থাকবে। 'আর বিশ্ব জগতের প্রতিপালকেরই সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা

উচ্চারিত হতে থাকবে।' .... তাওহীদের বর্ণনায় এভাবেই চূড়ান্ত কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা .... ওরাই, হাঁ, অবশ্যই ওরা ক্ষতিগ্রস্ত।'

সৃষ্টিকূলের সব কিছু আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে

বিশ্ব জগতের যেখানে যা আছে, সজীব-নির্জীব সবকিছুই নানাভাবে নিশিদিন এ সত্য কথাটিই বলে চলেছে; সুতরাং, 'কোনো কিছু কেউ সৃষ্টি করেছে' বলে কেউই কখনও দাবী করে না, বা কারো দাবী করার ক্ষমতাও নেই। কোথাও কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন নেই যে একথা মনে করতে পারে যে, সবাই নিজ ইচ্ছায় এবং নিজের বুদ্ধিতে কথা বলছে বা শব্দ করছে। তার কাজের মধ্যে কোনোটাই এমন নেই যা পরিত্যাজ্য হতে পারে, কারো কাছে নিরুৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে অথবা ছোট থেকে বড়র দিকে আপনা থেকে হয়ে গেছে মনে হতে পারে। 'তিনি সব কিছুর ব্যাপারেই দায়িত্ব গ্রহণকারী।' অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বিক পরিচালনা তিনিই আনজাম দেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সব কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর দেয়া নিয়ম-শৃংখলার অধীনে সারা বিশ্বের সব কিছুই চলছে এবং তাঁর স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তমতে সব কিছু সমাপ্ত হচ্ছে। কোথাও এমন কেউ নেই যে, তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে বা তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর তর্ক-বিতর্ক বা দরকষাকষি করতে পারে। তাঁর সকল কাজই মানুষের উপকারের জন্যে, অর্থাৎ যে প্রকৃতিতে তিনি বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেই তিনি মানুষের জীবন বিধান দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর বিধান মানব প্রকৃতি বিরোধী কিছুতেই নয়। তাঁর সকল সিদ্ধান্ত বাস্তব অবস্থার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, মোটেই সাংঘর্ষিক নয়। তাঁর যাবতীয় আইন কানুন মানুষের যুক্তি বুদ্ধিসংগত ও বিবেকের কাছে তা সমাদৃত। এরশাদ হচ্ছে,

'আমার আয়াতগুলোর সাথে যারা কুফরী করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তখন যখন তারা তাদের সেই চেতনা হারিয়ে ফেলেছে, যা সঠিক পথে সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে। পরে যখন আল্লাহর হুকুমকে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করেছে তখন তারা ঈমানের মজা, ঈমানী যিন্দেগীর আরাম এবং তৃপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই স্বেচ্ছাচারিতার দরুন দুনিয়ার শান্তি থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা ঈমানের সৌন্দর্য হারিয়েছে। আখেরাতের জীবনে তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে– ওরাই হচ্ছে সেসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে 'আল খাসেরূন' বা 'ক্ষতিগ্রস্ত' শব্দটি পুরোপুরিই খাপ খায়।

আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে সর্বত্র যে সত্য নিয়ত কথা বলে চলেছে এবং যাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে সৃষ্টির প্রতি পত্রপল্লব ও সকল বস্তুনিচয়, তার সম্পর্কেই তো রসূলুল্লাহ (স.) খবর দিচ্ছেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সেই জাজ্বল্যমান সত্যকেই কাফের মোশরেকরা স্বীকার করতে রাযি নয়। তাঁরই সাথে তারা অন্য আরও অনেককেই শরীক বানাচ্ছে এবং তাঁর ক্ষমতায় আরও কেউ ভাগ বসানোর মতো আছে বলে মনে করছে। শুধু তাই নয়, নিজেদের গোমরাহীর সাথে তারা চাইছে যে, স্বয়ং আল্লাহর রসূলও তাদের কাজে শরীক হয়ে যাক, এটা তো বাজারে অনেকটা দরকষাকষি করে জিনিসপত্র কেনাকাটার মতো। এর জওয়াবে বলতে বলা হচ্ছে,

'হে জাহেলরা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য আমি করি– তোমরা কি এইটাই চাও?'

ওপরের আয়াতটিতে যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা সে ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে যে চরম বেওকুফের মতো এমন বস্তুর সামনে মাথানত করতে বলে, যার নড়াচড়ার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই এবং তারা সাহায্য চাইতে বলে তার কাছে, যার নিজেকে পর্যন্ত সাহায্য করার কোনো শক্তি নেই। অর্থাৎ ওরা নিজেরা যেমন চরম নির্বুদ্ধিতা করছে, তেমনি ওরা চাইছে নবী মোহাম্মদ (স.)ও ওদের সাথে যোগ দিয়ে একই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিক।

এরপর তাদের শেরেক থেকে বিরত থাকার জন্যে বলা হচ্ছে। শেরেকের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে। এ জন্যে সর্বপ্রথম নবী রসূলদের থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ মানুষকে এই বদভ্যাস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। তারা তো সেসব ব্যক্তি যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও শান্তি। তাদের মধ্যে কোনোদিন শেরেকের কোনো আঁচড় পর্যন্ত লাগা সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে তাদের লক্ষ্য করে যে হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা মূলত তাদের ভ্রান্ত জাতির জন্যে, যাতে করে তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিপূর্ণ আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং মানুষকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার দিকে রুজু করতে শেখায়, শেখায় সেই পথে চলতে যে পথে নবী রসূলরা চলেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই ওহী পাঠানো হয়েছে তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে।'

বলা হয়েছে, 'যদি তুমি শেরেক করো তাহলে তোমার সকল নেক কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।'

শেরেক থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশের সাথে তাওহিদী বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্যেও হুকুম দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এবাদাত একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে, তাঁরই শোকরগোযারী করতে হবে, যেহেতু তিনি হেদায়াত করেছেন, নিশ্চিত বিশ্বাসের নেয়ামত দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদের তাঁর সর্বপ্রকার ও সীমাহীন নেয়ামত সদা-সর্বদা ঘিরে রেখেছে, যার সীমা সংখ্যা পরিমাপ করতে তারা অক্ষম; বরং তাঁর নেয়ামত সাগরে তারা ডুবে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বরং আল্লাহরই এবাদাত করো এবং শোকরগোযার বান্দাদের গণ্য হয়ে যাও।' এরশাদ হচ্ছে,

'আসলে ওরা আল্লাহকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেয়নি।'

হাঁ, সত্যিই তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে মর্যাদা দেয়নি। কারণ ওরা তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টিকে তাঁরই সমকক্ষ বানিয়েছে, এ জন্যে যে এবাদাত তারা করে তা সঠিক হয় না। ওরা তাঁর একত্ব ও বড়ত্ব অনুভব করতে পারে না, না তার মান সম্মান ও শক্তি অনুভব করে।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বড়ত্ব ও শক্তির কিছু নির্দশন ছবির মতো তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁর প্রেরিত আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত তাঁর নিজস্ব এক পদ্ধতির মাধ্যমেই। তা মানুষের জন্যে সার্বিক সত্য তুলে ধরেছে। এইভাবে তাদের সীমাবদ্ধ অনুভূতি দিয়ে তাঁর সম্পর্কে কিছু কল্পনা করা যায়। যেমন, এরশাদ হয়েছে,

'গোটা পৃথিবীটাই কেয়ামতের দিন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে এবং তাঁর ডান হাতে থাকবে আকাশমন্ডলী গুটানো অবস্থায়। পবিত্র তিনি, আর তাঁর সাথে যাদের ওরা শরীক করছে তাদের থেকে তিনি অতি মহান।'

কোরআন এবং হাদীসে এসব ছবি ও দৃশ্যাবলী বার বার বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব কিছু মানুষকে সে সকল বিষয় সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়, যা বুঝবার ক্ষমতা মানুষের আদৌ নেই। আসলে সেটা তাদের এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা বুঝানোর একটা ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র এবং এসবের দ্বারা সঠিক কোনো বুঝ কখনো সাধিত হয় না; বরং একটা কল্পনামাত্র তাতে করা যায়। যেসব রহস্য কোনো আকৃতির মধ্যে আনা সম্ভব নয়, সেগুলোকে এমন কিছু চিত্রের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যা মানুষ বুঝতে পারে। এ জন্যেই ওপরে বর্ণিত এই ছবির উল্লেখ বিশেষ কোনো আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে না বা কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে না।

কেয়ামতের একটি ভয়াবহ দৃশ্য

তারপর কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে একটি দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এটা শুরু হচ্ছে শিংগার প্রথম ফুঁক থেকে। জাহান্নামবাসীদের জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং

জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর সাথে এ বর্ণনা শেষ হচ্ছে। এ বিষয়ে পরিষ্কার করে জানানো হচ্ছে যে, এ সব কাজ একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা এখতিয়ারে সম্পাদিত হবে। এ জন্যেই গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মনোযোগ তাঁর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেন তারা সবাই বিভিন্ন কায়দায় তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

এ হবে এক ভয়ানক দৃশ্য, কূলকিনারাহীন এক মহা জনসমুদ্র, যার শুরুতে সব কিছুকে গতিমান দেখা যাবে এবং শেষে নেমে আসবে কঠিন নিস্তব্ধতা। অর্থাৎ সকল কলরোল ধীরে ধীরে কমে আসতে আসতে নিশ্চুপ হয়ে যাবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নীরব-নিথর হয়ে যাবে সকল কাতর ধ্বনি, সুবিশাল সে প্রান্তরের সকল কলরব থেমে গিয়ে নেমে আসবে এক কঠিন নীরবতা, এমন ভয়ংকর স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকবে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এটাই হবে শিংগায় প্রথম ফুঁকের সাথে কেয়ামতের প্রথম অবস্থা। এর ফলে পৃথিবীর ওপর অবস্থিত সকল জীবিত প্রাণী মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। অনুরূপভাবে আকাশমন্ডলীর যেখানে যা কিছু জীবিত আছে তাও সব খতম হয়ে যাবে। অবশ্য তাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যিন্দা রাখতে চাইলে সে হবে স্বতন্ত্র কথা। আমরা জানি না সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কতোদিন এই নীরবতা থাকবে। অবশেষে আবার আসবে এক সময় যখন দ্বিতীয় বারের শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে।

এরপর তৃতীয় কোনো শিংগাধ্বনির কথা আর বলা হয়নি যে, সবাইকে হাশরের মাঠে একত্রিত করার জন্যে আবার কখন ফুঁক দেয়া হবে। ....এ সময় হাশরের ময়দানে অসংখ্য মানুষের এত ঠাঁসাঠাঁসি অবস্থাতেও কোনো শব্দ থাকবে না। কী জানি কেন? সম্ভবত অবস্থার ভয়াবহতায় নির্বাক, নীরব-নিথর হয়ে যাবে সবাই, কোনো শোরগোল থাকবে না। এই অবস্থায় জনতার ভিড় নীরবে-নিঃশব্দে এগুতে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সমগ্র যমীন আল্লাহ রব্বুল ইযযতের আলোতে ঝলমল করতে থাকবে।'

এ হবে সেই উন্মুক্ত ময়দানের যমীন, যেখানে সমগ্র মানব সন্তানদের বিশ্ব জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে এবং তাদের রবের নূরের (মিষ্টি মধুর সুরভিত ও স্নিগ্ধ আলোর) জ্যোতিতে সকল দিক উদ্ভাসিত হবে। এ বিশাল প্রান্তরে তাদের রবের নূর ছাড়া আর কোনো আলোই থাকবে না। তাদের সামনে আমলনামা এগিয়ে দেয়া হবে, যার মধ্যে বান্দাদের যাবতীয় কার্যাবলী সংরক্ষিত থাকবে।

'এই সময়ে এগিয়ে নিয়ে আসা হবে নবী ও সাক্ষীদের যেন তারা তাদের জানা সত্য সঠিক কথাটি বলে দেন' এবং সে মহান সত্তার পরিচালনায় সে দিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে আল্লাহর দিকে এগিয়ে দেন এবং তাদের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সে সমাবেশে বাজে তর্ক করার প্রবণতা থামিয়ে দেন। এরশাদ হচ্ছে,

'চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তায়ালা এদের ফয়সালা করে দিয়েছেন, অতপর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজের প্রতিদান দেয়া হবে আর তিনি ভালো করেই জানেন যা তারা পার্থিব জীবনে করেছে।'

অতএব তারা কি বলবে বা কোন্ যুক্তি পেশ করবে তা শোনার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না, না সেদিন কারো কণ্ঠস্বর বেশী উঁচু হতে পারবে। এভাবেই হিসাব নিকাশ ও সওয়াল জওয়াব সব কিছু গুটিয়ে নেয়া হবে, যার বিবরণ অত্যন্ত ভীতিজনক। এরশাদ হচ্ছে,

'কাফেরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে' .... 'এমন কি যখন সেখানে তারা পৌঁছে যাবে তখন সেই জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে।'

তখন সেই জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের সে স্থানের উপযুক্ত অধিবাসী জেনে এবং সেখানে পৌঁছানোর কারণ অবগত হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

'তারা তাদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা এসে তোমাদেরকে তোমাদের রব সম্পর্কে কোনো কিছু পড়ে শোনাননি এবং আজকের এই দিনের সাথে সাক্ষাত হবে বলে কি তোমাদের সতর্ক করেননি।' তারা বলবে অবশ্যই তাঁরা বলেছেন, কিন্তু কাফেরদের জন্যে আযাবের ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়াটাই স্থির হয়ে গেছে।

এ জায়গা হবে বিনয় নম্রতা প্রদর্শনের এবং নিজেকে সোপর্দ করার জন্যে নির্দিষ্ট, ঝগড়া-ফাসাদ বা তর্ক-বিতর্ক করার কোনো সুযোগ এখানে থাকবে না। তারা সবাই অপরাধ স্বীকার করে আত্মসমর্পণকারী হবে।

'বলা হবে, জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে সেখানে চিরদিন থাকার জন্যে প্রবেশ কর, অতপর নিকৃষ্ট হবে অহংকারকারীদের সেই বাসস্থান।'

হাঁ, এরাই হবে জাহান্নামের যাত্রী, অহংকারী মানুষদের এটাই হবে শেষ ঠিকানা। জান্নাতের যাত্রীদের অবস্থা কেমন এবং মোত্তাকীদের ঠিকানা কোথায় হবে? সে মর্মে এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলেছে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে জান্নাতের দিকে ..... (বলা হবে,) যাও চিরদিনের জন্যে ওখানে দাখিল হয়ে।' (আয়াত ৭৩-৭৪)

এ হবে বড় চমৎকার এক অভ্যর্থনা, তাদের কাছে ভালো লাগে এমন সব সুমধুর ভাষায় তাদের অভিবাদন করা হবে। এ সব অভিবাদন অভ্যর্থনার কারণ জানাতে গিয়ে বলা হবে, তোমরা (জীবনে) ভালো থেকেছো, অর্থাৎ জীবনকে কলুষমুক্ত রেখেছো, তোমরা পাক পবিত্র থেকেছো এবং এখানে পবিত্র অবস্থায়ই এসেছো। সুতরাং এখানে ভালো ও পাকসাফ জিনিস ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কিছুই থাকবে না এবং এখানে পবিত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ প্রবেশও করবে না। এটাই হবে নেয়ামতভরা চিরন্তন যিন্দেগী।

এখানে জান্নাতবাসীদের কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হতে থাকবে। আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পবিত্রতা ও প্রশংসাগীতি উচ্চারণের সাথে সাথে তারা বলতে থাকবে–

'আলহামদু লিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদের এই যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আহ্, আজ আমরা জান্নাতের এ সুষমাময় পরিবেশের যেখানে খুশী সেখানে বাস করবো।'

হাঁ, এটাই সেই যমীন যা ওদের জন্যে হবে উপযোগী বাসস্থান, এ বাসস্থানের যেখানে তাদের মন চাইবে তারা অবস্থান করবে– ঘুরে বেড়াবে, যা কিছু তারা পেতে চাইবে সবই সেখানে পাবে।

'সুতরাং সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে এই হবে চমৎকার প্রতিদান।'

তারপর সেই কঠিন দৃশ্যের বর্ণনা সমাপ্ত হচ্ছে, যা মানুষের অন্তরকে ভয় ভীতিতে সন্ত্রস্ত করে দেয়, আল্লাহর সুমহান মর্যাদার অনুভূতিতে পরিবেশকে তার গাম্ভীর্যপূর্ণ পরশে ভরে দেয়, যা মনকে উদাস করে ফেলে। এভাবে তাওহীদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এ মর্মস্পর্শী সূরার যথোপযুক্ত ইতি টানা হয়েছে। এই দিনে গোটা সৃষ্টিজগত তার রবের প্রশংসাগীতিতে মুখর হয়ে ওঠবে, সবাই তাকে কেন্দ্র করে তার জয়গান গাইতে থাকবে, বিনয়াবনত ও নিবেদিত হয়ে ওঠবে সবার প্রাণ। প্রাণহীন বস্তু ও সকল প্রাণী আত্মনিবেদন করতে গিয়ে আল্লাহর কৃতিত্বের কথাই বার বার উচ্চারণ করতে থাকবে।

'তোমরা সে সময়ে ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান দেখবে, আল্লাহর আরশের চতুর্দিকে তারা তাদের মালিকের মাহাত্ম্য বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করতে থাকবে, আর সঠিকভাবে তাদের মধ্যে সেদিন সকল বিষয়ের ফয়সালা করে দেয়া হবে। সর্বদিকে একই ধ্বনি ওঠবে– আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস